বাংলা প্রথম পত্র

কোর্স কোড : SSC-1651

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এসএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা ও সংকলনে

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না
ড. মোহাম্মদ আজম
কামাল উদ্দিন শামীম

সম্পাদক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

সমন্বয়কারী

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : SSC-1651

এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭, মার্চ, ২০১৮, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, জানুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সন : সেপ্টেম্বর, ২০২৪
মার্চ, ২০২৩, সেপ্টেম্বর, ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৬
[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3115-8

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর–১৭০৫

মুদ্রণ
সৃষ্টি প্রিন্টার্স
৪৮, হাসেম রোড, ঢাকা।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলা প্রথম পত্র **কোর্স কোড : (SSC-1651)**

এসএসসি প্রোগ্রামের বাংলা প্রথম পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। এই বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। এতে গদ্য, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক স্থান পেয়েছে এবং প্রতিটিকে এক-একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে-বুঝে পড়তে হবে এবং এক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকাগুলো দেখে নিতে হবে। শব্দার্থগুলো বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর অভিধান দেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। প্রতিটি পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ‘পল্লিবর্ষা’ বা ‘ঝরনার গান’ –এর মতো কিছু ক্ষেত্রে লেখক কর্তৃক লিখিত বানানের পরিবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো ‘উদ্দেশ্য’ পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইনকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	শব্দার্থ	সারসংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	অ্যাসাইনমেন্ট	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

কোর্স সমাপ্তির সময়	কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: meherin2010@bou.ac.bd

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
গল্প ও প্রবন্ধ		**লেখকের নাম**	**১-১০৯**
০১.	পালামৌ	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩
০২.	দেনাপাওনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
০৩.	বই পড়া	প্রমথ চৌধুরী	২১
০৪.	অভাগীর স্বর্গ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৯
০৫.	নিরীহ বাঙালি	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৪২
০৬.	মানুষ মুহম্মদ (সা)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	৪৮
০৭.	নিমগাছ	বনফুল	৫৬
০৮.	উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন	কাজী নজরুল ইসলাম	৬১
০৯.	শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৬৬
১০.	মমতাদি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১
১১.	পয়লা বৈশাখ	কবীর চৌধুরী	৮০
১২.	বাঁধ	জহির রায়হান	৮৬
১৩.	সাহিত্যের রূপ-রীতি	হায়াৎ মামুদ	৯৫
১৪.	বাঙলা শব্দ	হুমায়ুন আজাদ	১০৫
কবিতা		**কবির নাম**	**১১১-১৮০**
০১.	আমার সন্তান	ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর	১১৩
০২.	কপোতাক্ষ নদ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১১৮
০৩.	জীবন সঙ্গীত	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২২
০৪.	প্রাণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৭
০৫.	অন্ধবধূ	যতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৩২
০৬.	ঝরনার গান	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৩৭
০৭.	মানুষ	কাজী নজরুল ইসলাম	১৪২
০৮.	সেইদিন এই মাঠ	জীবনানন্দ দাশ	১৪৭
০৯.	পল্লিজননী	জসীমউদ্‌দীন	১৫২
১০.	বৃষ্টি	ফররুখ আহমদ	১৬০
১১.	আমি কোনো আগন্তুক নই	আহসান হাবীব	১৬৪
১২.	তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান	১৬৯
১৩.	সাঁকোটা দুলছে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৫
উপন্যাস	**হাজার বছর ধরে**	**জহির রায়হান**	**১৮১-২৫৬**
নাটক	**বহিপীর**	**সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌**	**২৫৭-৩০৪**
	নমুনা প্রশ্ন		**৩০৫-৩১০**

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র : SSC-1651

মানবণ্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন **(কাঠামোবদ্ধ)**	: ৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	: ৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
		সর্বমোট = ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

গদ্য, কবিতা ও সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) অংশের প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টিসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০ নম্বর।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে গদ্য থেকে ১৫টি, কবিতা থেকে ১৫টি এবং সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) থেকে ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে।

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র

গদ্য : প্রবন্ধ ও গল্প

প্রবন্ধকার ও গল্পকার

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

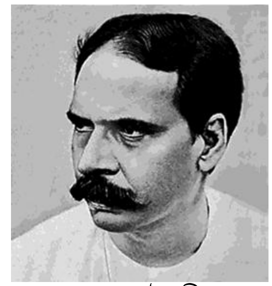
প্রমথ চৌধুরী

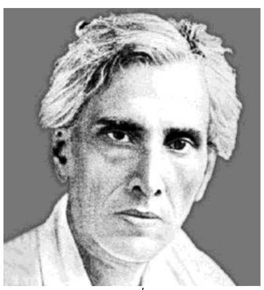
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

বনফুল

কাজী নজরুল ইসলাম

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

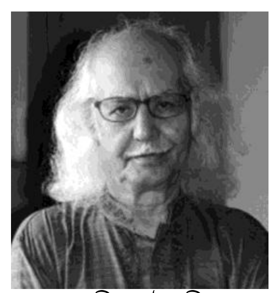
কবীর চৌধুরী

জহির রায়হান

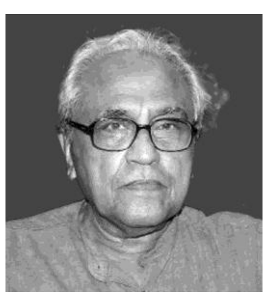
হায়াৎ মামুদ

হুমায়ুন আজাদ

সাহায্য প্রয়োজন ?

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : meherin2010@bou.ac.bd

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

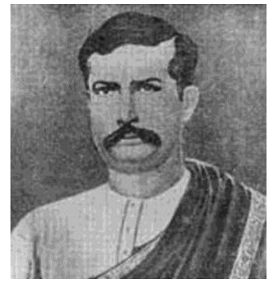

লেখক পরিচিতি

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁদের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হুগলির ডেপুটি কালেক্টর। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুর জেলা স্কুল ও হুগলি কলেজে পড়াশুনা করেন এবং নিজের চেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বর্ধমান কমিশনার অফিসে কেরানি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ভ্রমণসাহিত্যের লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভ্রমণকাহিনি 'পালামৌ' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। 'প্রমথনাথ বসু' ছদ্মনামে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকায়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি বিহারের পালামৌ ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। 'পালামৌ' ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সৌন্দর্যের প্রতি লেখকের যে অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এমন বাঙালি লেখকদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এছাড়াও '*কণ্ঠমালা*' (১৮৭৭) ও '*মাধবীলতা*' (১৮৮৪) তাঁর দুটি উপন্যাস। '*জলপ্রতাপ চাঁদ*' (১৮৮৩) তাঁর ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস। তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থের নাম '*রামেশ্বরের অদৃষ্ট*' ও '*দামিনী*'। ১৮৮৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

'পালামৌ' রচনাটি সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের '*পালামৌ*' নামক ভ্রমণোপন্যাস থেকে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে। এ রচনায় লেখক বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ডের) পালামৌ অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য, দেশভ্রমণের আনন্দ, অভিজ্ঞতা এবং পালামৌ-এর আদিবাসী কোলদের জীবনাচরণ, খাদ্য ও আনন্দ-বিনোদন প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' পড়া শেষে আপনি–

- সাহিত্যরূপ হিসেবে ভ্রমণকাহিনির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা পালামৌ অঞ্চলের জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পালামৌ যাওয়ার পথের বিবরণ লিখতে পারবেন;
- পালামৌ অঞ্চলের পাহাড়-অরণ্য-শোভিত প্রকৃতির বর্ণনা লিখতে পারবেন;
- বাঙালি গৃহস্বামীর সংসার-ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বহুকাল হইল আমি একবার পালামৌ প্রদেশে গিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন করিলে পর সেই অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্ত দুই-এক জন বন্ধুবান্ধব আমাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতেন, আমি তখন তাঁহাদের উপহাস করিতাম। এক্ষণে আমায় কেহ অনুরোধ করে না, অথচ আমি সেই বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি। গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে। পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে-চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কন্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়।

যখন পালামৌ আমার যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন ইন্‌ল্যান্ড ট্রাঞ্জিট কোম্পানির ডাকগাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রানিগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্বপারে গাড়ি থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি ঘেরিল। 'সাহেব একটি পয়সা, সাহেব একটি পয়সা।' এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

তাহাদের সঙ্গে একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশুও আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ি অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়। অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া-যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহা আর আশ্চর্য কী?

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথা যাইবেন?' আমি বলিলাম, 'একবার এই পর্বতে যাইব।' সে হাসিয়া বলিল, 'পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।' আমি এ-কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না-শুনিয়া আমি পর্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে ১৫ মিনিটকাল দ্রুতপদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্বত পূর্বমতো সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন, ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোনো সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসীর বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তথায় গিয়া গাড়ি থামিলে আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন আমি সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা। সেখানে তিন শত লোক থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধহয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধহয় সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিল যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।

আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বালকদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে বালকদের শয়নঘর দেখিতে উঠিয়া গেলাম। ঘরটি বিলক্ষণ পরিসর, তাহার চারি কোণে চারিখানি খাট পাতা, মধ্যস্থলে আর-একখানি খাট রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় বালকেরা

বলিল, 'চারি কোণে আমরা চারিজন শয়ন করি, আর মধ্যস্থলে মাস্টার মহাশয় থাকেন।' এই বন্দোবস্ত দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইলাম। দিবারাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা অনেকে বুঝেন না।

বালকদের শয়নঘর হইতে বহির্গত হইয়া আর-একঘরে দেখি, এক কাঁদি সুপক্ক মর্তমান রম্ভা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তাহাতে একখানি কাগজ ঝুলিতেছে। পড়িয়া দেখিলাম, নিত্য যত কদলী কাঁদি হইতে ব্যয় হয়, তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে! লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি, ছোটনজর ইত্যাদি বলে : কিন্তু আমি তাহা কোনোরূপে ভাবিতে পারিলাম না। যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম, তাহাতে 'কলাকাঁদির হিসাব' দেখিয়া বরং আরো চমৎকৃত হইলাম। যাহাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অন্য বিষয় দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, দেখিলাম তাঁহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলই সমভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে আছেন, বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না। তাঁহাদের প্রশংসা করি না। যাঁহারা বৃহৎ সূক্ষ্ম একত্র দেখিয়া কার্য করেন, তাঁহাদেরই প্রশংসা করি।

আমি ভাবিয়াছিলাম পালামৌ প্রবল শহর, সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। সেখানে একবার একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝর করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

এক কাঁদি সুপক্ক মর্তমান রম্ভা– এক ছড়া সুন্দরভাবে বা পরিপূর্ণরূপে পাকা কলা। ***কণ্টকাকীর্ণ–*** কাঁটায় পরিপূর্ণ; দুর্গম। ***কদাচারী–*** কুৎসিত বা জঘন্য আচরণ যার। ***কুসুমিত কানন–*** ফুলশোভিত বাগান; ফুলেল বাগান। **গণ্ডগ্রাম–** ক্ষুদ্র গ্রাম। **গাড়োয়ান–** গাড়ি চালায় যে। ***ডাকগাড়ি–*** ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ি; চিঠিপত্র বহনকারী গাড়ি। ***দ্রুতপদবিক্ষেপে–*** দ্রুত বা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাওয়া। **পরিসর–** ব্যাপ্তি; বিস্তার। **প্রকাণ্ড–** অতিবৃহৎ, বিশাল। ***প্রস্তরময়–*** পাথরের মতো। ***প্রসন্নতাব্যঞ্জক–*** আনন্দ বা সন্তুষ্টি প্রকাশক। **প্রত্যাগমন–** ফিরে আসা। **বাটী–** বাড়ি। **বিলক্ষণ–** ভালো রকম; অসামান্য। **মর্তমান–** এক জাতীয় কলা। ***মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ–*** ছোট টিলা; উঁচু জায়গা। **রম্ভা-** কলা। **শয়নঘর–** শোবার ঘর। ***সাদরে–*** আদরের সঙ্গে।

সারসংক্ষেপ :

লেখক যৌবনে পালামৌ প্রদেশে গিয়েছিলেন। পালামৌ পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা সুন্দর জায়গা। সমতলবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে সে পরিবেশ খুব একটা পরিচিত নয়। পথে যেতে যেতে যে পাহাড়কে খুব কাছে মনে হয়, সে পাহাড় আসলে অনেক দূরে অবস্থিত –এ অভিজ্ঞতাও লেখকের জন্য নতুন। যে বাঙালির বাড়িতে তিনি সেখানে অতিথি হয়েছিলেন, সে গৃহকর্তার প্রসন্ন মুখ আর তার পরিবার-ব্যবস্থাপনা লেখককে মুগ্ধ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কর্মজীবনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?

ক. ডেপুটি জেল সুপার　　খ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

গ. ডেপুটি জজ　　ঘ. ডেপুটি পুলিশ সুপার

২. যে কারণে পর্বত সম্বন্ধে বাঙালির দূরত্ব স্থির করা কঠিন–

ক. শিক্ষার অভাব　　খ. অনভিজ্ঞতা

গ. বুদ্ধির অভাব　　ঘ. গণিতে দুর্বলতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পালামৌ' রচনার কোন নদীর সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. বরাকর　　খ. কালিনী

গ. ব্রহ্মপুত্র　　ঘ. কুশিয়ারা

৪. এই সাদৃশ্যের কারণ–

i. নদীটি অতিক্ষুদ্র　　ii. নদীতে অল্পমাত্র জল　　iii. নদীতীর বৃক্ষশোভিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i, ii ও iii　　ঘ. ওপরের কোনোটিই নয়

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পালামৌয়ের প্রধান জনগোষ্ঠী কোল সম্প্রদায়ের মানুষের সৌন্দর্য ও জীবনাচারের বিবরণ দিতে পারবেন;
- পাহাড়ি কোল সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বন বর্ণনায় যেরূপ 'শাল তাল তমাল, হিন্তাল' শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তা, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশি কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়; কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথায়ও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরো যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে-সেখানে দুই-একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে-প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতছায়ায় সে-প্রান্তর আরো রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনো দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুক্‌ধুকির পরিবর্তে এক-একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহবা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া

আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

এই অঞ্চলে প্রধানত কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি, খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না! যে-সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ-বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটির। আমার পালকি দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মতো কালো, সকলেই যুবতী, সকলের কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো। কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল, মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঙ্গালার পথেঘাটে বৃদ্ধাই অধিক দেখা যায়, কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে যুবতীই অধিক দেখা যায়। কোলের মধ্যে বৃদ্ধা অতি অল্প, তাহারা অধিকবয়সী হইলেও যুবতীই থাকে, অশীতিপরায়ণা না হইলে তাহারা লোলচর্মা হয় না। অতিশয় পরিশ্রমী বলিয়া গৃহকার্য কৃষিকার্য সকল কার্যই তাহারা করে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের ন্যায় কেবল বসিয়া সন্তান রক্ষা করে, কখনো কখনো চাটাই বুনে। আলস্য জন্য পুরুষেরা বঙ্গমহিলাদের ন্যায় শীঘ্র বৃদ্ধ হইয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা শ্রমহেতু চিরযৌবনা থাকে। লোকে বলে পশুপক্ষীর মধ্যে পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর; মনুষ্যমধ্যেও সেই নিয়ম। কিন্তু কোলদের দেখিলে তাহা বোধহয় না, তাহাদের স্ত্রীজাতিরাই বলিষ্ঠ ও আশ্চর্য কান্তিবিশিষ্টা। কিন্তু তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠিতেছে, চক্ষে মাছি উড়িতেছে, মুখে হাসি নাই, যেন সকলেরই জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে।

একদিনের কথা বলি। যেরূপ নিত্য অপরাহ্ণে এই পাহাড়ে যাইতাম সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে।

যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, 'আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন মুখে আর জল গ্রহণ করি?' আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।'

আমি স্বভাবত বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুক সম্বন্ধে আমার কখনো ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারিরা কতদিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনো গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম, বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনো আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবারি তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে এ-কথা তাহাদের মনে আইসে না। যতদিন তাহাদের মনে এ-কথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায়, সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল কোড যত ভালো হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়।

একদিন অপরাহ্ণে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলো কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, 'রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন?' আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশ পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা 'খোঁপা' বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই-তিনখানি কাঠের 'চিরুনি' সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহবা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহ আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানাভঙ্গিতে আপন আপন বলবীর্য

দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ-বারোটা, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশ জন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলন্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য-উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকলগুলিই সম-উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কালো। সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল।

বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নতুন, তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর এক বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চস্বরে গাহিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে 'ধুয়া' ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেইসঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের দুটি-একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে, দুই-তিন স্থানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্তকীদের বর্ণ আরো কালো দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে একবার 'চিতিয়া' পড়িতেছে, আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

অপরিচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অদ্যাপি– আজও; এখনো। **অনুসন্ধান–** খোঁজ করা। **অম্লান–** অমলিন; প্রফুল্ল। ***অশীতিপরায়ণা–*** আশির অধিক বয়স বিশিষ্ট বৃদ্ধা। **একশিলা–** পুরোটা একটি প্রস্তর। **কাষ্টঘণ্টা–** গৃহপালিত পশু খোঁজার ঘণ্টা। ***কোলবালক–*** কোল সম্প্রদায়ভুক্ত বালক। **কান্তি–** লাবণ্য; সৌন্দর্য। **খর্বাকৃতি–** বামন; বেঁটে। **গলঘন্টা–** গলায় বা কণ্ঠদেশে বাঁধা ঘণ্টা। ***জানু–*** হাঁটু। ***ধড়া–*** ধুতি; চীরবস্ত্র। ***ধুক্‌ধুকি– কণ্ঠহারের*** লকেট। **ধুয়া–** গানের যে অংশ দোহারগণ বার বার গায় (chorus)। ***পরগনা–*** অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টি। ***পাথুরে ছেলেগুলি–*** পাহাড়ি ছেলেগুলো সাধারণত কালো ও পরিশ্রমী হয়। ***পেনাল কোড–*** ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি। **প্রবিষ্ট–** প্রবেশ করেছে এমন। **বদন–** মুখমণ্ডল। **বয়োজ্যেষ্ঠা–** বয়সে বড় বা অধিক বয়স্ক নারী। **বীরদর্পে–** শক্তির সাথে; সাহসের সাথে। **মহড়া–** প্রস্তুতি; অভিনয়ের বা যুদ্ধের প্রস্তুতি। **মৃন্ময়–**মাটির তৈরি; মৃত্তিকা নির্মিত। ***যেন মর্তে মেঘ করিয়াছে–*** পাহাড় এবং চারপাশের পরিবেশের ঘনত্ব বোঝাতে এ উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে; **রণক্ষেত্র–** যেখানে যুদ্ধ চলছে; যুদ্ধক্ষেত্র। ***লোলচর্মা–*** শিথিল বা ঢিলা চামড়া। ***শ্রমহেতু চিরযৌবনা–*** পাহাড়ি এই মেয়েরা পরিশ্রমী হওয়ায় সহসা বৃদ্ধ হয় না। ***সাতনরী–*** *সাত প্যাচের* কণ্ঠহার; গলার মালা। **স্কন্ধ–** কাঁধ ।

সারসংক্ষেপ :

লেখক পালামৌয়ে পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেখানকার প্রধান জনগোষ্ঠী কোলদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। এক প্রান্তরে কোল-বালকদের মহিষ চরাতে দেখলেন। কোল নারী-পুরুষও দেখলেন। সেই পরিবেশে, নিজেদের অঞ্চলে এই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলোকেই তাঁর অতিশয় সুন্দর মনে হল। এক সন্ধ্যায় তিনি গিয়েছিলেন কোলদের নাচ দেখতে। ওই পাহাড়-বনের পরিবেশে রাতের আগুনের আলোয় কোল যুবক-যুবতীদের সম্মিলিত নাচ-গান তাঁকে মুগ্ধ করল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ‘পালামৌ’ অঞ্চলে কারা বাস করে?
ক. রাখাইন সম্প্রদায় খ. সাঁওতাল সম্প্রদায় গ. মুণ্ডা সম্প্রদায় ঘ. কোল সম্প্রদায়

৬. ‘পালামৌ’ রচনায় লেখক কাকে ‘সমদর্শী’ বলেছেন?
ক. গৃহ শিক্ষককে খ. বাঘ মারতে উদ্যত কোল যুবককে
গ. কোল যুবতীকে ঘ. আতিথেয়তা দানকারী বাঙালিকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

লাওসে অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-পাটে অসংখ্য মেয়ে কাজ করে। তাদের পরনে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত স্থানীয় সুন্দর সিন, কাপড়ের তৈরি পোশাক অনেকটা লুঙ্গির মতো ঊর্ধ্বাঙ্গে শার্ট পরে।

৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত লাওসের মেয়েরা ‘পালামৌ’ রচনায় কোন নারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
ক. মুরং খ. ওঁরাও গ. মুণ্ডা ঘ. কোল

৮. উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–
i. সমাজনীতিতে ii. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে iii. অর্থনীতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ‘পালামৌ’ কীসের নাম?
ক. গ্রামের নাম খ. শহরের নাম গ. পরগনার নাম ঘ. প্রদেশের নাম

১০. ‘কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।’– কেন?
ক. বয়সের বাতিক খ. নিঃসঙ্গতা দূর করা
গ. পাণ্ডিত্য দেখানো ঘ. সামাজিক দায়িত্ব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সেবার শীতের ছুটিতে গেলাম চিম্বুক পাহাড় দেখতে। সেখানে গিয়ে উঠি আমারই বন্ধু সমীরণ চাকমার বাড়িতে। চাকমা পরিবারটির আন্তরিকতা, আপ্যায়ন ও ভালোবাসার প্রগাঢ়তায় পাহাড়ি জীবনধারার সৌন্দর্য আমার নিকট নতুনভাবে উদ্ভাসিত হল।

১১. উদ্দীপকে ‘পালামৌ’ রচনার যে পরিবারটির অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে–
ক. কোল পরিবার খ. মারমা পরিবার
গ. মুণ্ডা পরিবার ঘ. বাঙালি পরিবার

১২. উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনার পরিবারটির সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–
ক. আতিথেয়তায় খ. ভ্রমণবিলাসে
গ. সংস্কৃতিচর্চায় ঘ. প্রকৃতিপ্রেমে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার পাহাড় আর টিলাগুলো যেন এক বিশেষ শ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। প্রথমেই দেখা যায় নিচুপাহাড়। তারপর উঁচু পাহাড়। তার উত্তরে আরও উঁচু পাহাড়ের সারি। শহর এ এলাকায় নেই বললেই চলে। এমনকি গণ্ডগ্রাম পাওয়াও দুষ্কর। এখানে আছে কেবল পাহাড় আর পাহাড় আর তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

ক. ‘পালামৌ’ লেখকের কোন ধরনের রচনা?
খ. ‘মৃত্তিকার দুএকটি স্তূপ দেখলেই তাহাদের আনন্দ হয়।’ –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকটি ‘পালামৌ’ রচনার কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনার ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা এক ও অভিন্ন।” –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে অন্যতম মারমা সম্প্রদায়। মারমাদের জীবিকার প্রধানতম উপায় পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ করা। এরা উৎসবমুখর জনগোষ্ঠী। বর্ষবরণ উপলক্ষে মারমারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। সাংগ্রাই উৎসবে গান পরিবেশনের সঙ্গে নৃত্যেরও আয়োজন করা হয়। নৃত্য কখনো দলীয়, কখনো বা একক হয়। নৃত্যের সময় খোল, বাঁশি, করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজানো হয়। মারমা জনগোষ্ঠীর সকলেই এই আনন্দ-আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

ক. ‘পরগনা’ কী?
খ. ‘বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।’ –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে ‘পালামৌ’ রচনার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. “মারমা ও কোল উপজাতির সাংস্কৃতিক জীবনধারা একইসূত্রে গাঁথা।” –উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তরঃ

ক. ‘পালামৌ’ একটি ভ্রমণবিষয়ক স্মৃতিচারণমূলক রচনা।

খ. উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর পাহাড় দেখার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।
সমতল অঞ্চলের মানুষ সমতল মাঠ দেখে অভ্যস্ত। আমাদের পাহাড়-পর্বত দেখার সুযোগ তেমন একটা ঘটে না। কেবল উঁচু ঢিবি দেখেই আমরা আনন্দ অনুভব করি। আর পাহাড় দেখার সুযোগ পেলে তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। আলোচ্য রচনাটির লেখকও সমতল অঞ্চলের মানুষ। তাই ‘পালামৌ’ অঞ্চলে ক্ষুদ্র পাহাড় দেখে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকটির বিষয়বস্তু ‘পালামৌ’ রচনায় বর্ণিত পাহাড়ি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
প্রকৃতি মানুষের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করে। এই আনন্দ পাওয়ার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির রাজ্যে। পাহাড়ও প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য মানুষের নয়ন ও মন দুটোই কেড়ে নেয়। ছোট-বড় নানা রকম পাহাড়ের বর্ণনা উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপরূপ প্রকৃতি উদ্দীপকের রাঙ্গামাটি এবং পালামৌ উভয় অঞ্চলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।
লেখক পালামৌতে গিয়ে সেখানকার পাহাড়-পর্বত দেখে অভিভূত হয়েছেন। সেখানে এত বড় পাহাড় রয়েছে যে নদী, আবাদি জমি, ঘর-বাড়ি কিছুই দূর হতে গোচরে আসে না। তাঁর কাছে সেখানকার পাহাড়গুলোকে বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ বলে মনে হয়েছে । উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রথমে নিচু পাহাড়, তার পরে উঁচু পাহাড় চোখে পড়ে। এলাকাটি যেন পাহাড়ে পাহাড়ে একাকার হয়ে আছে। পাহাড়ের সারি আকাশ আর মেঘকে দৃষ্টিসীমার বাইরে নিয়ে যায়। পাহাড়ের এই অপূর্ব সমন্বিত অবস্থান ‘পালামৌ’ এবং উদ্দীপকের রাঙামাটি অঞ্চলের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ঘ. পাহাড়ের সারি ‘পালামৌ’ ও উদ্দীপকের রাঙামাটি অঞ্চলকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে বলে উভয়ের বর্ণনা এক ও অভিন্ন।
পাহাড় দেখা আনন্দের শিহরণ জাগায়। উঁচু পাহাড় আর নিচু পাহাড়ের সৌন্দর্য মানুষ প্রাণভরে উপভোগ করে। মেঘের কোলে পাহাড় আর পাহাড়ের কোলে মেঘ এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির এই মোহময়তায় মুগ্ধ হয়েছে। উদ্দীপক ও ‘পালামৌ’ রচনায় এমনই এক পাহাড়শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে।
উদ্দীপকে রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড় সারির বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পালামৌতেও দেখা যায় পাহাড়গুলো বিচলিত নদীর মত তরঙ্গায়িত, শুধু স্তূপাকৃতির নয়। কোথাও কোথাও পাহাড়গুলো একশিলা, তবু কত বৃক্ষকে ধারণ করে আছে।

নিয়মিত বৃষ্টিস্নাত হয় না বলেই সেখানকার পাহাড়গুলো পেয়েছে এক বিশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পালামৌতে লেখকের চোখে পড়েছিল শাল, কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষে। পালমৌর জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তার ছেদ নেই। লেখক সেখানে দেখেছিলেন পর্বত ছায়ায় রম্য অর্ধশুষ্ক একটি ক্ষুদ্র প্রান্ত যেখানে মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ব্যতীত আর কিছু নেই, সব জায়গা অতি পরিষ্কার।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলার মনোলোভা বর্ণনা এবং 'পালামৌ'-এর নান্দনিক উপস্থাপনা আমাদের কাছে মনে হয় একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পাহাড়শোভিত উভয় অঞ্চলের চিত্রই আমাদের সমভাবে আকৃষ্ট করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড় ও 'পালামৌ'-এর পাহাড়ের বর্ণনা যেন একসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

রাজধানী শহর ঢাকা ছাড়িয়ে শতাধিক কিলোমিটার উত্তরে পুরনো শহর ময়মনসিংহ। এ জেলার গারো পাহাড়ে বাস করে গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা। গারোরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এরা মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। গারো পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। এরা নারী-পুরুষ একসাথে মাঠে কাজ করে।

ক. পেনাল কোড কী?

খ. 'যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী।' –কেন?

গ. উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "গারো সম্প্রদায়ের নারীদের চেয়ে কোল নারীরা অধিকতর জীবন সংগ্রামী।" –উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. ক ১১. ঘ ১২. ক

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

দেনাপাওনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সংগীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

কবিতা : *মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, শেষলেখা*;
উপন্যাস : *চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা*;
ছোটগল্প : *গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, গল্পসল্প*;
নাটক : *বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী*;
প্রবন্ধ : *আধুনিক সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, সাহিত্যের স্বরূপ*;
আত্মজীবনী : *জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা*।

ভূমিকা

'দেনাপাওনা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পে তৎকালীন হিন্দু সমাজে পণপ্রথার কুফল সম্পর্কে জানা যায় এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস উপলব্ধি করা যায়। লেখক গল্পটিতে যৌতুক নামক সামাজিক ব্যাধির এক নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন, যা যৌতুক গ্রহণকারীদের প্রতি ঘৃণার জন্ম দেয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দেনাপাওনা' গল্প পাঠ শেষে আপনি–

- যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- নিরূপমার চরিত্র-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নিরূপমার বিয়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন;
- যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে নিরূপমা যেসব সমস্যায় পড়েছিল, তার বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ-মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরূপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুর-দেবতার নামই প্রচলিত ছিল– গণেশ কার্তিক পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরূপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন : এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।' রায়বাহাদুর বলিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।'

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব-একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।'

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, 'দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার ?' দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, 'শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।'

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরূপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা ?' রামসুন্দর বলিলেন, 'কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।'

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনো দিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান তো সহ্য হয় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, 'আহা কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।' শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, 'শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।'

এমনকি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, 'ওই ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ, বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয়, কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো-বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানা স্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ক কেশে, শুষ্ক মুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' রামসুন্দর বলিলেন, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই– নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনুরাগ– আসক্তি; প্রীতি; সোহাগ; মমতা। **অন্তঃপুরে–** অন্দর মহলে। **আক্রোশ–** বিদ্বেষ; ক্রোধ; রোষ। ***খোঁটা–*** গঞ্জনা; নিন্দা; দোষের প্রতি ইঙ্গিত। ***ঝংকার–*** গুঞ্জন; বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদির শব্দ। ***তুমুল–*** প্রবল; ঘোরতর; ভয়ানক। ***হতোদ্যম–*** নিরুদ্যম; উদ্যমহীন। ***দয়াপরতন্ত্র–*** দয়ার্দ্র; দয়ার বশীভূত। **দৈন্য–** দারিদ্র্য; অভাব। **নিত্যক্রিয়া–** দৈনন্দিন কর্ম; প্রতিদিনের কাজ। **নিরানন্দভাবে–** আনন্দ নেই এমন ভাবে; দুঃখিত চিত্তে। ***প্রতিপত্তি–*** সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব। **বনেদী–** সুপ্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। **বন্ধক–** ঋণের জামিনস্বরূপ কোনো বস্তু জমা রাখা। ***রায়বাহাদুর–*** ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব; রাজার মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রতাপশালী ব্যক্তি।

সারসংক্ষেপ :

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরুপমার বিয়ে হয়েছিল বড় ঘরে। দশ হাজার টাকা পণ এবং আরো বহু সামগ্রী দেওয়ার কথা ছিল। নিরুপমার বাবা টাকার জোগাড় করতে পারেননি। হবু বরের দৃঢ়তায় কোনোমতে বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পণের টাকা বেশিরভাগ বাকি থাকায় শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমার অনাদর-অবহেলার সীমা ছিল না। বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া দূরের কথা, তাকে বাবার সাথে ঠিকমতো দেখাও করতে দিত না। তার বাবা টাকা জোগাড় করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু অতগুলো টাকা সংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১২ খ. ১৯১৩ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৯১৫

২. 'ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।' এখানে ইতিহাস হলো–
ক. ক্ষতি স্বীকার করা খ. তিন হাজার টাকা সংগ্রহ
গ. দায়মুক্তির জন্য চেষ্টা ঘ. ঋণ করে খাওয়ানো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাপ যেমনি মেয়ের চিবুক ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিলেন অমনি হৈমর চোখের জল আর মানা মানিল না। আমার শ্বশুর মেয়ের মুখে এমন একটা কিছু দেখিয়াছিলেন যাহাতে তাহার বুক ফাটিয়া গেল।

৩. উদ্দীপকের বাবা চরিত্রে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন ছবিটি ফুটে উঠেছে?
ক. বাৎসল্য খ. পণের অভাব গ. সন্তানের কষ্ট ঘ. বাবার সুখ

৪. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা 'দেনাপাওনা' গল্পের বাক্য হচ্ছে–
i. সংসারের খরচ আর চলে না।
ii. কন্যার সাক্ষাৎ লাভে বাপের বুক ফাটে।
iii. বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছেলের বিয়েতে পণ আদায়কারীদের জঘন্য মানসিকতার বিবরণ দিতে পারবেন;
- পণপ্রথার ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নোট-কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার অদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন; নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; শহরে একটা নতুন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই, কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।' এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের

তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'থাক, বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না – কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সেসকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'সে এখন হচ্ছে না।' এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরূপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল– তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি –'। খুব একটা শক্তরকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস ?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনি আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই।'

এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তাঁহার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?'

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, 'তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?' রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, 'দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?' নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া কহিল, 'পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?'

নিরূপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।'

রামসুন্দর বলিলেন, 'ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তাহলে তোর বাপের অপমান, আর তোরও অপমান।'

নিরূ কহিল, 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম ! না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তাছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।'

রামসুন্দর কহিলেন, 'তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।'

নিরূপমা কহিল, 'না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।'

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরূপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তর চলিয়া গিয়াছে এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন তবে শাশুড়ি বলিতেন, 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা! গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।' কখনো-বা বলিতেন, 'দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে, দেখো না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, 'ওর সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িতে বলিল, 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।'

শাশুড়ি বলিলেন, 'কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না– যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়ো বউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটি খ্যাতি রটিয়া গেল– এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনও দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব, এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, 'আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।' রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, 'বাবা তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– মৃতের সৎকার; অন্তিম অনুষ্ঠান। ***আজগুবি–*** অদ্ভুত; অবিশ্বাস্য। **ছল–** ছলনা। **দ্বাররক্ষী–** দারোয়ান; দরজায় পাহারারত কর্মচারী। **নতশির–** মাথা নিচু করেছে এমন, বিনয়ী। ***পঞ্জর–*** পাঁজর, বুকের হাড়ের খাঁচা। **প্রতিপত্তি–** সম্মান, মর্যাদা; প্রভাব। ***বন্দোবস্ত–*** ব্যবস্থা; আয়োজন। **ব্যামো–** ব্যাধি। **মর্মাহত–** মনে আঘাত পাওয়া। **রুষ্ট–** রাগান্বিত; ক্রুদ্ধ। ***শরশয্যা–*** মৃত্যুশয্যা। **সমারোহ–** জাঁকজমক; ঘটা। ***সরোদনে–*** কেঁদে কেঁদে। ***স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ–*** কৌতুহলবশত দুয়ারে কান পেতে যে অন্যের কথা শোনে।

সারসংক্ষেপ :

পণের টাকা বাকি ছিল ছয়-সাত হাজার। নিরূপমার বাবা রামসুন্দর অতি কষ্টে তিন হাজার টাকা জোগাড় করে কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গেলেন। শ্বশুর সে টাকা গ্রহণ করলেন না। বরং তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে রামসুন্দর বসতবাড়ি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করলেন। কিন্তু বেঁকে বসল নিরূপমা। সে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে বাবাকে ফেরত পাঠাল। একথা শ্বশুরবাড়িতে জানাজানি হলে নিরূপমার উপর অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষে অনাদরে-অবহেলায় ও পীড়ায় নিরূপমার মৃত্যু হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অবশ্য মহাসমারোহে তার সৎকার ও শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. রামসুন্দর বিয়াই বাড়িতে কয়টি নোট এনেছিলেন?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৬. 'শাস্ত্রশিক্ষা, নীতিশিক্ষা একেবারে নাই' –একথা বলার কারণ কী?

ক. বাবার অমতে বিয়ে করা খ. পণের টাকা নিতে রাজি না হওয়া
গ. মুখে মুখে কথা বলা ঘ. ধর্মীয় প্রথা না মানা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্যাকরা কহিল, "ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।" শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।" মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

৭. উদ্দীপকের মামার সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. শম্ভুনাথ খ. রায়বাহাদুর গ. রামসুন্দর ঘ. বিশ্বনাথ

৮. এই সাদৃশ্যের কারণ নিহিত রয়েছে–

i. মানসিকতায় ii. শিক্ষায় iii. অর্থলিপ্সায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন :

৯. ভানুসিংহ কার ছদ্মনাম?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ.বারীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. 'দেনাপাওনা' গল্পের অন্তর্নিহিত সুরটি কী?

ক. পুরুষতান্ত্রিকতা খ. নারী নির্যাতন গ. যৌতুকের ভয়াবহতা ঘ. কৌলীন্যপ্রথা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অরুণিমা বাপের বাড়ি থেকে লাখ টাকা আনতে পারেনি। তাই শ্বশুর বাড়িতে তার গঞ্জনার শেষ নেই। এমনকি ভরণ-পোষণেও সে অবহেলার শিকার। পড়শিরা যদি কেউ কিছু বলে অমনি শাশুড়ি মুখ ঝামটা মেরে বলে– 'ওই ঢের হয়েছে।'

১১. উদ্দীপকের অরুণিমার মধ্য দিয়ে 'দেনাপাওনা' গল্পে যার কথা বলা হয়েছে–

ক. নিরূপমা খ. অনুপমা গ. নিরূপমার মা ঘ. অনুপমার মা

১২. উদ্দীপকের শাশুড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'দেনাপাওনা' গল্পের শাশুড়ির–

i. কটাক্ষ ii. নিষ্ঠুরতা iii. স্নেহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বিপাশার বিয়ে হয় প্রমথর সঙ্গে। কিন্তু প্রমথ বেকার। বিয়ের পর হতে অনেক দিন ধরে জামাইয়ের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছেন বিপাশার বাবা। এভাবে অনেক কটি বছর কেটে গেছে। একদিন সরকারি চাকরি পায় প্রমথ। চাকরিতে যোগ দিয়েই প্রমথ শ্বশুরের নিকট যৌতুক দাবি করে। প্রমথর বাবা বলেন, "আমার সরকারি চাকুরে সোনার ছেলেকে অন্যত্র বিয়ে দিলে বৌয়ের শরীর সোনায় ভরিয়ে দেবে।" বিপাশা শিক্ষিত মেয়ে। অপমান সহ্য করতে পারে না সে। তাই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজে গড়ার অভিপ্রায়ে সে স্বামীর ঘর ছেড়ে নেমে আসে পৃথিবীর পথে।

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ কত টাকার পণ চেয়েছিল?

খ. 'বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।' –কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের যে বিষয়টিতে সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. "নিরূপমা প্রথার নিকট সমর্পিত কিন্তু বিপাশা আত্মসচেতন ও দ্রোহী এক নারী প্রতিমা।" –উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্ত বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

ক. কোথায় রামসুন্দরের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না?

খ. বিবাহ সভায় তুমুল গোলযোগ বেঁধে গেল কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের অমিলগুলো আলোচনা করুন।

ঘ. "দেনাপাওনা' গল্পের সামাজিক সমস্যা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. নিরূপমার বিয়েতে বরপক্ষ দশহাজার টাকা পণ চেয়েছিল।

খ. পাত্র পিতার অবাধ্য হয়ে বিয়ে করার দৃঢ়তা প্রকাশ করায় রায়বাহাদুর নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন বলে বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল। নিরূপমার বিয়েতে রায়বাহাদুর পণের দশ হাজার টাকা হাতে না পেলে বরকে বিবাহ আসরে না আনার জন্যে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। বর সহসা পিতার অবাধ্য হয়ে বলে উঠল, 'কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব'। ফলে রায়বাহাদুর হতোদ্যম হয়ে বসে রইলেন। বিবাহ এক প্রকার নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হল।

গ. 'দেনাপাওনা' গল্পে বর্ণিত যৌতুকপ্রথার নিষ্পেষণের দিকটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যৌতুকপ্রথা প্রতিটি সমাজেই একটি নিন্দনীয় দিক। যৌতুকপ্রথার অভিশাপে সমাজে অনেক নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যৌতুকপ্রথা নারীকে অবদমিত করে। উপরন্তু যৌতুকপ্রথা সমাজের মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়। উদ্দীপকে বিপাশা ও 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা এমনই এক অমানবিক প্রথার শিকার।

'দেনাপাওনা' গল্পে যৌতুকপ্রথার ভয়াবহতার শিকার নিরূপমা ও তার বাবার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রামসুন্দর তার আদরের একমাত্র কন্যা নিরূপমাকে প্রভাবশালী রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রের সাথে বিয়ে দেন। বিবাহের সময় রায়বাহাদুর দশহাজার টাকা নগদসহ অন্যান্য সামগ্রী যৌতুক হিসেবে দাবি করেন। এতে কন্যার বাবা রাজি হন। কিন্তু বিয়ের সময় নগদ অর্থ কিছু বাকি পড়ে যায়। ফলে শুরু হয় নিরূপমার উপর মানসিক নির্যাতন। নিরূপমার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় গল্পটির কাহিনি। পক্ষান্তরে, উদ্দীপকের বিপাশাও পণপ্রথার শিকার হয়েছে। বিপাশার শিক্ষিত বেকার স্বামী সরকারি চাকরি পাওয়ায় তার স্বামী ও শ্বশুর যৌতুক দাবি করে। পীড়নের শিকার হয় বিপাশা। শ্বশুরবাড়িতে মানসিক পীড়নের কারণে একসময় তাকে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়। বস্তুত যৌতুকপ্রথার ভয়াবহ ও অমানবিক নির্যাতনের দিকটিই উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ. উদ্দীপকে বিপাশা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজছে।

আমাদের দেশে যৌতুকপ্রথার শিকার হয় অসংখ্য নারী। অনেক সময় তারা পিতার দরিদ্রতা ও শ্বশুরবাড়ির ভয়াবহ নির্যাতনের কারণে পরিবারে অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে এদেশের নিরূপায় গৃহবধূরা আত্মবিসর্জনের সহজ পথটি বেছে নেয়। তবুও এই সমাজ ও সংস্কৃতিতে যৌতুকপ্রথার অপ্রতিরোধ্য গতি রুদ্ধ হয় না।

'দেনাপাওনা' গল্পে রামসুন্দর কন্যাবৎসল পিতা। যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুর বাড়িতে কন্যার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তাকে সর্বদা পীড়িত করত। তাই সে বাড়ি বিক্রি করে যৌতুকের টাকা জোগাড় করে। নিরূপমা পিতার অপমান ও সর্বস্বান্ত অবস্থা সহ্য করতে না পেরে আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে বিপাশার বিয়ে হয় শিক্ষিত বেকার যুবক প্রমথের সাথে। সরকারি চাকরি পাওয়ার পর বেঁকে বসে প্রমথ ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবিতে প্রমথ অতিষ্ঠ করে তোলে বিপাশা ও তার পরিবারকে। কিন্তু পরিণতিতে নিরূপমার মতো বিপাশা আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয় না। বিপাশা আত্মপ্রত্যয়ী নারী। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। একসময় সে স্বামীর ঘরও ছেড়ে দেয়।

উদ্দীপক ও 'দেনাপাওনা' গল্পে বিপাশা ও নিরূপমা যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতার শিকার। আমাদের সমাজে তারা চরম অসহায় অবস্থায় নিপতিত। তারা না পারে যৌতুকের ব্যবস্থা করতে, না পারে প্রতিবাদ করতে, না পারে পরিবারের দুঃখ দূর করতে। তারা শুধু পারে আত্মবলি দিতে। দিতে পারাটাই যেন মুক্তির একমাত্র পথ। এভাবে 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে আত্মবির্সজনের পথ বেছে নেয়। সে নিজেকে পণপ্রথার নিকট সমর্পণ করে। কিন্তু উদ্দীপকের বিপাশা ভিন্ন ধাতুতে গড়া নারী। সে প্রচলিত পণপ্রথাকে ঘৃণা করেছে। শ্বশুরবাড়ির মানসিক নিপীড়নকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পৃথিবীর পথে নেমে এসেছে। বিপাশা নিজের ভবিষ্যৎকে নিজে গড়ার স্বপ্ন দেখেছে। অতএব বলা যায়, 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরূপমা সামাজিক প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে; কিন্তু বিপাশা প্রথার নিকট নিজেকে সমর্পণ করেনি। সে পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের প্রত্যয়ী অবস্থানকে তুলে ধরেছে। সমাজে প্রচলিত অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন না হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবাতো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

ক. 'রায় বাহাদুর' কাদের বলা হত?

খ. 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' –কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শ্বশুর 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? – ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "'দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্র যেন উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটিকেই তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. খ

বই পড়া

প্রমথ চৌধুরী

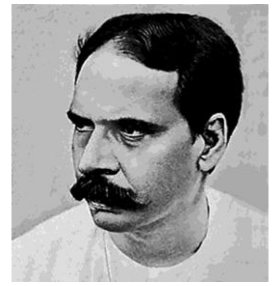

লেখক পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর থানার হরিপুর গ্রামে। কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন, ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বিএ ও ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে এমএ পাস করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান। ব্যারিস্টারি পাস করে ফিরে আসলেও তিনি সে-পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেননি। প্রমথ চৌধুরী নিজেকে প্রধানত সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯১৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা কথ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে তাঁরই হাতে। এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর প্রধান খ্যাতি মননশীল প্রবন্ধলেখক হিসেবে। শাণিত যুক্তি, আলঙ্কারিক ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত তীর্যক ভঙ্গি এবং চলিত রীতির সঙ্গে স্যাটায়ার ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নতুন গদ্যধারার জন্ম দেন তিনি। এ রচনার ধারাই 'বীরবলী' গদ্যের ধারা নামে পরিচিত। প্রমথ চৌধুরী ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য রচনা :

প্রবন্ধ গ্রন্থ	:	*তেল-নুন-লাকড়ি*, *বীরবলের হালখাতা*, *আমাদের শিক্ষা*, *রায়তের কথা*;
গল্প গ্রন্থ	:	*চার ইয়ারি কথা*, *আহুতি*;
কাব্য	:	*সনেট পঞ্চাশৎ*।

ভূমিকা

একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় পঠিত 'বইপড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। সমাজকে সভ্য ও প্রগতিশীল করতে হলে সাহিত্যচর্চার যে কোনো বিকল্প নেই তাই প্রবন্ধকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রবন্ধে প্রগতিশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে বই পড়ার উপযোগিতা, আবশ্যকতা, পাঠকের মানসিকতা ও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা লেখক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'বই পড়া' প্রবন্ধ পড়া শেষে আপনি–

- দেহের পাশাপাশি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নতির দীর্ঘমেয়াদী নিয়ামক হিসেবে বইপড়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- বই পড়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বই পড়া শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না; কেননা, আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই। দ্বিতীয়ত, অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন; কেননা, আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের দেশে সুন্দর জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সেই জীবনকেই সুন্দর করা, মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছে নিরর্থক এবং নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফল লাভের জন্য আমরা সকলে উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই-ই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে। কেননা, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাইনে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি এবং যিনিই যাই বলুন সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার দর নেই। এই কারণে ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা। ডেমোক্রেসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে কিন্তু তাদের শিষ্যরা তাদের কথা উল্টো বুঝে সকলেই হতে চায় বড় মানুষ। একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলো আয়ত্ত করতে না পেরে তার দোষগুলো আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক স্বাস্থ্য নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপদৃষ্টি আজ অর্থের ওপরই পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল-রিপোর্ট কেনেন, তারা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন, কেননা, তাতে ব্যবসার কোনো সুসার নেই। নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে হারতে হবে সে তো জানা কথা, কিন্তু যে কথা জজে শোনে না, তার যে কোনো মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভ্রান্তি। জ্ঞানের ভান্ডার যে ধনের ভান্ডার নয় এ সত্য তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সমান প্রত্যক্ষ না হলেও সমান সত্য যে, এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভান্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী। তারপর যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়; কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ এবং মানুষের মনকে সরল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের ওপরও ন্যস্ত হয়েছে। কেননা, মানুষের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, অনুরাগ-বিরাগ, আশা-নৈরাশ্য, তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে সেসব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে তার মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমানকাল সাহিত্যের ভেতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে এবং সেই গঙ্গাতে অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপমুক্ত হব।

অতএব, দাঁড়াল এই যে, আমাদের বই পড়তে হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ান্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি; ও-চর্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নয়। এইসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, সাহিত্যের মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।

আমাদের মনে হয়, এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও

করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে তাহলে রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন।

আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যের দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতাম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত ও ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত্ব-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবগাহন– সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে গোসল। ***আবহমানকাল–*** চিরকাল। **উত্তরসাধক–** পরবর্তীকালের সাধক বা সহায়ক। ***উদ্বাহু–*** ঊর্ধ্ববাহু; আহ্লাদে হাত উঠানো। ***উপায়ান্তর–*** অন্য কোনো উপায়। ***জজ–*** বিচারক। ***ডেমোক্রেসি–*** গণতন্ত্র। **নিরর্থক–** অর্থহীন। ***প্রচ্ছন্ন–*** আবৃত বা ঢাকা। **প্রত্যক্ষ–** স্পষ্ট; দৃষ্ট। ***ভাঁড়ে ভবানী–*** রিক্ত; শূন্য। **মহাভ্রান্তি–** ভীষণ ভুল ধারণা। **মাহাত্ম্য–** মহিমা; গৌরব। **রিপোর্ট–** আইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন। **লাইব্রেরি–** পাঠাগার; গ্রন্থাগার; পুস্তকাগার। ***শৌখিন–*** রুচিবান। ***সন্দিহান–*** সন্দেহযুক্ত। ***সোল্লাসে–*** উল্লাসসহ; সানন্দে। **সংক্রামক–** ছোঁয়াচে; সংস্পর্শে উৎপন্ন। ***স্বশিক্ষিত–*** নিজে নিজে শিক্ষিত।

সারসংক্ষেপ :

বই পড়ায় নগদ লাভ হয় না; কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির মনের বিকাশের জন্য বই পড়ার বিকল্প নেই। অন্য অনেক বাস্তব জ্ঞানের বইয়ের তুলনায় সাহিত্যেই মনের বিকাশ ভালো হয়। কারণ, সাহিত্যেই মানুষের জীবনের সার্বিক চিত্রটা ধরা পড়ে। বই পড়ার জন্য দরকার লাইব্রেরি। শরীরের চিকিৎসার জন্য যেমন হাসপাতাল দরকার, মনের বিকাশের জন্যও তেমনি লাইব্রেরি প্রয়োজন। লাইব্রেরিতে মানুষ নিজের আনন্দে স্বেচ্ছায় বই পড়ে। এরকম স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হলেই কেবল মানুষ সুশিক্ষিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘বীরবল’ কার ছদ্মনাম?
   ক. প্রমথ চৌধুরী   খ. গৌরাঙ্গ চৌধুরী
   গ. বিষ্ণু চৌধুরী   ঘ. অমিয় চৌধুরী

২. ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমরা কিসের দোষগুলো আয়ত্ত করছি?
   ক. পরিবারতন্ত্রের   খ. রাজতন্ত্রের
   গ. গণতন্ত্রের   ঘ. অভিজাততন্ত্রের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ডা. রুহুল আমিন দোকানে গিয়েছিলেন চিকিৎসাসংক্রান্ত কয়েকটি বই কিনতে। কেনাকাটা শেষ হলে কর্মচারী তাকে বললেন, "ইলিয়াড-এর একটি নতুন সংস্করণ এসেছে, নেবেন স্যার?"। ডা. আমিন মুখ বাঁকা করে বললেন, "ওসব কাব্য-টাব্য পড়ে কী লাভ? সময়ের অপচয়মাত্র।"

৩. উদ্দীপকের ডা. আমিন 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে তুলে ধরে?

ক. আইনজীবী খ. শিক্ষক

গ. খেলোয়াড় ঘ. ব্যবসায়ী

৪. উদ্দীপকের চরিত্র ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

i. সাহিত্যের নগদ বাজার দর নেই ii. সাহিত্যচর্চা ব্যয়বহুল iii. সাহিত্য পাঠে পুণ্য হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্কুল-কলেজের জবরদস্তিমূলক শিক্ষার কুফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় বিকাশের জন্য লাইব্রেরির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন যাঁরা শিশু সন্তানকে ক্রমান্বয়ে গরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। দুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির ওপর নির্ভর করে এ জ্ঞান ও শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাদের বিশ্বাস ও–বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে তাহলে সে যে বেয়াড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি করে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপান ক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য মাথা নাড়াতে, হাতপা ছুড়তে শুরু করে, তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরামুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ঐ একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সরল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।

আমরা কিন্তু এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক, উৎফুল্ল হয়ে উঠি। আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাশ হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। শিক্ষা শাস্ত্রের একজন জগদ্বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে, এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers ; অর্থাৎ যারা পাশ করতে পারেনি বা চায়নি তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল-পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

সে যুগে ফ্রান্সে কী রকম শিক্ষা দেওয়া হতো তা আমার জানা নেই। তবুও আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ যুগে আমাদের স্কুল কলেজে শিক্ষার যে রীতি চলছে, তার চাইতে সে শিক্ষাপদ্ধতি কিছুতেই নিকৃষ্ট ছিল না। সকলেই জানেন যে, বিদ্যালয়ে মাস্টার মহাশয়েরা নোট দেন এবং সেই নোট মুখস্থ করে তারা হয় পাশ। এর জুড়ি আর একটি ব্যাপারও আমাদের দেশে দেখা যায়। এদেশে একদল বাজিকর আছে, যারা বন্দুকের গুলি থেকে আরম্ভ করে উত্তরোত্তর কামানের গুলি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করে। তারপর একে একে সবগুলো উগলে দেয়। এর ভেতর যে অসাধারণ কৌশল আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গেলা আর ওগলানো দর্শকের কাছে তামাশা হলেও বাজিকরের কাছে তা প্রাণান্তকর ব্যাপার। ও কারদানি করা তার পক্ষে যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি অপকারী। বলা বাহুল্য, সে বেচারাও লোহার গোলাগুলোর এক কণাও জীর্ণ করতে পারে না। আমাদের ছেলেরাও তেমনি নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলাগুলো বিদ্যালয়ে গলাধঃকরণ করে পরীক্ষালয়ে তা উদ্‌গীরণ করে দেয়। এ জন্য সমাজ বাহবা দেয় দিক, কিন্তু মনে যেন না ভাবে যে, এ জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে। স্কুল কলেজের শিক্ষা যে অনেকাংশে ব্যর্থ, সে বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ লোকই একমত। আমি বলি, শুধু ব্যর্থ নয়, অনেক স্থলে মারাত্মক; কেননা আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের স্বশিক্ষিত হবার সে সুযোগ দেয় না, শুধু তাই নয়, স্বশিক্ষিত হবার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে। আমাদের শিক্ষাযন্ত্রের মধ্যে যে যুবক নিষ্পেষিত হয়ে বেরিয়ে আসে, তার আপনার বলতে বেশি কিছু থাকে না, যদি না তার প্রাণ অত্যন্ত কড়া হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ক্ষীণপ্রাণ জাতির মধ্যেও জনকতক এমন কঠিন প্রাণের লোক আছে, এহেন শিক্ষাপদ্ধতিও তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারে না।

আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের ওপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতিটি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল-কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে সে অপকারের প্রতিকারের জন্য শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। আমি পূর্বে বলেছি যে, লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়, তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষত প্রাচীন নজির দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো, তা কে না মানে? আমার উত্তর সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুই ভাগে বিভক্ত। যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলায় শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয়, একথা নির্ভয়ে বলা যায় না; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের ওপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, দুই-ই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। সেইজন্য সাহিত্যচর্চা দেশে একরকম নেই বললেই হয়; কেননা, সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে উদরপূর্তির কাজে লাগে না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই; অথচ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলেই মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্তব্য নয়। মানবের ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে যে মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তিলাভ করে না; তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা। অতএব, কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না। অর্থনীতিরও নয়, ধর্মনীতির নয়।

কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতির আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উলটো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার সপক্ষে এত বাক্য ব্যয় করলুম। সে বাক্যে আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা জানিনে। সম্ভবত হইনি। কেননা, আমাদের দুরবস্থার কথা যখন স্মরণ করি, তখন খালি কোমল সুরে আলাপ করা আর চলে না; মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে মাঝে মাঝেই কড়ি লাগাতে হয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অব্যাহতি– মুক্তি। **উত্তরোত্তর–** ক্রমান্বয়ে; পরপর। **উদ্গীরণ–** বমিকরণ; ঢেকুর তোলা। ***উদরপূর্তি–*** পেট ভরানো। ***এথেন্স–*** গ্রিসের রাজধানী। ***কেতাবি–*** কেতাব অনুসরণ করে চলে যে বা যারা। ***কারদানি–*** বাহাদুরি। ***গতাসু–*** মৃত। ***গলাধঃকরণ–*** গিলে ফেলা। **জগদ্বিখ্যাত–** পৃথিবী বিখ্যাত; জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ***জীর্ণ–*** হজম। ***ডেমোক্রেটিক–*** গণতান্ত্রিক। ***দাতাকর্ণ–*** মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র; কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ। ***ধান ভানতে শিবের গীত–*** অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। **নিষ্পেষিত–** সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করা হয়েছে এমন। **প্রত্যাখ্যান–** উপেক্ষা; গ্রহণ না করা। **বাজিকর–** জাদুকর; ঐন্দ্রজালিক। **বেয়াড়া–** অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন; একরোখা। **মনস্তুষ্টি–** মনের সন্তোষ; চিত্তের তৃপ্তি। **মন্দাগতি–** ধীর বা মন্থর গতি। **যকৃত–** কলিজা। **রেজিস্টারি–** সরকারি বইতে বা খাতায় নামাদি লিখন; নিবন্ধন। **শাস্ত্রী–** শাস্ত্রে বা যে কোনো বিশেষ বিদ্যায় পণ্ডিত; শাস্ত্রজ্ঞ। **স্বচ্ছন্দ–** নিজ ইচ্ছামতো; অনায়াস। **স্ফূর্তিলাভ–** উৎফুল্লতা।

সারসংক্ষেপ :

আমাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষা গেলানোর চেষ্টা করা হয়। এতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। বরং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বশিক্ষিত হবার যে ক্ষমতা থাকে, তা নষ্ট হয়। শিক্ষার লক্ষ্য কেবল পরীক্ষায় পাশ করা আর অর্থ উপার্জন হতে পারে না। বহু মানুষের মনের বিকাশ জাতির যে মানসিক জাগরণ ঘটাতে পারে, জাতির উন্নতির জন্য তার মূল্য অনেক বেশি। এ কারণেই স্কুল-কলেজের চেয়ে লাইব্রেরি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাঁধা-ধরা শিক্ষা মনকে নির্জীব করে। অন্যদিকে, সাহিত্যচর্চায় মন সজীব ও সতেজ হয়। তাই নগদ প্রাপ্তি কম হলেও জাতীয় প্রগতির জন্য সাহিত্যচর্চার প্রসার দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'কারদানি' মানে কী?

ক. কারবার পদ্ধতি খ. করসংক্রান্ত বিষয় গ. বাহাদুরি ঘ. পরিশ্রমী

৬. কীভাবে শিষ্যকে বিদ্যার সাধনা করতে হয়?

ক. নিজ চেষ্টায় খ. বই পড়ে গ. গুরুর চেষ্টায় ঘ. নোট পড়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

প্লেটো, এ্যারিস্টটল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সনদধারী ছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যে এ সকল মনীষী প্রাতঃস্মরণীয়।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন বাক্যটির মিল রয়েছে–

ক. শিক্ষা পদ্ধতি তাদের মনকে জখম করলেও একেবারে বধ করতে পারেনি।

খ. পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।

গ. গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

ঘ. আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না।

৮. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখকের মন্তব্য ও উদ্দীপকের মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. নিয়মের বাইরে শিক্ষিত ii. স্বশিক্ষায় শিক্ষিত iii. সুশিক্ষায় শিক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'গতাসু' শব্দের অর্থ কী?

ক. মৃত খ. মরণশীল গ. গতানুগতিক ঘ. গতকাল

১০. প্রমথ চৌধুরীর মতে শিক্ষকের কাজ হল–

i. বিদ্যা দান করা ii. মনের সক্ষমতা বাড়ানো iii. নতুন তথ্য জানানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আদৃতা অনিবার্য কারণে স্কুলে যেতে পারে না। তাই তার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হয়ে উঠে না। সে বাসায় বসে নিজেই শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। কারণ সে জেনেছে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।

১১. আদৃতার নিজে পড়ার আগ্রহ যে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়–

ক. লাইব্রেরি খ. বইপড়া গ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব ঘ. রচনার শিল্পগুণ

১২. উদ্দীপক ও 'বই পড়া' প্রবন্ধে যে বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে–

ক. ধর্মীয় শিক্ষা খ. নৈতিক শিক্ষা গ. স্বশিক্ষা ঘ. কারিগরি শিক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারাদি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া আবশ্যক।

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর কোন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে?

খ. 'সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।' –কেন? বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বই পড়া' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব নয়, খণ্ডাংশকে ধারণ করেছে মাত্র।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বই কেনার সামর্থ্য নেই। তবুও বিভিন্ন বন্ধুর নিকট থেকে বই সংগ্রহ করে পড়ে পায়েল। সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা, আত্মজীবনী, দর্শন– জ্ঞানজগতের সকল প্রদেশে তার যাতায়াত থাকা চাই। অন্য দিকে তার বন্ধু কাকলি বই কিনে বন্ধুদের উপহার দেয় কিন্তু নিজে খুব একটা পড়ে না। তার ধারণা এসব বই পড়ে কী হবে? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট।

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধ অনুসারে লেখকের মতে গ্রামে গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করা উচিত?

খ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক লাইব্রেরিকে হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?– আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের পায়েল 'বই পড়া' প্রবন্ধের একটি বিশেষ চিন্তার ধারক।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' থেকে সংকলন করা হয়েছে।

খ. 'বই পড়া' প্রবন্ধে লেখক বিশ্বাস করেন শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না–এজন্য তিনি উক্তিটি করেছেন।

পৃথিবীতে বস্তুগত ও ভাবগত সকল বিষয়েরই আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত আছে। তবে শিক্ষা এমন একটি ব্যাপার যা কখনো বিনিময় করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক বড়জোর শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করতে পারেন, কিন্তু শিক্ষিত করে তুলতে পারেন না। এটা নিজস্ব চর্চা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করে নিতে হয়। একারণেই প্রাবন্ধিক মন্তব্যটি করেছেন।

গ. শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়– ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের এই বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানুষের মানব সত্তা বিকাশের জন্য বই পড়া অপরিহার্য। বই মানুষের মানব সত্তা বিকাশে সহায়ক। বই পড়লে মানুষ শিক্ষিত হয়। এ জন্য শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। আর এই শিক্ষা নিজের চেষ্টাতেই অর্জন করতে হয়। অন্য কথায় বলা যায়, সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাল্যকাল হতে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংযোগ নেই। আমরা কেবল যেটুকু আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন সেটুকুই কণ্ঠস্থ করি। এতে আমাদের কোনোমতে কাজ চলে যায় মাত্র। তাতে কোনোক্রমেই মনের বিকাশ সাধিত হয় না। শিক্ষাকে রীতিমত হজম করতে হলে অনেক অপাঠ্য পুস্তককে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে হজম করতে হয়। ‘বই পড়া’ প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অ-পাঠ্যপুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আমরা জাতি হিসাবে সৌখিন নই বলে শখ করে কেউ বই পড়ি না। ফলে আমরা শিক্ষার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাই না। আমাদের অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাদের ধারণা বিদ্যাপীঠ থেকে ছেলে-মেয়েরা এমন পরিমাণ বিদ্যা অর্জন করবে যাতে ভাবীকালের সময়টা ভালোভাবেই কেটে যাবে।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করে না।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি সভ্য ও শিক্ষিত জাতির ভিত নির্ভর করে তার উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার উপর। তাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষা অর্জিত হবে আনন্দের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের বই গিলিয়ে নয়।

‘বইপড়া’ প্রবন্ধে লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, জোর করে কাউকে শিক্ষিত করা যায় না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। শিক্ষা মানুষকে অর্জন করতে হয় আনন্দের সঙ্গে। স্বশিক্ষিত হওয়ার জন্য মানুষকে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অনেক পাঠ্য-বহির্ভূত পুস্তকও পড়তে হয়। কিন্তু আমরা শিক্ষার ফলটা হাতে হাতে পেতে চাই। আমরা ধারণা করি বিদ্যাপীঠে পাঠিয়েই শিক্ষার্থীদের বিদ্যা অর্জন সারা হয়ে গেল। এই বিদ্যার জোরেই তারা বাকিটা জীবন আরাম-আয়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নেই যদিও বাল্যকাল হতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করি। এতে কোনোমতে কাজ চলে মাত্র কিন্তু ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না। উদ্দীপকে আরো বলা হয়েছে হাওয়া খেলে মানুষের পেট ভরে না কিন্তু খাবারকে হজম করার জন্য হাওয়ার প্রয়োজন।

শিক্ষা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ না করলে শিক্ষা সার্থক হয় না। এই বিষয়টি ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আর উদ্দীপকে বিষয়টিকে সংক্ষিপ্তরূপে তুলে ধরা হয়েছে। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকটি ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি, খণ্ডিত অংশকে তুলে ধরেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিত তবে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।

ক. প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িকপত্রের নাম কী?

খ. ‘এ আশা সম্ভবত দুরাশা।’ –কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘বই পড়া’ প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না।’ –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. খ ১২. গ

অভাগীর স্বর্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

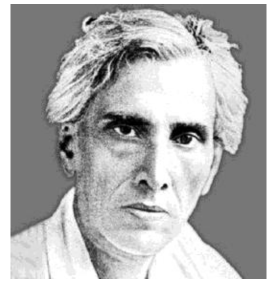

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। তিনি জীবনের প্রথম দিকে একটি জমিদারি এস্টেটে সামান্য চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯০৩ সনে তিনি সমুদ্র পথে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। ১৯১৬ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ অঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *বড়দিদি, পরিণীতা, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, দেবদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত (৪ পর্ব), গৃহদাহ, দেনা পাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন;*

গল্প গ্রন্থ : *মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, হরিলক্ষ্মী, বিলাসী, মামলার ফল।*

ভূমিকা

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি সুকুমার সেন সম্পাদিত 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই গল্পটিতে সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্ববোধ, সমাজে প্রচলিত কার্যপ্রথা, জাতবিভেদ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দৃষ্টান্তের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উঁচু জাতের হিন্দু পরিবারের মৃতের সৎকারে আড়ম্বর, সামন্ত প্রভুদের নির্মমতা এবং নিচু শ্রেণির হতদরিদ্র মানুষের জীবন-যন্ত্রণা সম্পর্কে লেখক হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনা দিয়েছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'অভাগীর স্বর্গ' গল্প পাঠ শেষে আপনি–

- নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন।
- মানুষের ধর্মীয় জীবনও যে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের শবযাত্রা ও সৎকারের বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা– প্রতিবেশির দল, চাকর-বাকর– সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোনো শোকের ব্যাপার –এ যেন বড়বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নতুন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষে দুফোটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত-আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল। সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণে গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা, –সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড়– নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু'চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপুত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো– আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী, দাস, দাসী পরিজন–সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ– দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,– এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য-প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতাপাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে– মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল– দুটি আলতায় রাঙানো। উর্ধ্বদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ বাবা,– বামুন-মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল কৈ? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরছে, তুই কেন কেঁদে মরিস মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁশ হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এইভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে!– চোখে ধোঁ লেগেছে বৈ ত নয়!

হাঃ– ধোঁ লেগেছে বৈ ত না! তুই কাঁদতেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,– শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া– মৃত ব্যক্তির সৎকার; মৃত্যের জন্য অন্তিম বা শেষ অনুষ্ঠান। ***মুখুয্যে–*** মুখোপাধ্যায়; পদবির সংক্ষিপ্ত রূপ। ***বর্ষীয়সী–*** অতি বৃদ্ধ; স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। ***সঙ্গতিপন্ন–*** অর্থ-সম্পদের অধিকারী। ***সগ্য–*** স্বর্গ শব্দের কথ্যরূপ। ***অন্তরীক্ষ–*** আকাশ; গগন। **আচ্ছাদিত–** আবৃত; ঢাকা। **কলরব–** বহুকণ্ঠের সম্মিলিত গুঞ্জন; কোলাহল। **শ্মশান–** যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। **মূঢ়তা–** বোকামি; আহম্মকি।

সারসংক্ষেপ :

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ধনী মানুষ। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, জামাই-প্রতিবেশি, চাকর-বাকর মিলে বিরাট সংসার। তার স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। সবাই দুঃখ পেয়েছে সত্য, কিন্তু শবযাত্রা আর সৎকারের এত বড় আয়োজন হল যে ব্যাপারটা উৎসবের মতোই হয়ে উঠল। ছোটজাতের মেয়ে কাঙালীর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্মশানে মড়া পোড়ানোর দৃশ্য দেখছিল। স্বামী-পুত্র-পরিজনের এই আয়োজন– তার কাছে মুখুয্যেবাড়ির বউয়ের এই মৃত্যু বড়ই ভাগ্যের ব্যাপার মনে হল। কাঙালীর মার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু ছেলে আছে। মৃত্যুর পর তাকেও যেন এভাবে পোড়ানো হয়, সে যেন ছেলের হাতের আগুন পায়– এই গভীর আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী কে?

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	খ. মানিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. অনিমেষ চন্দ্র পাল	ঘ. তাপসচন্দ্র পাল

২. অভাগী ছেলের হাতের আগুনকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছে?

ক. শিব	খ. স্বর্গ
গ. হরি	ঘ. রথ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোলকাতায় বসবাস। মায়ের অসুস্থ হবার সংবাদ পেয়ে কোলকাতা থেকে যাত্রা করে গভীর রাতে বাড়ির নিকটে এসে নদীর তীরে পৌঁছেন। নদীতে পারাপারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে পানিতে সাঁতার দিতে হয়।

৩. উদ্দীপকের চরিত্রটি আপনার পাঠ্য গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. কাঙালী খ. জমিদার

গ. রসিক দুলে ঘ. গোমস্তা

৪. গল্পের যে বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে–

i. মায়ের প্রতি ভালোবাসা ii. মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ iii. মায়ের ঋণ পরিশোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অভাগী ও তার ছেলে কাঙালীর গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বৈ কি! কৈ, দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়েসের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গীসাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলাধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে।

একহাতে গলা জড়াইয়া, মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই–

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া-পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুন রথে করে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা! রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের উপরে বসে। তেনার রাঙা পা-দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!

সবাই দেখলে?

সব্বাই দেখলে।

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর

কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তাহলে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসীকে বলতেছিল, ক্যাঙ্‌লার মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে-পাড়ায় নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল, কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত নিকে করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুত সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত-উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটি পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!

না দিক গে, –আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হলে।

রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া–

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ-সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র– সে এমন উপকথা শুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়– নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই– কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনি। সেই রথ, সেই রাঙ্গা পা-টি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তার পরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সে ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কে মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ– বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেই পাইল না, তপ্তনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না– দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন,– রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,– কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া

কাঁদাকাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস–কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভালো হইত এতেই হবো, বাগদী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টিযোগ জানিত, হরিণের শিঙ-ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে কিছু হলো না বাবা আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনি ভালো হবো।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?

আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভালো করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না– ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারায় জল পড়িতে লাগিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ইন্দ্রজাল– জাদুবিদ্যা; এখানে গল্পের মাধ্যমে মুগ্ধ বা মোহিত করে রাখার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে। **উপকথা–** কল্পিত গল্প; উপাখ্যান। **উৎপাত–** উপদ্রব। **কোটালপুত্তুর–** নগর-রক্ষকের ছেলে, কোতোয়ালের পুত্র। ক্রোড়– কোল। ***তেনার–*** তার; তাঁর। ***দুলে–*** পালকি বহনকারী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; নিচু জাতের মানুষ বলে অভিহিত। **নিকে–** বিবাহ। **পুলকে–** আনন্দে। ***প্রণামী–*** পুরোহিত বা দেব-দেবীকে দেওয়া সালামি; এখানে কবিরাজকে দেওয়া চিকিৎসা ফি হিসেবে দেওয়া টাকা বোঝানো হয়েছে **প্রলুব্ধ–** অতিশয় লোভাতুর; এখানে লোভ দেখানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ***প্রসন্ন–*** সন্তুষ্ট; খুশি। ***প্রসন্নমুখ–*** খুশি ভরা মুখ। **বিস্ময়ে–** অবাক হয়ে। ***ভগ্নকণ্ঠ–*** ভাঙা স্বর। ***ভুক্তাবশেষ–*** ভোজন বা খাওয়ার পরে পাতে যা পড়ে থাকে। **রাজপুত্তুর–** রাজার ছেলে। **রূপকথা–** অসম্ভব কাল্পনিক কাহিনি। ***রোমাঞ্চ–*** শিহরণ; অনুভূতির তীব্রতায় গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া। ***শশব্যস্ত–*** খরগোশ বা শশকের মতো ব্যস্ত। এখানে অতি আবেগে কাঙালীর ভাঙা বা বিকৃত স্বরে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। **সমাধা–** সমাধান শব্দের কথ্যরূপ।

সারসংক্ষেপ :

শ্মশান থেকে ফিরেই জ্বরে পড়ে অভাগী। বড়ই অভাবের সংসার তার। নিজে না খেয়ে ছেলের ভাত জুগিয়েছে। আজ শ্মশানের একটা দৃশ্য তার মনে গেঁথে গেছে। মুখুয্যে-বউয়ের চিতা থেকে যে ধোঁয়া উঠছিল আকাশের দিকে, সে যেন পরিষ্কার দেখতে পেল তাতে রথে চড়ে বউ যাত্রা করেছে স্বর্গের দিকে। সে কথাই সে কাঙালীকে বলে। বলে, সে যেন ছেলের হাতের আগুন পায়। স্বামীর পায়ের ধুলো পায়। তাহলে সেও স্বর্গে যেতে পারবে। ছোটলোক বলে আর কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। অভাগীর জ্বর বাড়ছিল। জ্বরের ঘোরে সে তার ছেলেকে এসব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. কাঙালীকে আর কত বৎসর অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?

ক. এক বৎসর
খ. দুই বৎসর
গ. তিন বৎসর
ঘ. চার বৎসর

৬. রূপকথা শোনার সময় কাঙালী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে যে কারণে–

i. ভয়   ii. বিস্ময়   iii. আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i, ii   ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।

৭. উদ্দীপকের বাপ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. অভাগী   খ. রামসুন্দর

গ. ঈশ্বর নাপিত   ঘ. রসিক দুলে

৮. উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

ক. বাৎসল্য   খ. মর্ত্য প্রীতি

গ. ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা   ঘ. খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জমিদারি ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকারহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধর্মীয় বিধি-বিধানের শ্রেণিগত-বর্ণগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে– ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে–

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদাকাটা করিস বাবা, বলিস মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অমনি নাপতে-বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালোবাসে।

ভালো তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে, সে সেইখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ-সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে– পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলোর প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসী দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালোবাসা দেয় নাই, অশন-বসন দেয় নাই, কোন খোঁজখবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন-কায়েতের ঘরে না জন্মে, ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালে কেন ! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা– ক্যাঙালার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটা কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়,– কিন্তু এটা বুঝা গেল, রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেলগাছ, একটা কুড়াল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দারোয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কষাইয়া দিল; কুড়াল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ, দারোয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দারোয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকাহাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভালো হয় নাই। তাহারাই আবার দারোয়ানজীর হাতে-পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে-কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মার তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দারোয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত-মুখ বাড়িয়া জানাইল, এ-সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্তা। লোকগুলো যখন হিন্দুস্থানিটার কাছে ব্যর্থ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারিবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলাদেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দারোয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা, খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল, –আমার মা মরেচে –বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

এই কান্নাকাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল নাকি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ার কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসী একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়– পাজী, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ।

হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীই পারে।

কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়,– হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে-বাড়িতে শ্রাদ্ধের দিন– মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।

তুই কে? কি চাস তুই?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দি গে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। –এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার, –কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না– এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্তভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখচেন ভট্চার্যমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তার পরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত, –শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অগোচরে– অপ্রকাশ্যে; অজ্ঞাতে। ***অশন–*** খাদ্যদ্রব্য; আহারের বস্তু। **উত্তরীয়–** চাদর। **উদ্যত–** উদ্যোগী; উন্মুখ। **তথাপি–** তা সত্ত্বেও; তবুও। ***নিস্তব্ধ–*** নিশ্চল; নিঃসাড়; নির্বাক। **প্রতিবিধান–** প্রতিকার। **ফর্দ–** তালিকা। **বিলুপ্ত–** বিলীন। ***সংস্কার–*** বিশ্বাস; ঝোঁক; আজন্ম ধারণা। ***সন্ধ্যাহ্নিক–*** সন্ধ্যাবেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিত্যকরণীয় পূজা। ***হরিধ্বনি–*** হরি নামের ধ্বনি; হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মৃতদেহ বহন করার সময় সমবেত কণ্ঠে দেবতা হরির নাম উচ্চস্বরে বলে থাকে, একে হরিধ্বনি বলে।

সারসংক্ষেপ :

সেই জ্বরেই অভাগীর মৃত্যু হল। মরার আগে কাঙালী তার বাবাকে নিয়ে এল। অভাগী অচেতন অবস্থায় পায়ের ধুলা নিল। কিন্তু তার বহু আকাঙ্ক্ষার দাহের আয়োজন করা অত সহজ ছিল না। তাদের ঘরের পাশেই একটা বেলগাছ। গাছ কাটার আয়োজন করতেই জমিদারের লোক এসে কুড়াল কেড়ে নিল। কাঙালী ছুটল জমিদারের কাছারিতে। পেল গলাধাক্কা আর গালিগালাজ। কাঠ চাইতে ঠাকুরদাস মুখুয্যের কাছেও সে গিয়েছিল। মায়ের শেষ আকুতি পূরণের জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু নিম্নবর্ণের এই মহিলার চিতায় চড়ার শখই সবার কাছে রসিকতার বিষয় বলে গণ্য হল। শেষ পর্যন্ত অভাগীকে মাটিচাপা দেওয়া হল নদীর চরে। এর আগে প্রতিবেশী রাখালের মার উদ্যোগে কাঙালী খড়ের আঁটি জ্বেলে মায়ের মুখে ছোঁয়ালো। ফেলে দেওয়া খড়ের আঁটি থেকে ধোঁয়া উঠছিল। কাঙালী অপলকে সেদিকে চেয়ে রইল। হয়ত তার মায়ের স্বর্গারোহণের রথ দেখা যায় কিনা, তাই দেখছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. অভাগীকে মৃত্যুর পর কোথায় শোয়ানো হয়েছিল?

ক. নদীর চরে　　খ. পাহাড়ের গর্তে

গ. বেলা ভূমিতে　　ঘ. বালুর মাঠে

১০. 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ফুটে উঠেছে–

ক. সংসার প্রীতি　　খ. সামন্তবাদের নির্মম রূপ

গ. ধানের কারবারের বিবরণ　　ঘ. ঈশ্বর নাপিতের কথা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অর্থের অভাবে হরিপদের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হলো না তার ছেলের পক্ষে। তাই পলকহীন চোখ মেলে সে উপরের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

১১. উদ্দীপকের ছেলেটি 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. রামসুন্দর　　খ. অধর চন্দ্র

গ. রসিক দুলে　　ঘ. কাঙালী

১২. এই সাদৃশ্যটি যে বিষয়ে–

i. সমাজের নির্মমতায়　　ii. সমাজের অনগ্রসরতায়　　iii. সমাজের অলসতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১৩. জমিদারের গোমস্তার নাম কী?

ক. অধর রায় খ. অধর পাড়ে

গ. অধর মুখোপাধ্যায় ঘ. অধর ভট্টাচার্য

১৪. 'বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল।' –এখানে অন্য বাঘিনী কে?

ক. রসিকের দ্বিতীয় স্ত্রী খ. কাঙালীর মা

গ. কুলীন রায়ের প্রথম স্ত্রী ঘ. ঠাকুর দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী

১৫. 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানটি কোন ধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ?

ক. ইসলাম ধর্ম খ. বৌদ্ধ ধর্ম

গ. জৈন ধর্ম ঘ. হিন্দু ধর্ম

১৬.'সব ব্যাটারাই এখন বামুন-কায়েত হতে চায়।' বাক্যটিতে প্রকাশিত হয়েছে–

i. বিরক্তি ii. হিংসা iii. বিদ্রূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জয়িতা এখনো স্কুলে যায়। ভীষণ আত্মপ্রত্যয়ী মেয়ে সে, হার না মানা স্বভাব তার। তার বয়স যখন ছয় মাস তখন তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। বাবা নতুন বিয়ে করে সংসার করছেন। তাই জয়িতা মায়ের কাছে বড় হয়েছে। তার বয়স এখন আঠারো। নিত্যদিন তাকে ক্ষুধা আর দৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এভাবে তার দিন কাটে আর মাস যায়। জয়িতা শিক্ষা-দীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, মায়ের কষ্ট দূর করতে চায়।

ক. অভাগীর স্বামীর নাম কী?

খ. 'কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট।'– বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

গ. জয়িতা 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? – আলোচনা করুন।

ঘ. "জয়িতার মায়ের স্বপ্নে অভাগীর স্বপ্নের অনুরণন রয়েছে।"– উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

দীর্ঘ দিন রোগভোগের পর সঞ্জয় দত্ত প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন যে, তার মৃতদেহ যেন যথাযথভাবে দাহ করা হয়। ছেলে বাবার মৃতদেহ দাহ করার জন্য গোয়ালের গরুটি বাজারে বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিল। পথে জমিদারের গোমস্তা বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য পথ আটকে দাঁড়ায়। টাকাগুলো নিয়ে গোমস্তা চলে যায়। অপলকনেত্রে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সঞ্জয় দত্তের ছেলে। সঞ্জয় দত্তকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশে মাটি খুঁড়ে সমাহিত করা হয়েছিল।

ক. কাঙালী কবিরাজকে কত টাকা প্রণামী দিয়েছিল?

খ. 'অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল।' –উক্তিটিতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগীর স্বপ্নের মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানের অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ একই সূত্রে গাঁথা।" –উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

কার্তিক চন্দ্র রায় একসময় জমিদার ছিলেন। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ তার কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায় না। একদিন তিনি কাছারি বাড়িতে বসে আছেন। সে সময় একটি অসহায় দরিদ্র বালক এসে বলল, "আমার মা মরেছে। মায়ের সৎকারের জন্য কিছু

টাকা দেবেন জমিদার বাবু।” জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, “মা মরেছে তো কী হয়েছে, যা, দূরে সরে দাঁড়া। ওরে তোরা কে কোথায় আছিস? এখানে একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে। কী জাতের ছেলেরে তুই?”

ক. কাঙালী কোন জাতের ছেলে?

খ. অভাগী মৃত্যুকালে কেন স্বামীকে ডেকে পাঠিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের জমিদারের সঙ্গে ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র কোনটি? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে একই সামাজিক সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে।” –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. অভাগীর স্বামীর নাম রসিক বাঘ।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে কাঙালীর মায়ের ছোট ও অতি সাধারণ জীবনকালকে বোঝানো হয়েছে।

কাঙালীর মায়ের প্রায় ত্রিশ বছরের ছোট্ট জীবনটুকু বেদনায় ভরা। তাকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা গিয়েছিল। বাপ রাগ করে নাম দিয়েছেন অভাগী। সে অভাগী একদিন মা হল। কিন্তু একসময় স্বামীও তাকে ছেড়ে চলে যায়। কাঙালীকে নিয়ে অভাব-অনটনে ক্ষুদ্র জীবনকাল কাটিয়ে অভাগী একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ ছিল কাঙালীর মায়ের ছোট জীবনের করুণ ইতিহাস।

গ. জয়িতা ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

মানুষ স্বপ্নবিলাসী। সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে। উদ্দীপকে জয়িতা এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালী তাদের মায়ের কষ্ট দূর করতে চায়। আত্মপ্রত্যয়ী ও পড়াশোনায় মনোযোগী জয়িতা এবং কাজে নেমে পড়া অধ্যবসায়ী কাঙালী হয়ত একদিন সফল হবে তাদের মায়ের স্বপ্ন পূরণে।

উদ্দীপকে জয়িতা পিতৃহারা, মায়ের চোখের মণি। মা তাকে অনেক কষ্টে বড় করে তুলেছেন, জয়িতার স্বপ্ন সে মায়ের কষ্ট দূর করবে। তেমনি ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালীও পিতৃহারা ছেলে, শতকষ্ট আর অভাবের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মা তাকে বড় করে তুলেছে। পনের বছর বয়সেই সে বেতের কাজ শিখতে আরম্ভ করেছে। মায়ের স্বপ্ন আর বছর খানেকের মধ্যেই কাঙালী তার দুঃষ্ট-কষ্ট দূর করবে। কাঙালীর মা অভাগী ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রীর মতো তার মুখাগ্নি পেয়ে রথে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করবে।

ঘ. উদ্দীপকে জয়িতার মা এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালীর মা সন্তানের ক্ষেত্রে একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে।

পিতা-মাতা সন্তানের মধ্য দিয়ে তাদের অপূর্ণতা পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখে। উদ্দীপকে জয়িতার মা ও ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালীর মা তেমনই স্বপ্ন দেখে। তারা মনে করে সন্তান বড় হলে তাদের দুঃখ ঘুচবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা নিজ সন্তানদের মানুষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে জয়িতার মা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে সন্তানবাৎসল্যে নিজের কন্যা সন্তানকে অনেক কষ্টের ভেতরও পড়াশুনা করাচ্ছে। তার স্বপ্ন কন্যা তার দারিদ্র্য ও কষ্ট সবই দূর করবে। তদ্রূপ ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালীর মা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে নিজের ছেলে কাঙালীকে অনেক কষ্টের ভেতরও পরম মমতায় বড় করে তুলেছে। পনের বছরের কাঙালী বেতের কাজ শিখছে। হয়ত সে তার মায়ের কষ্ট অচিরেই লাঘব করতে পারবে।

সন্তান মানুষ করতে গেলে মা-বাবাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কোনো কারণে সংসার ভেঙে গেলে তার প্রভাব সরাসরি সন্তানের ওপর পড়ে। উদ্দীপকে জয়িতা ও ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে কাঙালী সে পরিস্থিতির শিকার। সন্তান প্রতিপালনের সময় কেউ না কেউ একটু বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন। উভয়ের ক্ষেত্রে মা বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। জয়িতা ও কাঙালীর মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে হয়তো সুখে থাকতে পারতো, কিন্তু জয়িতা ও কাঙালী বড় হত বিরূপ পরিবেশে। কষ্টসহিষ্ণুতা ও সন্তানবাৎসল্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত জয়িতা ও কাঙালীর মা একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর:

ক. কাঙালী কবিরাজকে এক টাকা প্রণামী দিয়েছিল।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে অভাগীর জীবন অবসানের পূর্ব মুহূর্তকে বোঝানো হয়েছে।

জীবনাবসানের পূর্বে অভাগী পুত্রকে তার মনের ইচ্ছাটুকু ব্যক্ত করে। পুত্র যেন শেষ মুহূর্তে তার পিতাকে ডেকে আনে, নিজ হাতে মায়ের মুখে যেন আগুন দেয়, মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেয়। এসব ছিল অভাগীর জীবন নাট্যের শেষ আরজি। অতি অল্পকাল অভাব অনটনে দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করে অভাগীর জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি হয়।

গ. উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর স্বপ্নের মৃতদেহ সৎকার অনুষ্ঠানে অমিল রয়েছে।

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষ মারা যাওয়ার পরে শাস্ত্রসম্মতভাবে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে। আমাদের সমাজে নিচু স্তরের মানুষের দৈন্যদশা এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকতা হলেও তা ছিল নামে মাত্র।

উদ্দীপকে সঞ্জয় দত্তের ছেলে বাবার শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ করার জন্য পালের গরু বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফেরার সময় জমিদারের গোমস্তা খাজনা আদায়স্বরূপ টাকাটা জোর করে রেখে দেয়। ফলে আগ্রহ থাকলেও সঞ্জয় দত্তের ছেলের পক্ষে বাবার শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করা সম্ভব হয়নি। দুঃখিনী অভাগীও নিজের মৃত্যুর সময়ের সৎকার অনুষ্ঠানের স্বপ্ন দেখে। সে চন্দন, সিঁদুর, আলতা, মালা, ধূপ, ধুনা ও অগ্নির ধোঁয়া সম্বলিত রথে করে মুখুয্যে বাড়ির গিন্নির মতো স্বর্গে যেতে চায়। সে আরও স্বপ্ন দেখে মৃত্যুর সময় স্বামীর পায়ের ধুলো নিচ্ছে, আর মৃত্যুর পরে পুত্র মুখাগ্নি করলে সেও স্বর্গে যাবে। দেখা যায়, উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

ঘ. সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার অন্তিম ইচ্ছাগুলো পুরণ করতে হয়। আমাদের সমাজের নিচু স্তরের মানুষের দৈন্যদশা এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত এং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের অভাগী তাই সমাজের বৈষম্যনীতি ও কুসংস্কারের কাছে হেরে যায়।

উদ্দীপকের সঞ্জয় দত্ত গরিব। বিনা চিকিৎসায় তার মরণ আসে। তার শেষ ইচ্ছা হচ্ছে মরার পর যেন তাকে দাহ করা হয়। তেমনি অভাগী গরিব এবং স্বামী পরিত্যক্ত। মরণের আগে সে স্বামীর পায়ের ধুলো পেলেও মুখুয্যে-পত্নীর মতো আগুন পায় নি। উভয়ক্ষেত্রে তাদের শেষ ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের সামাজিক মর্যাদার কারণে।

উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দুটোতেই মৃতদের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ে জাতপ্রথা ও আর্থিক বৈষম্যের কারণে। তাই বলা যায়, সঞ্জয় দত্ত ও অভাগীর শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার কারণ একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

উৎপল তার বাবাকে কখনো দেখেনি। জন্মের আগেই তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছেন। সে বড় হয়েছে মার কাছে। বড় হয়েছে অভাব, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যকে নিত্য সঙ্গী করে। বড় হয়ে সে নাট্যকার হতে চায়। শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। জীবন সংগ্রামে হার না মানা একজন নওজোয়ান উৎপল।

ক. 'দুলে' শব্দের অর্থ কী ?

খ. 'কি জাতের ছেলে তুই?।' –অধর রায় কেন এ কথা বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের উৎপলের সঙ্গে কাঙালীর বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধবুন।

ঘ. "উদ্দীপকের উৎপল 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের কাঙালীর চেয়ে জীবন-ভাবনায় অগ্রসর।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. ক ৯. ক ১০. খ ১১. ঘ ১২. ক
১৩. ক ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. ঘ

নিরীহ বাঙালি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

লেখক পরিচিতি

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও মাতা রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরানী। সেকালে নানা কুসংস্কারের কারণে বেগম রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয়নি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চাই নারী মুক্তির জন্য নিবেদিত। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত না হলে তাদের মনের প্রসার কিছুতেই সম্ভব হবে না এবং মুসলমান সমাজও কিছুতেই গড়ে উঠবে না– একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য নিজেই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজ-মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতার সুর সহজেই চোখে পড়ে। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও মুসলমান বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাতয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সুলতানার স্বপ্ন, *পদ্মরাগ*, *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর*।

ভূমিকা

'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটিতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাঙালি নারী পুরুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক হাস্যরসাত্মকভাবে বর্ণনা করেছেন। এ রচনায় বাঙালির কর্মে খ্যাতি অর্জনের চেয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যে পাওয়া খ্যাতিতে আগ্রহের কথা কটাক্ষ করে তুলে ধরেছেন। বাঙালি পুরুষের কর্মবিমুখতা এবং বাঙালি নারীর দুর্বলচিত্ত ও অহেতুক রূপচর্চা সম্পর্কে এখানে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- বাঙালির বৈশিষ্ট্য ও আচরণের কিছু দিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- যে বৈশিষ্ট্যগুলো বাঙালির পরিহার করা উচিত, সেগুলোর বিবরণ লিখতে পারবেন;
- হাস্যরসাত্মক রচনার বিশেষ ভঙ্গি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যুথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা– এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙালি গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রুপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা– যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজি ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙালি তাহাতে সাজসজ্জা (drawing room suit)! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙালি তাহাতে পদ্মিনী। যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙালি পুরুষিকা! অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলো,– পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল– অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলো– ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা– অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল– রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক– সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেশে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রুপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চালনের (Ventilation এর) কোন বাধা বিঘ্ন হয় না ! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী– হেমাঙ্গী, কেষ্ণাঙ্গীগণ তদানুকরণে ইংরাজ ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম 'হাওয়ার শাড়ি' পরেন। বাঙালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুটি চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্ধবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্যি ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য– নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা রূপা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিষটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়– পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাসের মূল্য কত জান? "অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এমএ পাস অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য– এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙালি

কিনা তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্নবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিবিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ। এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M.R.A.C পাশ করা সহজ। আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য কৃষি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তাতে আমাদের কী?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা :

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজ্য" উপাধি লাভ সহজ।
(২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc ও D.Sc পাস করা সহজ।
(৩) অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।
(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বেদেশীয় বড় লোকদের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।
(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।
(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।
(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, milk of rose and Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।
(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য– আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নিত উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ– তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসি দাও !

আমরা সকলেই কবি– আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটিজুতা"– কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নতুন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা– "অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজলনয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ– প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে ! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অমিয়াসিক্ত– অমৃত বা সুধা দ্বারা ভেজা। ***আত্মপ্রশংসা–*** নিজের প্রশংসা। **অন্নোৎপাদন–** খাদ্য উৎপাদন। **কর্ষণ–** চাষ। ***কালিডোর, মিল্ক অব রোজ, ভিনোলিয়া পাউডার–*** সৌন্দর্যবর্ধক সামগ্রী। **কোমলাঙ্গ–** নরম শরীর। ***কুন্তলীন–*** লেখকের আমলে চুলে দেয়ার জনপ্রিয় তেলের নাম। **কৃষ্ণাঙ্গী–** কালো বর্ণের দেহ। **চন্দ্রিকা–** জ্যোৎস্না। **জওয়াহেরাৎ–** মণিরত্মাদি; বহুমূল্যবান প্রস্তরসমূহ। **জীর্ণ–** শীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত। ***ঝঞ্ঝাবাতে–*** ঝঞ্ঝার বাতাসে। **তরলমতি–** অস্থির; চঞ্চল। ***তণ্ডুল–*** চাল। **তুষানল–** জ্বলন্ত তুষের আগুন যা ধিক ধিক করে বহুক্ষণ ধরে জ্বলে। **ত্রিবিধ–** তিন প্রকার। ***দিব্যাঙ্গনা–*** স্বর্গের রূপসি; হুরপরি। **নবনী–** ননী;

মাখন। **নৈরাশ্য–** আশাহীনতা; হতাশা। **পরিত্যাজ্য–** বর্জনীয়; বর্জন বা ত্যাগ করা যায় এমন। **পদ্মিনী–** কমলিনী; পদ্মযুক্তা। **পারদর্শিতা–** বিচক্ষণতা; দক্ষতা । **ভগ্ন শূর্প–** ভাঙা কুলা। **মসী-*হাওয়ার শাড়ি*–** সূক্ষ্ম সুতোর শাড়ি। **মূর্তিমান–** সাকার; মূর্তি বা শরীর ধারণ করেছে এমন। **যূথিকা–** যুঁই ফুল। ***শুভ্রনীলাম্বর*–** পরিষ্কার নীল আকাশ। **শ্রমকাতর–** পরিশ্রম বা মেহনত করতে কষ্ট বোধ করে এমন। **সলিল–** পানি; বারি। **সমুদয়–** সব; সকল। ***সাশ্রুসজলনয়ন*–** জলভরা চোখ। **সুপ্তি–** তন্দ্রা; ঘুম। **হেমাঙ্গী–** সুন্দরী নারী। ***সৌকুমার্য*–** সৌন্দর্য।

সারসংক্ষেপ :

বাঙালি অপ্রয়োজনীয় রকমের নিরীহ আর কোমল। উপন্যাসের নায়িকা যেমন, সাহিত্যে কাব্য যেমন, বাঙালিও অনেকটা সেরকম। বাঙালির খাবার, পোশাক আর অবয়বেও লেখক প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার অভাব লক্ষ করেছেন। বাণিজ্য বাঙালি করে বটে, কিন্তু তাতে উদ্যমের বড়ই অভাব। কৃষিকাজের পরিশ্রম নয়, সে চায় মস্তিষ্কচর্চার আরাম আর আলস্য। নকল করায় সে ওস্তাদ, ফাঁকিতে সিদ্ধহস্ত; সার্টিফিকেট বিক্রি করে শ্বশুরের অর্থ লুণ্ঠনে তার ব্যাপক আগ্রহ। আলস্যে বাঙালি নারীও কম যায় না। বাংলা অঞ্চলে বীররস দুর্লভ। এখানে করুণরসেরই প্রাধান্য। হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে লেখক বাঙালি জীবনের বহুদিকের সমালোচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে আত্মসমালোচনা করে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘পাস বিক্রয়’ ব্যবসায়ের বিক্রেতা কে?
   ক. বর — খ. বরের পিতা
   গ. কনে — ঘ. কনের পিতা

২. ‘কুন্তলীনের সঙ্গে ‘কেশলীন’ বিক্রয় হয়।’ উক্তিটির মানে হচ্ছে–
   ক. মান নিয়ন্ত্রণের অভাব — খ. তুচ্ছ জিনিসের ছড়াছড়ি
   গ. উৎপাদনের আধিক্য — ঘ. অবাধ নকল প্রবণতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শিল্পপতি কবির সাহেব বিপদে না পড়লে গরীব মানুষকে সাহায্য করেন না। সুনজরের প্রত্যাশায় এবার তাকে দেখা গেল স্থানীয় সংসদ সদস্যের জন্মদিনে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে।

৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে আপনার পাঠ্য কোন প্রবন্ধের মিল রয়েছে?
   ক. নিরীহ বাঙালি — খ. বাঙলা শব্দ
   গ. পয়লা বৈশাখ — ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৪. উদ্দীপক ও ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধ আমাদের চরিত্রের কোন দিকটি তুলে ধরে?
   i. অল্প আয়াসে লাভের প্রত্যাশী — ii. কোমলতা ও মহানুভবতা — iii. সহজলভ্য জীবিকা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i — খ. ii — গ. iii — ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘নিরীহ বাঙালি’ কী জাতীয় রচনা ?
   ক. নারী উন্নতি বিষয়ক — খ. পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক
   গ. হাস্য রসাত্মক — ঘ. জাতীয় দুর্যোগ বিষয়ক

৬. ‘আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না।’ –উক্তিটিতে বেগম রোকেয়া বাঙালি জাতির কোন বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন?
   ক. আলস্যপ্রিয়তা — খ. সংস্কৃতিপ্রিয়তা
   গ. খাদ্যব্যবহারে বৈচিত্র্য — ঘ. ঐতিহ্যপ্রিয়তা

৭. ‘হাল চাষের চেয়ে গরুর দুধ পান করা সহজ।’ –বাক্যটিতে ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধ অনুযায়ী বাঙালির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় তাহলো–

i. নমনীয়তা ii. আরামপ্রিয়তা iii. কর্মবিমুখতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঝিলাম উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে চাষাবাদ করত। সম্প্রতি সে চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে রাঢ়িখাল বাজারে প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান করেছে। তার ধারণা, এতে তার সম্মান বেড়েছে এবং পরিশ্রম কমেছে।

৮. উদ্দীপক ও ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে –

ক. শ্রমভীরুতা খ. বিলাসিতা

গ. বাতুলতা ঘ. নমনীয়তা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নন্দ বাড়ির হতো না বাহির, কোথা কী ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়,
হাঁটিলে সর্প, কুকুর আর গাড়ি চাপা পড়ার ভয়।
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল–
সকলে বলিল, ‘ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।’

ক. ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে লেখিকা কোনটিকে ত্রিগুণাত্মক বলেছেন?

খ. ‘আমাদের অন্যতম ব্যবসায় পাস বিক্রয়।’ –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের নন্দলাল ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে কাদের প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকের নন্দলালের ভীরুতা ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে লেখক সরস, সুস্বাদু ও মধুরকে ত্রিগুণাত্মক বলেছেন।

খ. বরের পাস করা ডিগ্রিকে ‘নিরীহ বাঙালী’ প্রবন্ধে লেখক রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন আমাদের অন্যতম ব্যবসায় বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঙালি বরেরা তাদের পাস করা ডিগ্রিকে শ্বশুরপক্ষের কাছে বিক্রি করে কন্যাপক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে যৌতুক গ্রহণ করে। তারা নিজেদের শিক্ষাকে বিক্রি করে কন্যা ও কন্যার পিতার সম্পত্তি উভয়ই দাবি করে। তাই লেখক উক্তিটি বরেছেন।

গ. নন্দলালের বৈশিষ্ট্য ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধে অলস বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব করে।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। তবে বাঙালির অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে তাদের শ্রমবিমুখতা। তারা অলস প্রকৃতির। কোনভাবে উদরপূর্তি করতে পারলেই গা এলিয়ে ঘুমায়, পরের বেলার খাবারের কথা ভাবে না। বাঙালির এ স্বভাব তাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

উদ্দীপকে নন্দলালের ঘরে বসে থাকার কারণ ও জীবন যাপনের ধরন তুলে ধরা হয়েছে। এতে নন্দলালের শ্রমবিমুখতা এবং তার আলস্যভরা জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। বাড়ির বাইরে গেলে কোথায় কোন সমস্যায় পড়ে এই ভয়ে সে সব কাজ ফেলে শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পছন্দ করে। তার এই মূল্যহীন যুক্তি ও অলসতা ‘নিরীহ বাঙালি’ প্রবন্ধের বাঙালির কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের সমাজে নন্দলালের মতো অনেক লোক রয়েছে যারা দেশসেবার নামে

আলস্য ও প্রাণ বাঁচানোকে একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। কীসে মর্যাদা বাড়ে, আর কীসে কমে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে বাঙালিদের অবস্থাও তাই। তারা অমর্যাদাকর জীবনযাপন করতে আগ্রহী। কর্ম করে জীবনের উন্নতি করতে নারাজ। বলা যায়, উদ্দীপকের নন্দলালের বৈশিষ্ট্য 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করে।

ঘ. বাঙালি জাতি পরিশ্রম করা অপেক্ষা তোষামোদ করাকে বেশি পছন্দ করে, করুণার পাত্র হয়ে বাঁচতে দ্বিধাবোধ করে না যা উদ্দীপকের নন্দলালের ভীরুতার সমপর্যায়ে পড়ে।

উদ্দীপকে নন্দলালের কোনো একটা সমস্যা ও সংকটের ভয় এবং অলসতাকে তুলে ধরা হয়েছে। সাপ ও কুকুরের ভয়ে সে বাইরে যায় না। কলিশন ও গাড়ি চাপার ভয়ে কোথাও ভ্রমণ করে না। শুধু শুয়ে শুয়ে বহু কষ্টে সময় কাটায়। তার সবসময় ভয়। অন্যদিকে কর্মবিমুখতা বাঙালির মজ্জাগত স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখক এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেছেন। বাঙালি নারী-পুরুষ কীভাবে তাদের জীবন পরিচালনায় অলসতার পরিচয় দেয় তা উপস্থাপন করেছেন। 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধে লেখক হাস্যরসের মাধ্যমে বাঙালি পুরুষের কর্মবিমুখতা এবং বাঙালি নারীর দুর্বলচিত্ততা এবং অহেতুক রূপচর্চা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। অমর্যাদাকর অলসতাকে বাঙালি কীভাবে গ্রহণ করে আর মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কীভাবে শ্রমবিমুখ হয় সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দীপকে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের এই দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ নন্দলাল বাঙালির অলসতা, কর্মবিমুখতা ও আত্মমর্যাদাহীন জীবন যাপনের প্রতীক।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাঙালির মতো জ্ঞানশক্তি ও প্রেমশক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্মশক্তি একবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্মবিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণে তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

ক. 'অবরোধ বাসিনী' গ্রন্থটির লেখক কে?
খ. 'আমাদের স্বভাবে ভীরুতা অধিক।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের যে দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ তা আলোচনা করুন।
ঘ. "নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধের মূল ভাবই যেন উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক   ২. ঘ   ৩. ক   ৪. ক   ৫. গ   ৬. ক   ৭. ঘ   ৮. ক

মানুষ মুহম্মদ (স.)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

লেখক পরিচিতি

১৮৯৬ সালে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯১৮ সালে কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। বিএ পড়াকালীন মওলানা আকরম খাঁর প্রভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ আর হয়নি। এরপর তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি 'মাসিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক মোহাম্মদী', 'নবযুগ' 'দৈনিক সেবক', 'সাপ্তাহিক সওগাত', 'সাপ্তাহিক খাদেম', ইংরেজি 'দি মুসলমান' ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। বিশ শতকের মধ্যভাগে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ওয়াজেদ আলী তাঁদের অন্যতম। চিৎপ্রকর্ষের সাধনায় অর্জিত প্রজ্ঞাবলে উন্নতমানের জীবনী, নকশা, সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি খুব পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে সবকিছুর বিচার করতেন। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গদ্যশৈলী ঋজু, রচনা সাবলীল। ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর স্বগ্রামে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

মরুভাস্কর, মহামানুষ মুহসীন, সৈয়দ আহমদ, ছোটদের হযরত মুহম্মদ।

ভূমিকা

'মানুষ মুহাম্মদ' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মরুভাস্কর' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। এ প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদের মানবীয় গুণাবলির কথা এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহৎ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধকার ইসলাম ধর্মে মানবাধিকারের ধরন এবং মহানবীর প্রতি বিধর্মীদের নিষ্ঠুরতা ও তাঁর ত্যাগের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধ পাঠ শেষে আপনি−

- মানুষ হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারবেন;
- হযরতের জীবন-সাধনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুহম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি−

- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর সাফল্যের কারণগুলো লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

হযরতের মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে মদিনায় যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে আর কথা সরে না; কেহবা পাগলের মতো কাণ্ড শুরু করে। রাসুলুল্লাহর পীড়ার খবর শুনিবার জন্য বহুলোক জমায়েত হইয়াছে। কে একজন বলিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বীরবাহু ওমর উলঙ্গ তরবারি হাতে লইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।

মহামতি আবুবকর শেষ পর্যন্ত হযরতের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে জনতার মধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর উপাসক, তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর। আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী : মুহম্মদ (স.) একজন রাসুল বৈ আর কিছু নন। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রাসুল মারা গিয়াছেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন; তাই বলিয়া তিনি যেই সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না? এই বিশ্বভুবনে ঐ দূর অন্তরীক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাও সবই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁহারই দিকে সকলের মহাযাত্রা।

হযরত আবুবকরের গম্ভীর উক্তিতে সকলেরই চৈতন্য হইল। হযরত ওমরের শিথিল অঙ্গ মাটিতে লুটাইল। তাঁহার স্মরণ হইল হযরতের বাণী : আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তাঁহার মনে পড়িল কুরআনের আয়াত : মুহম্মদ, মৃত্যু তোমারও ভাগ্য, তাহাদেরও ভাগ্য। তাঁহার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিল মুসলিমের গভীর প্রত্যয়ের স্বীকারোক্তি অমর সাক্ষ্য : মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।

শোকের প্রথম প্রচণ্ড আঘাতে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে দাঁড়াইয়া স্থিতধী হযরত আবুবকর (রা) রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সীমারেখা সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তিনি রাসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, আমাদেরই মতো দুঃখ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর অধীন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ– এই কথাই বৃদ্ধ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.) মূর্ছিত মুসলিমকে বুঝাইয়া দিলেন।

তিনি মানুষের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন মুখ্যত তাঁহার মানবীয় গুণাবলি দ্বারা। মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু বংশগৌরব হযরতের সচেতন চিত্তে মুহূর্তের জন্যও স্থানলাভ করে নাই।

জন্মদুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন। এই দুঃখের বেদনা তাঁহার দেহসৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুরীর সহিত মিলিয়া তাঁহাকে নরনারীর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। আবাল্য তিনি ছিলেন আল-আমিন– বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যাইত। এই সকল গুণ বিবি খাদিজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বস্তুত হযরতের রূপলাবণ্য ছিল অপূর্ব, অসাধারণ। মক্কা হইতে মদিনায় হিযরতের পথে এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে তিনি আশ্রয় নেন। রাহী-পথিকদের সেবা করাই ছিল তাহাদের ব্রত। হযরত যখন আসিলেন, কুটিরস্বামী আবু মা'বদ মেষপাল চরাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী উম্মে মা'বদ ছাগীদুগ্ধ দিয়া হযরতের তৃষ্ণা দূর করিলেন। গৃহপতি ফিরিলে এই নারী স্বামীর কাছে নব অতিথির রূপ বর্ণনা করেন, সুন্দর, সুদর্শন পুরুষ তিনি। তাঁহার শীর্ষে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশপাশ, বয়ানে অপূর্ব কান্তশ্রী। তাঁহার আয়তকৃষ্ণ দুটি নয়ন, কাজল রেখার মতো যুক্ত ভ্রূযুগল, তাঁহার সুউচ্চ গ্রীবা, কালো কালো দুটি চোখের ঢলঢল চাহনি মনপ্রাণ কাড়িয়া নেয়। গুরুগম্ভীর তাঁহার নীরবতা, মধুবর্ষী তাঁহার মুখের ভাষণ, বিনীত নম্র তাঁহার প্রকৃতি। তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন। এক অপূর্ব পুলকদীপ্তি তাঁহার চোখেমুখে, বলিষ্ঠ পৌরুষের ব্যঞ্জনা তাঁহার অঙ্গে। বড় সুন্দর, বড় মনোহর সেই অপরূপ রূপের অধিকারী।

সত্যই হযরত বড় সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চেহারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণে যতটুকু সহায়তা করে, তাহার সবটুকু তিনি পাইয়াছিলেন। সত্যের নিবিড় সাধনায় তাঁহার চরিত্র মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। কাছে আসিলেই মানুষ তাঁহার আপনজন হইয়া পড়িত। অকুতোভয় বিশ্বাসে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন। শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন তাঁহার অন্তরের লৌহকপাটে আহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। কিন্তু সত্যে তিনি বজ্রের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অটল হইলেও করুণায় তিনি ছিলেন কুসুমকোমল। বৈরীর অত্যাচারে বারবার তিনি জর্জরিত হইয়াছিলেন, শত্রুর লোষ্ট্রাঘাতে-অরাতির হিংস্র আক্রমণে বরাঙ্গের বসন তাঁহার বহুবার রক্তরঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি পাপী মানুষকে তিনি ভালোবাসিয়াছিলেন, অভিশাপ দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার অন্তরে

উদিত হয় নাই। মক্কার পথে প্রান্তরে পৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে তিনি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গবিদ্রুপে বারবার তিনি উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।

তায়েফে সত্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে কী ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল; আমরা দেখিয়াছি। পথ চলিতে শত্রুর প্রস্তরঘায়ে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; তখন তাহারাই আবার তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছিল। তিনি পুনর্বার চলা শুরু করিলে দ্বিগুণ তেজে পাথরবৃষ্টি করিতেছিল। রক্তে রক্তে তাঁহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গিয়াছে, দেহ নিঃসৃত রুধিরধারা পাদুকায় প্রবেশ করিয়া জমিয়া শক্ত হইয়াছে, মৃত্যুর আবছায়া তাঁহার চৈতন্যকে সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাপি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই। রমণীর রূপ, গৃহস্থের ধনসম্পদ, নেতৃত্বের মর্যাদা, রাজার সিংহাসন সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া সেই সত্যকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিলেন; তাঁহাকে উপহাসিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত দেখিয়াও ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তির একটি শব্দও তাঁহার মুখে উচ্চারিত হয় নাই। অভিসম্পাত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি বলিলেন : না না, তাহা কখনই সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে আমি ইসলামের বাহন, সত্যের প্রচারক। মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ। আজ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতেছে, তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, হয়তো কাল তাহারা-তাহাদের অনাগত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করিবে। আপনার আঘাত জর্জরিত দেহের বেদনায় তিনি কাতর। সত্যকে ব্যাহত দেখিয়া মনের ব্যথা তাঁহার সেই কাতরতাকে ছাপাইয়া উঠিল। তিনি ঊর্ধ্বদিকে বাহু প্রসারণ করিয়া বলিলেন : তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও। বিপদাবরণ তুমি অশরণের শরণ তুমি, তোমার সত্য মানুষের দ্বারে পৌঁছাইয়া তাহাকে উন্নীত করিলেন যাঁহারা– তাঁহাদের পংক্তিতে আমার স্থান দাও।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকুতোভয়– নির্ভয়। ***অনুরুদ্ধ–*** অনুরোধ করা হয়েছে এমন। **অবিনশ্বর–** অক্ষয়; অবিনাশী। ***অরাতি–*** শত্রু। **অন্তরীক্ষে–** আকাশে, গগনে। ***ওমর–*** ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন তেজস্বী বীরযোদ্ধা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোরেশ বংশোদ্ভূত তরুণ বীর ওমর মহানবীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর ভগ্নীর কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহানবীর বিশ্বাসভাজন সাহাবা। **কেশপাশ–** চুলের গোছা। **কান্তশ্রী–** সুন্দর; মনোরম। **কুটিরস্বামী–** গৃহের মালিক। ***কুসুমকোমল–*** ফুলের মতো নরম। ***গ্রীবা–*** ঘাড়। **চৈতন্য–** চেতনা। ***তিতিয়া–*** ভিজে। ***তায়েফ–*** সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ। ***ধী–*** বুদ্ধি। ***নির্যাতন–*** অত্যাচার; জুলুম। ***পরহিতব্রতী–*** পরের উপকারে নিয়োজিত। ***পুলকদীপ্তি–*** আনন্দের উদ্ভাস। ***পূর্ণোদর–*** ভরপেট। **প্রস্তরঘায়ে–** পাথরের আঘাতে। ***পৌত্তলিক–*** মূর্তিপূজক। **বয়ান–** বর্ণনা; বিবরণ। ***বীরবাহু–*** শক্তিধারী। ***লোষ্ট্রাঘাত–*** ঢিলের আঘাত। ***বৈরী–*** শত্রু। ***মহামতি আবুবকর–*** ইসলামের প্রথম খলিফা এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম পুরুষ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মহানবীর হিযরতকালীন সঙ্গী এবং সারাজীবনের বিশ্বস্ত সহচর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ***মক্কা–*** সৌদি আরবের অন্যতম প্রধান নগরী। এখানে আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ বিদ্যমান। এই নগরীতে রাসুলুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ***মদিনা–*** সৌদি আরবে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় সম্মানিত নগরী। এখানে হযরত মুহম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকরের (রা.) মাজার রয়েছে। **মহামতি–** উদার হৃদয়; অতি উন্নত চরিত্র। **মূর্ছিত–** অচেতন; জ্ঞানহারা। ***রাসুল–*** আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। ***রুধিরাক্ত–*** রক্তাক্ত, রক্তরঞ্জিত। ***রাহী–*** পথিক, মুসাফির। ***হিজরত–*** শাব্দিক অর্থ পরিত্যাগ। এখানে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাত্রা বোঝানো হয়েছে। ***স্থিতধী–*** স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। ***সমাচ্ছন্ন–*** অভিভূত।

সারসংক্ষেপ :

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর খবরে মদিনায় শোকের আঁধার নেমে এসেছিল। হযরত ওমর (রা.) সহ অনেকেই তাঁর মৃত্যু মেনে নিতে পারছিলেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি মানুষই বটে, তাই তাঁর মৃত্যুই স্বাভাবিক। আসলে কোনো অলৌকিক ক্ষমতাবলে হযরত সাফল্য পাননি। মানবিক গুণাবলিই তাঁকে বিজয়ী করেছিল। তাঁর অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য মানুষকে আকর্ষণ করত। ভালোবাসা দিয়েই তিনি মানুষকে জয় করেছিলেন। সত্যের বাণী প্রচারে অসীম ধৈর্য আর সাহসই তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘মরুভাস্কর’ গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. এস. ওয়াজেদ আলী
খ. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
গ. বন্দে আলী মিয়া
ঘ. ফররুখ আহমদ

২. হজরত মুহম্মদ (স.) মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলেন কেন?
ক. শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে
খ. মক্কাবাসীর নির্যাতনে
গ. মদিনাবাসীর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে
ঘ. ভ্রমণের উদ্দেশ্যে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আজগর সাহেব খুবই সৎ ও বিনয়ী একজন মানুষ। কর্মনিষ্ঠায় তিনি তাঁর অফিসে সকলের সেরা। তা সত্ত্বেও তার আদর্শের কারণে সহকর্মীরা তাঁকে বিদ্রূপ ও উত্ত্যক্ত করেন। তিনি নীরবে সব কিছু সহ্য করেন, কাউকে কিছু বলেন না।

৩. উদ্দীপকে প্রকাশিত গুণটি ‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ রচনার যে বাক্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে–
ক. আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র।
খ. মুহম্মদ (স.) আল্লাহর দাস (মানুষ) ও রাসুল।
গ. এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।
ঘ. তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

৪. উদ্দীপকের আজগর সাহেব অপমান সহ্য করায় ‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ রচনা অনুযায়ী মুহম্মদ (স.)-এর কোন গুণের অধিকারী হয়েছেন?
i. মহানুভবতা
ii. স্বাভাবিকতা
iii. উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হযরত মুহম্মদ (স.)-এর চারিত্রিক গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দশের মধ্যে থেকেও তিনি কীভাবে সবার অনুকরণীয় হয়ে উঠলেন, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মক্কাবাসীরা হযরতের নবিত্ব লাভের শুরু হইতেই তাঁহার প্রতি কী নির্মম অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি। যখন তাহাদের নির্যাতন সহনাতীত হইল, যখন দেখা গেল, কোরেশরা সত্যকে গ্রহণ করিবে না, হযরত মদিনায় চলিয়া গেলেন। পথে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য, তাঁহার ও হযরত আবুবকরের ছিন্ন মুণ্ড আনিবার জন্য বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া, শত শত ঘাতক ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র ঘাতক পাঠানো হইল। বদর, ওহোদ ও আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধে মক্কার বাসিন্দা এবং তাহাদের মিত্রজাতিরা সম্মিলিত হইয়া ইসলামের ও মুসলিমের চিহ্নটুকু পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ করিল। খয়বরের যুদ্ধে হযরতের পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। হুদায়বিয়া সন্ধিতে হযরতের শান্তিপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া মুসলিমের স্কন্ধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপাইয়া দেওয়ার পরও তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিল এবং তারপর হযরত যেই দিন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন, সেই দিনও তাঁহার সহিত যুদ্ধকামনা করিয়া খালিদের সহিত হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যাহারা পদে পদে আনিয়া দিল লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রত্যেক সুযোগে যাহারা হানিল বৈরিতার বিষাক্ত

বাণ; হযরত তাঁহাদের সহিত কী ব্যবহার করিলেন? জয়ীর আসনে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন : ভাইসব, তোমাদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো অভিযোগ নাই, আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত। মানুষের প্রতি প্রেমপুণ্যে উদ্ভাসিত এই সুমহান প্রতিশোধ সম্ভব করিয়াছিল হযরতের বিরাট মনুষ্যত্ব।

শুধু প্রেম-করুণায় নয়, মানুষ হিসেবে আপনার তুচ্ছতাবোধ আপনার ক্ষুদ্রতার অনুভূতি তাঁহার মহিমাগৌরবকে মুহূর্তের জন্যও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মক্কাবিজয়ের পর হযরত সাফা পর্বতের পার্শ্বে বসিয়া সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করিতেছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁহার কাছে আসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। হযরত স্মিতমুখে তাহাকে বলিলেন, কেন তুমি ভয় পাইতেছ? ভয়ের কিছুই এখানে নাই। আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই। আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।

মহামহিমার মাঝখানে আপনার সামান্যতম এই অনুভূতিই হযরতের চরিত্রকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখিয়াছিল। মানুষ ত্রুটির অধীন, হযরতও মানুষ, সুতরাং তাঁহারও ত্রুটি হইতে পারে এই যুক্তির বলে নয়, বরং তাঁহার অনাবিল চরিত্রের স্বচ্ছ সহজ প্রকাশ মর্যাদাহানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া, লোকচক্ষে সম্ভাবিত হেয়তার ভয় অবহেলায় দূর করিয়া তিনি অকুতোভয়ে আত্মদোষ উদঘাটন করিয়াছেন। একদিন তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে সত্য প্রচারে ব্রতী। মজলিসের এক প্রান্তে বসিয়া একটি অন্ধ। সম্ভবত সে হযরতের দুই একটি কথা শুনিতে পায় নাই। বক্তৃতার মাঝখানে একটি প্রশ্ন করিয়া সে হযরতকে থামাইল। বাধা পাইয়া হযরতের মুখে ঈষৎ বিরক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ললাট সামান্য কুঞ্চিত হইল।

ব্যাপারটি এমন কিছুই গুরুতর নয়। বক্তৃতায় বাধা হইলে বিরক্তি অতি স্বাভাবিক। আবার দুঃখী দুর্বল লোকদের হযরত বড় আদর করিতেন, কাহারও ইহা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন, কাঙাল বলিয়া তাহাকে হেলা করিয়াছেন, এই কথা কাহারও মনে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার এই তুচ্ছতম ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত আসিল কুরআনের একটি বাণীতে। তিনি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে তাহা সকলের কাছে প্রচার করিলেন।

মানুষ হিসেবে যে ক্ষুদ্রতাবোধ, মানুষের সহজ দৈন্যের যে নির্মল অনুভূতি হযরতকে আপনার দোষত্রুটি সাধারণের চক্ষে এমন নির্বিকারভাবে ধরাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাই আবার তাঁহার মহিমান্বিত জীবনে ইচ্ছা-স্বীকৃতি দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রদীপ হইয়া জ্বলিয়াছিল। অনাত্মীয় পরিপার্শ্বের মধ্যেও নিবিড় নির্বিচার ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি ও আনুগত্য তিনি বড় অল্প পান নাই। শত শত, বরং সহস্র সহস্র মুসলিম তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্বদা শুধু ইচ্ছুক নয়, সমুৎসুক ছিল। কিন্তু হযরত আপনাকে দশজন মানুষের মধ্যে একজন গণনা করিলেন, সকালের সঙ্গী সহচররূপে সহোদয় ভাইয়ের মতাদর্শ প্রয়াসী নেতার কর্তব্য পালন করিলেন। সত্যের জন্য অত্যাচার নির্যাতন সহিলেন, দুঃখে-শোকে অশ্রুনীরে তিতিয়া আল্লাহর নামে সান্ত্বনা মানিলেন, দেশের রাজা-মানুষের মনের রাজা হইয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের কণ্টক মুকুট মাথায় পরিলেন। তাই তাঁহার গৃহে সকল সময় অন্ন জুটিত না, নিশার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিবার মতো তৈলটুকুও সময় সময় মিলিত না। এমনি নিঃস্ব কাঙালের বেশে মহানবী মৃত্যু রহস্যের দেশে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর মহাপ্রয়াণে বিয়োগবিধুরা আয়েশার বক্ষ ভেদিয়া শোকের মাতম উঠিল, মানুষের মঙ্গল সাধনায় যিনি অতন্দ্র রজনী যাপন করিলেন, সেই সত্যাশ্রয়ী আজ চলিয়া গেলেন। নিঃস্বতাকে সম্বল করিয়া যিনি বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিলেন, তিনি আজ চলিয়া গেলেন। সাধনার পথে শত্রুর আঘাতকে যিনি অম্লান বদনে সহিলেন। হায়, সেই দয়ার নবী, মানুষের মঙ্গল বহিয়া আনিবার অপরাধে প্রস্তরঘায়ে যাঁহার দাঁত ভাঙিয়াছিল, প্রশস্ত ললাট রুধিরাক্ত হইয়াছিল, আর সেই আহত জর্জরিত মুমূর্ষু দশাতেও যিনি শত্রুকে প্রেমভরে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি আজ জীবন-নদীর ওপারে চলিয়া গেলেন। দুই বেলা পূর্ণোদর আহারও যাঁহার ভাগ্যে হয় নাই, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মূর্ত প্রকাশ মহানবী আজ চলিয়া গেলেন। বিবি আয়েশার মর্মছেঁড়া এই বিলাপ সমস্ত মানুষের, সমগ্র বিশ্বের। শুধু সত্য সাধনায় নয়, শুধু ঊর্ধ্ব লোকচারী মহাব্রতীর তত্ত্বানুসন্ধানে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে হযরত মোস্তফা ইতিহাসের একটি অত্যন্ত অসাধারণ চরিত্র। ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সহজ, শৌর্য, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সমদর্শন-চরিত্র সৌন্দর্যের এতগুলি দিকের সমাহার ধুলোমাটির পৃথিবীতে বড় সুলভ নয়। তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ, আমাদের অতি আপনজন হইয়াও তিনি অনুকরণীয়, বরণীয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অতন্দ্র– নিদ্রাহীন; জাগ্রত। ***আয়েশা (রা.)–*** হযরত আবুবকরের কন্যা, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর অন্যতম সহধর্মিণী। ***বদর, ওহোদ, আহযাব, খয়বর–*** হযরতের জীবনকালে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এইসব স্থানে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়েছিল। ***হুদায়বিয়া–*** একটি যুদ্ধক্ষেত্র; এই স্থানে বিধর্মীদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.)-র একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ***খালিদ–*** হযরতের জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা এবং সেনাপতি। ***সাফা–*** সাফা ও মারওয়া দুটি ছোট পাহাড় কাবার নিকটে অবস্থিত। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলের পিপাসা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করেছিলেন। সেই স্মৃতি রক্ষার্থে আজও হজ্জব্রতীরা সাফা-মারওয়ায় দৌড়ে থাকেন। **সহনাতীত–** সহ্য করা যায় না এমন। **তুলাদণ্ড–** ওজন পরিমাপক যন্ত্র। **বৈরিতা–** শত্রুতা। **সত্যান্বেষী–** প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য যে অনুসন্ধান করে। **মহামহিমা–** অতিশয় মহান। **দীক্ষা–** ধর্মোপদেশ, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রদান। **স্মিতমুখে–** অল্প হাসি; ঈষৎ হাস্য। **সমুৎসুক–** অতিশয় আগ্রহ বা জানার ঔৎসুক্য প্রকাশ। **প্রয়াসী–** পরিশ্রমী; ইচ্ছুক। **মহাপ্রয়াণ–** মৃত্যু; শেষ যাত্রা।

সারসংক্ষেপ :

সত্য প্রচারের জন্য হযরত মুহম্মদ (স.) যে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তার কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার কথা তিনি কখনো ভাবেননি। ক্ষমাই ছিল তাঁর আদর্শ। নিজেকে তিনি কখনো উঁচুতে তুলতে চাননি। বরং দশের মধ্যে থেকেই সবার জন্য কাজ করেছেন। নিজের সুখের কথা ভাবেননি। জীবনপাত করেছেন মানুষের কল্যাণে। তাই মানবসমাজের একজন হয়েও তিনি মহামানব; তাই মানুষের অতি আপনজন হয়েও তিনি চির-অনুকরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. সাধারণ শুষ্ক মাংস নিত্য আহার করতেন কে?

ক. হযরত মুহম্মদ (স.) খ. হযরত আবু বকর (রা.) গ. বিবি আয়েশা (রা.) ঘ. হযরত ওমর (রা.)

৬. 'মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ,আমাদের অতি আপন জন হইয়াও তিনি বরণীয়।' বাক্যটিতে বোঝানো হয়েছে–

i. ত্যাগে মহিমান্বিত ii. ক্ষমায় মহান iii. গুণে অনুকরণীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পুণ্যে পাপে, সুখে দুঃখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে কী?

i. প্রেক্ষাপট ভিন্ন ii. মূলভাবকে ধারণ করে iii. আংশিক প্রতিচ্ছবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, iii

৮. উদ্দীপক ও 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের মৌল প্রত্যাশা–

ক. মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা খ. সাম্য চেতনা গ. দেশপ্রেম ঘ.অধ্যবসায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'রাহী' শব্দের অর্থ কী ?

ক. মুসাফির খ. মুসাফির

গ. পথপ্রদর্শক ঘ. পথভ্রষ্ট

১০. পাপ করেছে এমন মানুষদের হজরত মুহাম্মদ (স.) কী করতেন?

ক. নির্যাতন করতেন
খ. উপদেশ দিতেন
গ. ঘৃণা করতেন
ঘ. রাগ করতেন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

... তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রযত্নে সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব সেই পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।

১১. উদ্দীপকটি যে রচনাকে ইঙ্গিত করে–

ক. নিমপাতা
খ. মানুষ মুহম্মদ (স.)
গ. প্রাণ
ঘ. নিয়তি

১২. উদ্দীপকটি মানবীয় গুণাবলির যে দিক প্রকাশ করে–

i. ক্ষমা
ii. মহানুভবতা
iii. উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন খুবই সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। শৈশব হতেই তিনি লজ্জাশীলতা ও শালীনতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। একদিকে তিনি আমানতদারী, সত্যকথন ও অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন, অপরদিকে মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তা, সভ্যতাবর্জিত ও রুচিবিগর্হিত আচার-অভ্যাস হতে ছিলেন বহুদূরে। এভাবে মানুষের প্রতি প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত হযরতের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্ব।

ক. হজরত মুহম্মদ (স.) কোথায় হিজরত করেছিলেন?
খ. হজরত আবু বকর (রা.) কী করে সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন?
গ. উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সামগ্রিক দিকটি নয়, আংশিক ভাব প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

মহাপুরুষ আরও ছিলেন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও অনেকে পোষণ করেছেন কিন্তু তাঁর মতো আর কেউ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে এত সজাগ ছিলেন না। অথবা সেই কর্তব্যকে এত বীরত্বের সঙ্গে কেউই সফল করতে পারেননি।

ক. বিনয় ও নম্রতা কার প্রকৃতি?
খ. 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের প্রভু নই।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাবটিই 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধে অনুরণিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. হজরত মুহম্মদ (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

খ. হজরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে হজরত আবু বকর (রা.)-এর গম্ভীর উক্তি সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিল।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যু-সংবাদে তাঁর অনুসারীরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তখন হজরত আবু বকর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন: 'যাহারা হযরতের পূজা করিত, তাহারা জানুক তিনি মারা গিয়াছেন, আর যাহারা আল্লাহর উপাসক তাহাদের জানা উচিত আল্লাহ অমর, অবিনশ্বর।' তিনি আরো বলেন: 'রাসুলুল্লাহ (স.) মরিতে পারেন, নিহত হইতে পারেন। তাই বলিয়া তিনি যে সত্য তোমাদের দিয়া গেলেন তাহাকে কি তোমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে

না?’-এ সংলাপগুলো শ্রবণ করে সকলের বিবেচনা শক্তি ফিরে আসে। এভাবে হজরত আবু বকর (রা.) সকলের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে হজরত মুহম্মদ (স.) -এর চরিত্রে মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

হজরত মুহম্মদ (স.) মানুষের প্রাণের নবি। তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি মানুষকে বিস্মিত করত। সত্য ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন। তাই মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম ভেদ ও বৈষম্য তা তিনি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ প্রবন্ধে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর অনেক গুণের একটি হল মানবপ্রেম। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই নিজেকে কখনো শ্রেষ্ঠ বলে ভাবেননি। বরং অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি নিজেকে মানুষ ভেবেছেন। সততা, শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম তথা মনুষ্যত্বে তিনি এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। উদ্দীপকেও দেখা যায় মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় প্রেম ও পুণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্বের অনুকরণীয় নমুনা।

ঘ. উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের আংশিক ভাব ফুটে উঠেছে, পূর্ণাঙ্গ রূপটি প্রকাশিত হয়নি।

হজরত মুহম্মদ(স.) বিশ্ব মানবের মুক্তির পথিকৃৎ। মানব জীবনের পূর্ণ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। মানুষকে বিশ্বাস করতেন। শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে তিনি নিজের জীবনকে রূপায়িত করেছিলেন।

উদ্দীপকে হজরত মুহম্মদ (স.)-এর মানবীয় গুণাবলি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ সৈনিক। শৈশব হতেই তিনি শালীনতাসম্পন্ন জীবন যাপন করতেন। তাঁর নিকট সকল মানুষই সমান ছিল। মানুষের প্রতি প্রেম-প্রীতি উদ্ভাসিত হজরতের (স.) মধ্যে গড়ে উঠেছিল বিরাট মনুষ্যত্ব। ‘মানুষ মুহম্মদ(স.)’ প্রবন্ধেও দেখি তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করেছেন। পৃথিবীর বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে তিনি ছিলেন সততা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক।

হজরত মুহম্মদ (স.)-এর চরিত্র মানুষের জন্য অনুকরণীয়। তিনি পৃথিবীতে মানবজাতির পথপ্রদর্শক। উদ্দীপকে দেখা যায় মুহম্মদ (স.)-এর জীবনীর একটি অংশই ফুটে উঠেছে। কিন্তু ‘মানুষ মুহম্মদ (স.)’ প্রবন্ধে মুহম্মদ (স.) জীবনীর পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সামগ্রিক ভাব নয়, আংশিক পরিচয় ফুটে উঠেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মহানবি (স.) একটি সুস্থ এবং সম্ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক জীবন মুসলমানদের জন্য গড়ে তুলেছিলেন। এ জীবনের লক্ষ্য ছিল বিশ্বাসীগণকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে, সুস্থতার মধ্যে, বিনয়ের মধ্যে এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিতচিত্ততার মধ্যে তিনি মুসলমানদের নতুন জীবনে দীক্ষিত করেছিলেন। এ জীবনে আনন্দ এবং কৌতুক ছিল। একজন মুসলমান যদি রাসুল (স.)-এর সামগ্রিক জীবনযাপন লক্ষ করে তাহলে সে দেখবে যে তাঁর সে জীবন ছিল একটি পরিপূর্ণ জীবন, একই সঙ্গে সহজ মাধুর্যময় এবং মহার্ঘ্য।

ক. হুদাইবিয়া কী ?

খ. ‘জন্ম দুঃখী হইয়া তিনি সংসারে আসিয়াছিলেন।’ –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপক ও মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের সাদৃশ্য তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপকটিতে মানুষ মুহম্মদ (স.) প্রবন্ধের মর্মার্থ নিহিত রয়েছে।” –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. খ ১১. খ ১২. ঘ

নিমগাছ

বনফুল

লেখক পরিচিতি

বনফুল ভারতের বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়ার অন্তর্গত মণিহার গ্রামে ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও কবি। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেন এবং শিক্ষকের কাছ থেকে নিজের নাম লুকোতে বনফুল ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। তাঁর পিতা ডা. সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের আদিনিবাস হুগলি জেলায়। বনফুল ১৯১৮ সালে পূর্ণিয়ার সাহেবগঞ্জ ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, ১৯২০ সালে হাজরীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আইএসসি এবং ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। মেডিক্যাল অফিসার পদে চাকরির মাধ্যমে বনফুলের কর্মজীবন শুরু এবং প্যাথলজিস্ট হিসেবে ৪০ বছর কাজ করেন। ১৯১৫ সালে সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় 'মালঞ্চ' পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৮ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ-কবিতা ও প্যারডি লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরে 'প্রবাসী', 'ভারতী' ও সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প প্রকাশ হতে থাকে। তাঁর রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিভিন্ন পুরস্কারসহ তিনি পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। **তাঁর প্রধান রচনা :**

গল্পগ্রন্থ : *বনফুলের গল্প*, *বাহুল্য*, *অদৃশ্যলোক*, *বিন্দুবিসর্গ*, *অনুগামিনী*, *তন্বী*, *ঊর্মিমালা*, *দূরবীন*।
উপন্যাস : *তৃণখণ্ড*, *কিছুক্ষণ*, *দ্বৈরথ*, *নির্মোক*, *সে ও আমি*, *জঙ্গম*, *অগ্নি*।
কবিতা : *বনফুলের কবিতা*, *ব্যঙ্গ কবিতা*, *চতুর্দশপদী*;
জীবনী নাটক : *শ্রীমধুসূদন*, *বিদ্যাসাগর*।

ভূমিকা

'নিমগাছ' গল্পটি বনফুলের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'অদৃশ্যলোক' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। এই গল্পে লেখক সংক্ষিপ্ত অবয়বের মধ্যে যে গভীর বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ গল্পে লেখক নিমগাছের প্রতীকের মাধ্যমে একজন গৃহকর্ম-নিপুণা বধূর জীবনবাস্তবতা তুলে ধরেছেন। নিমগাছ যেমন মানুষের নানা উপকারে আসে অথচ কেউ এর যথার্থ মূল্যায়ন করে না, তেমনি প্রাত্যহিক জীবন-সংসারের জালে আবদ্ধ বধূরও যথার্থ মূল্যায়ন হয় না।

উদ্দেশ্য

'নিমগাছ' গল্পটি পড়া শেষে আপনি–

- নিমগাছের বিচিত্র ব্যবহার সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- বাড়ির বউয়ের সঙ্গে নিমগাছের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রূপক-প্রতীকধর্মী সাহিত্যের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!
কেউবা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই ...
কিম্বা ভেঙে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ... দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
বলে– 'নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।'
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।
আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ– সে আর-এক আবর্জনা।
হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল,– 'বাহ্, কী সুন্দর পাতাগুলি ... কী রূপ ! থোকা-থোকা ফুলেরই বা কী বাহার... একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ্–'
খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
কবিরাজ নয়, কবি।
নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক একই দশা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অব্যর্থ– যা বিফল হবে না। ***কবি–*** যিনি কবিতা লেখেন। ***কবিরাজ–*** যিনি গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন। **কিম্বা–** কিংবা। ***খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে–*** চুলকানির স্থানে লেপন করবে; **গজালে–** জন্মালে। ***গরম তেলে ভাজা–*** নিমপাতা গরম তেলে ভাজলে মচমচে হয় এবং তা খেতে খানিকটা উপাদেয় হয়। ***ছাল–*** বাকল; এখানে নিমগাছের বাকল। **পঞ্চমুখ–** পাঁচমুখ বিশিষ্ট; এখানে অতিরিক্ত প্রশংসা বোঝানো হয়েছে। ***পাতাগুলো খায়ও–*** নিমের কচিপাতা খেলে মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। **মহৌষধ–** যে ওষুধ উৎকৃষ্ট বা অব্যর্থ। **বিজ্ঞ–** জ্ঞানী; পণ্ডিত। ***শান দিয়ে বাঁধানো–*** এখানে ইট ও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বোঝাচ্ছে। ***শিকড় অনেক দূর চলে গেছে–*** প্রতীকাশ্রয়ে বর্ণিত। নিমগাছের শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং চারিদিকে বিস্তৃতও হয়। লক্ষ্মী বউটার প্রতীক যেহেতু নিমগাছ সেহেতু নিমগাছের শিকড়ের সঙ্গে বউয়ের সংসারের জালে চারিদিকে আবদ্ধ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ***শিলে পেষা–*** নিমগাছের পাতা শিলপাটায় বেটে তা থেকে রস বের করা হয়। **সহযোগ–** মিলন; সংযোগ। **সায়রে–** সাগরে।

সারসংক্ষেপ :

নিম মানুষের জন্য খুবই উপকারী। মানুষ বিচিত্রভাবে তার উপকার গ্রহণও করে। কিন্তু গাছটার দিকে খুব একটা মনোযোগ দেয় না। তার অবস্থান এক কোণে – ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে। অনাদর-অবহেলায়ও তার কিছু করার থাকে না। গাছের তো আর নড়ার উপায় নেই। শেষের একটিমাত্র বাক্যে লেখক এই নিমগাছের তুলনা করেছেন বাড়ির বউটার সঙ্গে। বোঝা যায়, নিমগাছের ছলে তিনি আসলে বউয়ের গল্পই বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বনফুল কোন পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করেন?

ক. সোমবারের চিঠি খ. রবিবারের চিঠি

গ. শনিবারের চিঠি ঘ. সাধনা

২. নিমগাছ লোকটার সাথে যেতে পারল না কেন?

ক. শিকড় অনেক দূর বিস্তৃত খ. বাড়ির মালিকের অনুমতি নেই

গ. নিমগাছ বাড়িটাকে পাহারা দিবে ঘ. লোকটা কবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ঘৃতকুমারীর নরম অংশ দিয়ে শরবত তৈরি করা হয়। এর শরবত যেমন উপকারি, তেমনি সুস্বাদুও।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত গাছের সঙ্গে আপনার পাঠ্য গল্পের কোন গাছের মিল রয়েছে?

ক. কলাগাছ খ. নিমগাছ

গ. কাঁঠাল গাছ ঘ. লিচু গাছ

৪. উদ্দীপকের ঘৃতকুমারীর ও গল্পের গাছের যে রূপটি প্রকাশিত হয়েছে–

i. ধ্বংসাত্মক রূপ ii. কল্যাণময় রূপ iii. সর্বগ্রাসী রূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বনফুলের প্রকৃত নাম কী ?

ক. বলাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বলাইচাঁদ ভট্টাচার্য

গ. বলাইচাঁদ রায় ঘ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৬. কবিরাজ বলতে বোঝায় ?

ক. রাজাদের কবি খ. কবিদের রাজা

গ. গাছ-গাছালি নির্ভর মনুষ্যরোগের চিকিৎসক ঘ. হোমিওপ্যাথি নির্ভর মনুষ্যরোগের চিকিৎসক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হিন্দুবাড়িতে দিন শেষে গৃহিণীরা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, প্রণাম করে গলায় আঁচল দিয়ে। কেননা বিশ্বাস অনুযায়ী তুলসী গাছ পবিত্রতার প্রতীক।

৭. উদ্দীপকের তুলসী গাছের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের মিল রয়েছে–

i. শিকড়ে ii. পবিত্রতায় iii. গুণে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপকের তুলসী গাছ থেকে নিমগাছটি কীভাবে ব্যতিক্রম ?

ক. অবহেলায় খ. শিকড়ে

গ. অযত্নে ঘ. আকারে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১. মোটে এগার বছর বয়স আতর বানুর। মা-বাবা নেই। ভাই-ভাবীর সংসারে পড়ে আছে। খুব যে ভালো আছে তা নয়। উঠতে বসতে টিপ্পনি আর তিরস্কার তার নিত্য উপহার। কাজল খালা একবার ভেবেছিলেন বোনঝিকে নিজের কাছে নিয়ে মানুষ করবেন। কিন্তু আতর বানু রাজি হয়নি। রক্তসম্পর্ক ছেড়ে সে অন্য কোথাও পরগাছা হতে চায় না। কাজল খালা আতর বানুর মানসিকতা উপলব্ধি করে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

ক. নিমগাছটার কার সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছা করল?

খ. কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন?

গ. উদ্দীপকের আতরবানুর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের কাজল খালার ভূমিকা 'নিমগাছ' গল্পের কবির মতোই।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১-এর নমুনা উত্তর :

ক. নিমগাছটার কবির সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছা করল।

খ. নিমগাছের নানারকম ভেষজ গুণ রয়েছে। তাই কবিরাজরা এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

নিমগাছ কার্যকর এক ভেষজ উদ্ভিদ। এর বিভিন্ন অংশ রোগ নিরাময়ের কাজে লাগে। নিম গাছের ছাল সিদ্ধ করে বা পিষে চর্মরোগের ওষুধ তৈরি করা হয়। নিমের কচিপাতা খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, যকৃতের উপকার হয়। নিমের কচি ডাল চিবানোয় দাঁতের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এতসব উপকারী গুণের কারণেই কবিরাজরা নিমগাছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন।

গ. উদ্দীপকের আতর বানুর সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটার সাদৃশ্য রয়েছে।

সমাজে সবসময় দুই শ্রেণির লোক দেখা যায়। এক শ্রেণির লোক কেবল উপকার ভোগ করে। আর এক শ্রেণির লোক আছে যারা কেবল সমাজ ও সংসারের জন্য প্রাণপাত করে। তারা নিজের চারপাশের পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলেন। এ ধরণের লোক নিজেদের শিকড়কে ছাড়তে চান না। 'নিমগাছ' গল্পে আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই।

আতর বানু পিতামাতা হারানোর পর ভাইয়ের সংসারে অনেকটা অবাঞ্ছিতের মতো বড় হতে থাকে। উঠতে বসতে তাকে তিরস্কার আর টিপ্পনি সহ্য করতে হয়। আতর বানু মনে করে ভাই-ভাবির সংসারের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক। সেজন্য আতর বানু অবহেলা আর অযত্নের পরও সংসারের বাঁধন ছিন্ন করে চলে যেতে পারে না। এমনকি কাজল খালার অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। তেমনি নিমগাছ গল্পের লক্ষ্মী বউটি সংসারে সবার সেবায় নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সংসারের কেউই তার যত্ন বা সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবে না। তবু সংসারের প্রতি মায়া ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করে বলে সব ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারে না। এভাবে আমরা উদ্দীপকের আতর বানুর সঙ্গে চেতনাগত দিক থেকে 'নিমগাছ' গল্পের লক্ষ্মী বউটির সাদৃশ্য দেখতে পাই।

ঘ. উদ্দীপকে কাজল খালা ও 'নিমগাছ' গল্পে কবির অবস্থান ভিন্ন রকম দেখা যায়। কারণ কাজল খালা আতর বানুর দুর্দশা দূর করার চিন্তা করেছেন। আর কবি কেবল গাছের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন।

মানুষ সমাজে বসবাস করে। কিন্তু এই সামাজিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সকলের একরকম হয় না। কারো আচরণে থাকে মানবিক বিষয়, আর কেউবা শুধু সৌন্দর্যপিয়াসী। 'নিমগাছ' গল্প এবং উদ্দীপকে এরকম দুটি বিষয়ই প্রকাশিত হয়েছে।

'নিমগাছ' গল্পে সকলেই নিমগাছের নিকট থেকে উপকার পেতে চায়। নিমগাছের দুঃখের কথা কেউ ভাবে না। কিন্তু একদিন একজন ব্যতিক্রমধর্মী লোক এলেন। তিনি কবিরাজ নন, কবি। কবি সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে নিমগাছের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন। তিনি নিমগাছের পাতা ছিঁড়েন নি, ডাল ভাঙেননি বা ছালও তোলেননি। তিনি শুধু নিমগাছের রূপের সুধা

পান করেছেন। উদ্দীপকে দেখা যায় আতর বানু বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর অনাদর-অবহেলায় সংসারের দিন অতিবাহিত করছিল, কাজল খালা এসে আতর বানুর দুর্দশা দেখে তাকে তার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।

'নিমগাছ' গল্পের কবি ও উদ্দীপকের কাজল খালা একই রেখায় অবস্থান করেননি। কবি কেবল নিমগাছের রূপ ও সুধা পান করেছেন, নিমগাছের সেবা বা যত্নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, কাজল খালা নিজে আতর বানুর দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। আতর বানুকে তিনি নিজের কাছে রেখে মানুষ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই, আমরা বলতে পারি উদ্দীপকের কাজল খালা ও 'নিমগাছ' গল্পে কবির অবস্থান সমপর্যায়ের নয়।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি একটি পাকুড় গাছ। জন্ম কোথায় কোন কালে আমার জানা নেই। দিগন্তবিস্তারী আমার শাখাপ্রশাখা। আমার শেকড়-বাকড় মাটির অনেক গভীরে বিস্তৃত। ক্লান্ত পথিক শ্রান্তি ফিরিয়ে নেয় আমার সুশীতল ছায়ায়। আমি ছায়া দিই, বাতাস দিই মানুষকে। কিন্তু কেউ কেউ আমার গায়ে গর্ত করে, ডাল ভেঙে ফেলে। আমি কষ্ট পাই। একদিন আমার কাছে একটা লোক আসে। আমার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। বলে, 'পৃথিবীর যত শান্তি এখানে।' আমি বুঝি, এ অন্য জাতের মানুষ।

ক. বনফুল কোন আঙ্গিকে গল্প লিখতেন?

খ. 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।' –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের পাকুড়গাছের সঙ্গে 'নিমগাছ' গল্পের নিমগাছের সাদৃশ্য বর্ণনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'নিমগাছ' গল্পের অন্তর্নিহিত ভাব নয় বরং একটি বিশেষ অবস্থাকে তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. ঘ ৬. গ ৭. গ ৮. ক

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচিতে যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *অগ্নি-বীণা*, *বিষের বাঁশী*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণিমনসা*, *সিন্ধু-হিন্দোল*, *চক্রবাক*, *ছায়ানট*;

উপন্যাস : *বাঁধনহারা*, *কুহেলিকা*, *মৃত্যুক্ষুধা*;

গল্প : *ব্যথার দান*, *রিক্তের বেদন*;

প্রবন্ধ : *যুগবাণী*, *রুদ্রমঙ্গল*, *দুর্দিনের যাত্রী*, *রাজবন্দীর জবানবন্দী*।

ভূমিকা

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) থেকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এটি কাজী নজরুল ইসলামের 'যুগবাণী' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি রচনা। সাম্যবাদী চেতনার বিকাশ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং জাতীয় উন্নয়নে গণ-মানুষের উপেক্ষিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- দেশ ও জাতির উন্নতিতে নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভদ্রলোক-সমাজের মনের ও চিন্তার দীনতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থার এক বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

– রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না– যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ছোটলোক' সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত 'ছোটলোক'-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্য-গর্বিত তোমাদের 'ভদ্রলোকের' অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই 'ছোটলোক' এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও-যে আমাদেরই মতো মানুষ– সেও যে সেই এক আল্লাহ্-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,– তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে– আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের আভিজাত্য-গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা– (যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) মনে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগকে শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি ভারতে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? ইঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই 'ছোটলোক'কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,– সে আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,– সে যে ডাকার মতো ডাক,– তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্রবাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো– দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি, –ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ বোধন-বাঁশিতে সুর দিই–

'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!'

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অট্টালিকা– প্রাসাদ। **অধিবাসী–** নিবাসী; বাসিন্দা। **আভিজাত্য–** কৌলীন্য; বংশমর্যাদা। **উন্মেষ–** উদ্রেক; সূত্রপাত। **উপেক্ষা–** তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অযত্ন, অনাদর। **উৎপীড়ন–** উত্যক্তকরণ, জুলুম, অত্যাচার। **ওতপ্রোতভাবে–** বিশেষভাবে জড়িত; পরিব্যাপ্ত। **কর্ণপাত–** কান দেওয়া। **ক্লেশ–** দুঃখ; কষ্ট। ***চণ্ডাল–*** চাঁড়াল, হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্গের লোক। ***মসীময়–*** কালিমাখা; অন্ধকারাচ্ছন্ন। **দুর্ভাগা–** হতভাগা; অদৃষ্ট মন্দ এমন। ***দৈন্য–*** দারিদ্র্য; দীনতা। **বিদ্রোহাচরণ–** প্রচলিত বা বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করা। **বোধন–** জ্ঞান; অবগতি। ***বোধন-বাঁশি–*** বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি। **ব্যগ্র–** ব্যাকুল; আগ্রহযুক্ত; কৌতূহলী। **ভাস্বর–** দিবাকর; সূর্য; দীপ্তিমান। **যুগান্তর–** অন্য যুগ।

সারসংক্ষেপ :

ভদ্রলোকেরা যাদের 'ছোটলোক' বলে অবজ্ঞা করে, তারাই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। এরাই আসলে কাজের মানুষ। ভদ্রলোকেরা কথায় যত ওস্তাদ, কাজে তত নয়। অকারণ ঘৃণায় তারা নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষগুলোকেও কুণ্ঠিত করে রাখে। তাই দেশের উন্নতিতে অবদান রাখার লোকের এত অভাব। মহাত্মা গান্ধী এ কথা জানতেন। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ডাকে। যে বিপুল মানুষকে আমরা উপেক্ষা করছি, তাদের মধ্যে যদি বিশ্বাস জাগানো না যায়, যদি মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ না জাগানো হয়, তাহলে দেশ-জাতির উন্নতি অধরাই থেকে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোককে কি বলা হয়?
   ক. ক্ষত্রিয় খ. ব্রাহ্মণ
   গ. বৈশ্য ঘ. চণ্ডাল

২. মহাত্মা গান্ধী যে গুণের দ্বারা দেশের জনতাকে সম্মোহিত করেছিলেন–
   ক. সন্ন্যাস খ. বাগ্মিতা গ. মানবতাবোধ ঘ. রাষ্ট্রভাবনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই–
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।

৩. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটি উঠে এসেছে?
   ক. বর্ণভেদ খ. জাতিভেদ গ. মানবতা ঘ. কুটিলতা

৪. উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধ অনুসরণে মহাত্মা গান্ধী চরিত্রে যেটা নেই–
   i. জাতিভেদ ii. বর্ণপ্রথা iii. ধর্মভেদ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কাজী নজরুল ইসলাম ছেলেবেলায় কীসে যোগ দিয়েছিলেন?
ক. লেটো গানের দলে
খ. কবি গানের দলে
গ. পুথি গানের দলে
ঘ. কীর্তন গানের দলে

৬. 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে লেখক যাদের হাত ধরতে বলেছেন–
ক. বিপ্লবীদের
খ. উপেক্ষিত ভাইদের
গ. হরিজনদের
ঘ. গণতন্ত্রকামীদের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ড. আম্বেদকর ব্রিটিশ ভারতে হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ধনী-গরীব, কুলি-মজুর, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

৭. উদ্দীপকের ড. আম্বেদকরের সঙ্গে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের যে চরিত্রের মিল রয়েছে–
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. চিত্তরঞ্জন দাশ
ঘ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে–
ক. সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করবে
খ. সাম্যবাদ বিরাজ করবে
গ. অভিজাততন্ত্র বিরাজ করবে
ঘ. গণতন্ত্র বিরাজ করবে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

ক. 'বোধন-বাঁশি' অর্থ কী?
খ. 'ছোট লোকের অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? –তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাবই যেন 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. বোধন-বাঁশি অর্থ বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি।

খ. 'ছোট লোকের অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।' –উক্তিটি দ্বারা কাজী নজরুল ইসলাম কথিত ছোটলোকদের সরল মুক্ত উদার প্রাণের কথা বুঝিয়েছেন।
সমগ্র বিশ্ব আজ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত। শোষক ও শোষিত। কাজী নজরুল ইসলাম সারা জীবন এই শোষিত শ্রেণির জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কথিত ছোটলোক সম্প্রদায়ের সরল স্বচ্ছ মনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি তাদের মনকে কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্তর বলেছেন।

গ. উদ্দীপকে 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জগতের সব মানুষ এক ও অভিন্ন– এই সত্যটির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
আমাদের এই পৃথিবী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের বাসভূমি। এ ধরণীর স্নেহচ্ছায়ায় এবং একই সূর্য ও চন্দ্রের আলোতে সকলেই আলোকিত। মানুষের মানবীয় অনুভূতি যথা শীতলতা, উষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সবারই এক ও অভিন্ন। অথচ সমাজে কেউ শোষক, কেউ শোষিত। কেউ ইটের পর ইট সাজিয়ে রক্ত ও ঘাম দিয়ে অট্টালিকা গড়ে,

কেউ তাতে সুখে নিদ্রা যায়– এ বৈষম্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এ বৈষম্য, এ পার্থক্য কৃত্রিম। সবার এক ও অভিন্ন পরিচয়– আমরা সবাই সানুষ।

উদ্দীপকে সারা পৃথিবীতে জাতি-বর্ণ-গোত্র পরিচয়ের ঊর্ধ্বে যে মানবসমাজ– তার জয়গান ফুটে উঠেছে। মানুষ হিসেবেই মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হওয়া উচিত– সাম্যের এই বাণী গুরুত্ব পেয়েছে। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও লেখক এটাই প্রত্যাশা করেছেন। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে মানবজাতি এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জয়গান করেছেন। ভদ্র সমাজ যদি তাদের তথাকথিত ছোটলোক বলে অবহেলা না করে মানুষ হিসেব মূল্য ও মর্যাদা দেয় এবং তাদের জেগে ওঠার সুযোগ দেয় তাহলে তারা জগতে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে। উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের এই ধারণাগুলোই ব্যক্ত হয়েছে।

ঘ. জগতের সব মানুষের এক ও অভিন্ন পরিচয়– আমরা সবাই মানুষ। এই চেতনা উদ্দীপক এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূল ভাব আর তা একসূত্রে গাঁথা।

পৃথিবীর নানা দেশে রয়েছে নানা জাতি। বিচিত্র তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় আলোকিত, একই লাল রক্ত তাদের শরীরে প্রবাহিত হয়। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সমানুষের পার্থক্য করা উচিত নয়।

উদ্দীপকে মানুষে মানুষে সাম্য ও মৈত্রীতে বন্ধনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম-বর্ণ জাতিভেদ ছাপিয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। তাই বিশ্বের এক মানুষ অন্য মানুষের আত্মীয় ও বন্ধু। 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধেও কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী মানসিকতার দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। ভদ্রলোকেরা যাদের ছোটলোক মনে করে তাদের অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হতে দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ তারাও মানুষ। সমাজে তাদেরও অধিকার রয়েছে। প্রাবন্ধিক তাদের মর্মবেদনা বোঝার মত মানসিকতা অর্জনের জন্যও তথাকথিত ভদ্র লোকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী যেমন করে নিম্নশ্রেণি, গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের মানুষদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন, তেমনি করে এ ছোটলোকদের ভালোবাসলে তাদের পক্ষে কঠিন কাজও করা সম্ভব। এই উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন হলে সাম্যবাদের বাণী ছড়িয়ে যাবে পুরো বিশ্বে। তখন পৃথিবীর মানুষ একই মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। উদ্দীপকের পঙ্ক্তিতেও এভাবটিই ফুটে উঠেছে। তাই, উদ্দীপকের মূল ভাব এবং 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের মূলভাব একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশে সমাজ বিপ্লবের অগ্রসেনানী। এদেশে প্রচলিত সামন্তবাদ ও দুর্বৃত্ত পুঁজির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতাকে। মাওলানা ভাসানী একাকার হয়ে গিয়েছিলেন মেহনতি জনতার কাতারে।

ক. বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি কোনটি?

খ. 'দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে।' –কারা এবং কিভাবে?

গ. উদ্দীপকের মাওলানা ভাসানী চরিত্রটি ' উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মাওলানা ভাসানী এবং মহাত্মা গান্ধীর চেতনা একইসূত্রে গাঁথা।" –উদ্দীপক ও 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. খ

শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ ও মাতা ফতেমা খাতুন। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় কুমিল্লায় নানাবাড়িতেই তিনি বেড়ে ওঠেন। কুমিল্লার ইউসুফ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে চাকুরি করেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি তাঁর রচনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, মানবতাবোধ ও মানুষের জীবনাচরণের মৌলিক বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত ও উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে মহত্তম জীবনের সন্ধান করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর এবং মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন মূলত প্রবন্ধকার। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনা সংকলন করে *'সংস্কৃতি কথা'* (১৯৫৮) নামে একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ বের করেন। *'সভ্যতা'* ও *'সুখ'* তাঁর দুটি অনুবাদগ্রন্থ। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর *'সংস্কৃতি কথা'* গ্রন্থের 'মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ। মানুষের দুটি সত্তা– একটি তার জীবসত্তা, অপরটি মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব। শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে। আবার মানুষের জীবসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। জীবসত্তার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। এ বিকাশে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষার কাজ জ্ঞান সৃষ্টি বা বিতরণ করা নয়; মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- মানুষের জীবদেহ আর মনুষ্যত্বের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষার গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব ওপরের তলা। জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই আমাদের মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীবসত্তার ঘরেও সে কাজ করে; ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায়, শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়। শিক্ষার এ দিকটা যে বড় হয়ে ওঠে না, তার কারণ ভুল শিক্ষা ও নিচের তলায় বিশৃঙ্খলা জীবসত্তার ঘরটি এমন বিশৃঙ্খল হয়ে আছে যে, হতভাগ্য মানুষকে সব সময়ই সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। ওপরের তলার কথা সে মনেই আনতে পারে

না। অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি। ধনী-দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে : চাই, চাই, আরও চাই। তাই অন্নচিন্তা তথা অর্থচিন্তা থেকে মানুষ মুক্তি না পেলে, অর্থসাধনাই জীবনসাধনা নয়– একথা মানুষকে ভালো করে বোঝাতে না পারলে মানবজীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না। ফলে শিক্ষার সুফল হবে ব্যক্তিগত, এখানে সেখানে দু একটি মানুষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটি উপলব্ধি করতে পারবে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই যে তিমিরে সে তিমিরে থেকে যাবে।

তাই অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার যে চেষ্টা চলেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে সে চেষ্টাও মানুষকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না। কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু? প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো হাওয়ার স্বাদবঞ্চিত মানুষ কারাগারকেই স্বর্গতুল্য মনে করে। কিন্তু তাই বলে যে তা সত্যসত্যই স্বর্গ হয়ে যাবে, তা নয়। বাইরের আলো হাওয়ার স্বাদ পাওয়া মানুষ প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলেও কারাগারকে কারাগারই মনে করবে, এবং কী করে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই হবে তার একমাত্র চিন্তা। আকাশ-বাতাসের ডাকে যে পক্ষী আকুল, সে কি খাঁচায় বন্দি হবে সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে? অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়, এই বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এই মুক্তির দিকে লক্ষ রেখে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মানুষটিকে তৃপ্ত রাখতে না পারলে আত্মার অমৃত উপলব্ধি করা যায় না বলেই ক্ষুৎপিপাসার তৃপ্তির প্রয়োজন। একটা বড় লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই অন্নবস্ত্রের সমাধান করা ভালো, নইলে আমাদের বেশি দূর নিয়ে যাবে না।

তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। শুধু অন্নবস্ত্রের সমস্যাকে বড় করে তুললে সুফল পাওয়া যাবে না। আবার শুধু শিক্ষার ওপর নির্ভর করলে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। মনুষ্যত্বের স্বাদ না পেলে অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েও মানুষ যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকতে পারে; আবার শিক্ষাদীক্ষার মারফতে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলেও অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায় মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়।

কোনো ভারী জিনিসকে ওপরে তুলতে হলে তাকে নিচের থেকে ঠেলতে হয়, আবার ওপর থেকে টানতেও হয়; শুধু নিচের থেকে ঠেললে তাকে আশানুরূপ ওপরে ওঠানো যায় না। মানব উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষা সেই ওপর থেকে টানা, আর সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিচের থেকে ঠেলা। অনেকে মিলে খুব জোরে ওপরের থেকে টানলে নিচের ঠেলা ছাড়াও কোনো জিনিস ওপরে ওঠানো যায়– কিন্তু শুধু নিচের ঠেলায় বেশিদূর ওঠানো যায় না। তেমনি আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার দ্বারাই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব, কিন্তু শুধু সমাজ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলতার দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষাদীক্ষার ফলে সত্যিকার মনুষ্যত্বের ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কথাটা বুলিমাত্র নয়, সত্য। লোভের ফলে যে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে, অনুভূতির জগতে সে ফতুর হয়ে পড়ে, শিক্ষা মানুষকে সে-কথা জানিয়ে দেয় বলে মানুষ লোভের ফাঁদে ধরা দিতে ভয় পায়। ছোট জিনিসের মোহে বড় জিনিস হারাতে যে দুঃখ বোধ করে না, সে আর যাই হোক, শিক্ষিত নয়। শিক্ষা তার বাইরের ব্যাপার, অন্তরের ব্যাপার হয়ে ওঠে নি। লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়। শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

শিক্ষার মারফতে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো; কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছতে দেরি হয় বলে অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। পায়ের কাঁটার দিকে বারবার নজর দিতে হলে হাঁটার আনন্দ উপভোগ করা যায় না, তেমনি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় হামেশা বিব্রত হতে হলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই দু দিক থেকেই কাজ চলা দরকার। একদিকে অন্নবস্ত্রের চিন্তার বেড়ি উন্মোচন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের আহ্বান, উভয়ই প্রয়োজনীয়। নইলে বেড়িমুক্ত হয়েও মানুষ ওপরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করবে না, অথবা মনুষ্যত্বের আহ্বান সত্ত্বেও ওপরে যাওয়ার স্বাধীনতার অভাব বোধ করবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো উড়বার আকাঙ্ক্ষায় পাখা ঝাপটাবে, কিন্তু উড়তে পারবে না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অর্থসাধনা– অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। **আস্বাদন–** রস গ্রহণ; স্বাদ গ্রহণ। ***উন্মোচন–*** উন্মুক্ত করা। **উত্থিত–** উৎপন্ন। ***কারারুদ্ধ আহারতৃপ্ত মানুষের মূল্য কতটুকু?–*** খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেলেই জীবনের উন্নয়ন সম্ভব হয় না; এ জন্য প্রয়োজন চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। শিক্ষার মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ***জীবসত্তা–*** জীবের অস্তিত্ব। **জীবন সাধনা–** জীবন উন্নয়নের চেষ্টা। ***তিমির–*** অন্ধকার। ***নিগড়–*** শিকল; বেড়ি। **পরিচায়ক–** পরিচয় করিয়ে দেয় যে। ***পিঞ্জরবদ্ধ–*** খাঁচায় বন্দি। ***ক্ষুৎপিপাসা–*** ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। **প্রাচুর্য–** বাহুল্য; প্রচুরতা; আধিক্য। ***ফতুর–*** নিঃস্ব; সর্বস্বান্ত। ***বেড়ি–*** শিকল; শৃঙ্খল। ***মানবসত্তা–*** মানুষের অস্তিত্ব। মানবসত্তা বলতে লেখক মনুষ্যত্বকে বুঝিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে এই মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। **অর্থচিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দি–** লেখকের মতে আমরা জীবসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে অধিক মনোযোগী। ফলে অর্থচিন্তা আমাদের সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয়। **মারফতে–** মাধ্যমে; দ্বারা। ***লেফাফাদুরস্তি–*** বাইরের দিক থেকে ত্রুটিহীনতা কিন্তু ভিতরে ফাঁকি। ***হামেশা–*** প্রায়শই।

সারসংক্ষেপ :

মানুষের জীবন দোতলা ঘরের মতো। এর নিচতলা তার জৈবিক জীবন, আর উপরের তলা মনুষ্যত্ব। জৈবিক জীবনের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো মেটাতে হয়। কিন্তু মানুষের জন্য এটুকু যথেষ্ট নয়। মনুষ্যত্বই তার আসল পরিচয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে এই মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটায়। মানুষের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মুক্তি – চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হলে সে লক্ষ্যে পৌঁছানো দুরূহ। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজানো দরকার যেন তা জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, আবার মূল্যবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে সেখানে মুক্তি নেই যেখানে–

i. চিন্তার স্বাধীনতা নেই ii. বুদ্ধির স্বাধীনতা নেই iii. আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

২. কীভাবে মানব জীবনের উন্নয়ন সম্ভব?

ক. অন্নবস্ত্রের সমাধান ও মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে খ. প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি পেলে

গ. মানব জীবনে সোনা ফলাতে পারলে ঘ. বড় জিনিস ত্যাগ করলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মজিদ লেখাপড়া শেষ করে চাকুরির পেছনে না ছুটে ব্যবসায় শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যে বেশ কিছু টাকার মালিক বনে যায়। কিছুদিন পরে তাকে দেখা গেল শ্রীঘরে। লোকে বলে যে, তিনি খাদ্যে ভেজাল মেশাতেন।

৩. উদ্দীপকের মজিদ চরিত্র কোন প্রবন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব খ. পয়লা বৈশাখ

গ. বই পড়া ঘ. বাংলা শব্দ

৪. উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ অনুসারে মানুষের জন্য প্রয়োজন–

i. সুশিক্ষা ii. মনুষ্যত্ববোধ iii. সমাজচেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

ক. বঙ্গদর্শন　　খ. সভ্যতা
গ. স্বপ্নদর্শন　　ঘ. শিখা

৬. মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হচ্ছে–

i. ইতিহাস　　ii. বিজ্ঞান　　iii. শিক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বিলাতফেরত রাফিন সাহেব একজন আদর্শ মানুষ। তিনি মনে করেন শিক্ষার আসল কাজ হচ্ছে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা । শিক্ষা জ্ঞান দান নয় বরং মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় মাত্র।

৭. উদ্দীপকের বক্তব্য যে রচনায় প্রকাশিত হয়েছে–

ক. নিরীহ বাঙালী　　খ. মানুষ মুহম্মদ (স.)
গ. উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন　　ঘ. শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৮. উদ্দীপক ও আপনার পাঠ্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে–

i. লোভী মানসিকতা　　ii. অর্থচিন্তার প্রসারতা　　iii. মূল্যবোধের প্রাধান্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. ii ও iii　　ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ইমদাদুল হক একজন বাস্তববাদী শিক্ষক। জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে তিনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেন। তিনি বলেন, মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয়বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব। বস্তুত শিক্ষার আসল কাজ জ্ঞান পরিবেশন নয়, মূল্যবোধ সৃষ্টি; জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবেই আসে। তাই যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া হয় না, সেখানে শিক্ষা নেই।

ক. জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান কী?
খ. শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে?
গ. উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের চিন্তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের কোন দিককে তুলে ধরেছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।" –উদ্দীপক এবং 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সোপান হল শিক্ষা।

খ. জীবসত্তার ঘর থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা।

মানবজীবনকে একটি দোতলা ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবসত্তা সে ঘরের নিচতলা, আর মানবসত্তা বা মনুষ্যত্ব সে ঘরের উপরের তলা। শিক্ষাই জীবসত্তাকে মানবসত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। তবে জীবসত্তার ঘরেও তার

কাজ করতে হয় অর্থাৎ মানুষের অন্নবস্ত্রের ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

গ. উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের চিন্তা 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলনে শিক্ষার ভূমিকা তুলে ধরেছে। মানুষের পার্থিব জীবনে দুটি সত্তা রয়েছে– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা আসে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজ হয়। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। উদ্দীপকের ইমদাদুল হকের মতে, মানুষের জীবনে এ মূল্যবাধ তথা মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলিত হলে সে আলো ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র। মনুষ্যত্বের সে আলো প্রজ্জ্বলিত হবে একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়; তথাপি মানবজীবনে অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটবে। উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টিই 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা। –উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

মানুষের জীবনে দুটি সত্তা– জীবসত্তা ও মানবসত্তা। জীবসত্তার প্রয়োজনে অন্নবস্ত্রের চিন্তা আসে। শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের স্বাদ পেলে অন্নবস্ত্রের সমাধান সহজ হয়। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি, জ্ঞান দান নয়; জ্ঞান মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মূল্যবোধ হচ্ছে মনুষ্যত্বের মূল। আর এর বিকাশ ঘটে মানুষের আনন্দ, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধে। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্বের আলো প্রজ্বলিত হলে সে আলো ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র। মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারলে মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা বা জ্ঞান পরিবেশন মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায় হিসেবে আসে। আর যেখানে মূল্যবোধের মূল্য পাওয়া যায় না, সেখানে শিক্ষাও নেই।

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্বের স্বাদ লাভ করা যায়। এর জন্য অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থারও প্রয়োজন। তা না হলে জীবনের উন্নয়নে অনেক বিলম্ব ঘটে। মনুষ্যত্বের তাগিদে মানুষকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা ভালো, কিন্তু প্রাণিত্বের বাঁধন থেকে মুক্তি না পেলে মনুষ্যত্বের আহ্বান মানুষের মর্মে গিয়ে পৌঁছাতে দেরি হয়। তাই অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় তাই মনুষ্যত্ব। আর তাই শিক্ষাকে বলা যায় মানুষের মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ার সাধনা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মুক্তচিন্তার মানুষ বলে জনাব সালেহিনের শিক্ষিত সমাজে পরিচিতি রয়েছে। তিনি মনে করেন, মানুষের মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। এর একটি মানুষকে অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা, আর অন্যটি হচ্ছে শিক্ষার সাহায্যে তার মনুষ্যত্বের সাধনা। এ দুটি উপায়ে চেষ্টা করা হলে মানব জীবনে উন্নয়ন সম্ভব।

ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গদ্যে কার প্রভাব লক্ষণীয়?
খ. 'অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী।' –কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীকের সঙ্গে 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের মিলগুলো তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থ 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধের একটি বিশেষ অংশকে ধারণ করেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ   ২. ক   ৩. ক   ৪. ঘ   ৫. ঘ   ৬. ঘ   ৭. ঘ   ৮. ঘ

মমতাদি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর ডাকনাম মানিক এবং পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁদের আদিনিবাস ছিলো বাংলাদেশে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকুরির কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিলো মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি ৪২টি উপন্যাস ও দুই শতাধিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর '*পুতুল নাচের ইতিকথা*' ও '*পদ্মানদীর মাঝি*' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

উপন্যাস : *জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংসা, চিহ্ন*;
ছোটগল্প : *অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, বৌ, সমুদ্রের স্বাদ*;
কবিতা : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা*;
প্রবন্ধ : *লেখকের কথা*।

ভূমিকা

'মমতাদি' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের '*সরীসৃপ*' (১৯৩৯) গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। গল্পটিতে শৈশবে মনুষ্যসত্তার বিকাশে স্নেহ-ভালোবাসার গুরুত্ব, পেশা, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আত্মমর্যাদাবোধের নমুনা এবং গৃহকর্মে নিয়োজিত মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মমতাদি' গল্প পড়া শেষে আপনি–

- মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বিশিষ্ট পরিচয় লিখতে পারবেন।
- মানবিক সম্পর্কের এক সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।
- সব দিক রক্ষা করে ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষাকারী মমতাদির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মমতাদিদির ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- গল্পকথক কিশোরটির সাথে মমতাদির সুন্দর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শীতের সকাল। রোদে বসে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে বসে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনার রান্নার জন্য লোক রাখবেন? আমি ছোট ছেলে-মেয়েও রাখব।

নিঃসঙ্কোচ আবেদন। বোঝা গেল সঙ্কোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সঙ্কোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরনে সেলাই করা ময়লা শাড়ি, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষত-চিহ্ন-আন্দাজে পরা টিপের মতো।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনী?

চমকে তার মুখ লাল হলো। সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধহয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনী। আমায় রাখবেন? আমি রান্না ছাড়া ছোট ছোট কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

পনের টাকা মাইনে ঠিক হলো। সে বোধহয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দুচোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন? রান্নাঘর দেখবে না? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখবো, বলে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল না, আমায় তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেল। ওকে আমার ভালো লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু, আমি ক্ষুণ্ন হয়ে মার কাছে গেলাম। একটা বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ়!

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে? ভাবিস না, তোকে খুব ভালোবাসবে। বার বার তোর দিকে এমন করে তাকাচ্ছিলো!

শুনে খুশি হলাম। রাঁধুনী পদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ করে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করল– অনর্থক প্রশ্ন করল না, নির্দেশের অভাবে কোনো কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এবাড়িতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিখুঁত হলো তার কাজ।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুশি হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে সে যে আমায় খুব ভালোবাসবে তার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ন। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার পাঁচ বার রান্না ঘরে দিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালোবাসল না। বরং রীতিমতো উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার করে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দুএকটি দরকারী কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতোই ম্লানিমার ঐশ্বর্যে মহীয়সী কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্বিকার।

রাগ করে আমি স্কুলে চলে গেলাম। সে কি করে জানবে মাইনে করা রাঁধুনীর দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ির ছোটকর্তা ছটফট করেছে!

সপ্তাহখানেক নিজের নতুন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল এক গাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুনছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধহয় অসুখ হবে, আর খেয়ো না। কেমন?

ভর্ৎসনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম। এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসে জল খাবে।

বাড়ির সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি–

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কি হলো বামুনদি?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলো না খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোট এক নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথম ভারি লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব কথোপকথন মনে করে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে একরকম জড়িয়েই ধরে ছিল, হাত সরিয়ে ধরা পড়া চোরের মতো হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল, দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন করে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে।

তখন বুঝিনি, আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,– যদি কেবল মুখ কালো করে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনের টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললে, ও ওইরকম। সারাদিন বকবক করে। বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।

বলে মা চলে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে ঝরে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়তো শুকনোই থাকত, সম্মানে, চোখের জল ফেলল! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধহয় তার সইল না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনাড়ম্বর– জাঁকজমকহীন। **অনাহারে–** আহারের অভাবে বা খাদ্যের অভাবে। **অপ্রতিভ–** অপ্রস্তুত; হতবুদ্ধি। **আস্কারা–** প্রশ্রয়। **উপেক্ষা–** তুচ্ছ তাচ্ছিল্য; অযত্ন। **কৃতজ্ঞ–** যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে। **ক্ষিপ্রতা–** দ্রুত কার্য সম্পাদন। **তৎক্ষণাৎ–** সাথে সাথে। **দুর্বোধ্য–** যা বুঝতে পারা কঠিন। **নিঃসঙ্কোচ–** সংকোচ শূন্য; কুণ্ঠাহীন। ***পরদিন থেকে সে আর আসত না–*** না আসার কারণ আত্মসম্মান; মমতাদি টাকার জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ নিয়েছে সত্য, কিন্তু তাকে অসম্মান করলে বা সন্দেহের চোখে দেখলে নিজে অপমানিতবোধ করে চাকরিত্যাগের সাহস তার ছিল। ***পর্দা ঠেলে উপার্জন–*** এখানে নারীদের অন্তঃপুরে থাকার প্রথাভঙ্গ করে বাইরে এসে আয়-রোজগার করা বোঝাচ্ছে। ***বাছা–*** বৎস বা অল্পবয়সী সন্তান। ***বামুনদি–*** ব্রাহ্মণদিদির সংক্ষিপ্ত রূপ। আগে রান্না বা গৃহকর্মে যে ব্রাহ্মণকন্যাগণ নিয়োজিত হতেন তাদের কথ্যরীতিতে বামুনদি ডাকা হতো। **বিশীর্ণ–** বিশেষ ভাবে শীর্ণ বা দুর্বল। **বিস্মিত–** অবাক, চমৎকৃত। **ভর্ৎসনা–** তিরস্কার। **রূঢ়–** কর্কশ, কঠোর।

সারসংক্ষেপ :

মমতা ভদ্রঘরের মেয়ে। আর্থিক অনটনে পড়ে অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছে। তার কাজের হাত ভালো। আচরণ সংযত। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে যথেষ্ট সতর্ক। কারো করুণাও চায় না, বাড়তি মনোযোগও চায় না। কাজের ও আচরণের সৌন্দর্যে সে সবার ভালোবাসা অর্জন করল। বাড়ির ছোট ছেলেটি তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে ভাই-বোনের মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে নিজের মর্যাদা যেন রক্ষিত থাকে, সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম কী?
   ক. নিশীথকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়　　খ. নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
   গ. শশীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়　　ঘ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'উনি রাগ করে'– এখানে 'উনি' বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে?
   ক. মমতাদির প্রতিবেশী　　খ. মমতাদির স্বামী
   গ. মমতাদির ছেলে　　ঘ. মমতাদির বোন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নদী-ভাঙনে নিঃস্ব সুরেশ সম্প্রতি পৌরসভায় ঝাড়ুদারের কাজ নিয়েছে। তাই বলে কেউ তাকে অসম্মান করে না। সেও সবাইকে শ্রেণিমত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে।

৩. উদ্দীপকের সুরেশের সঙ্গে কোন চরিত্রটির মিল রয়েছে?
   ক. মমতাদি　　খ. গল্পকথকের মা
   গ. গল্পকথকের প্রতিবেশী　　ঘ. গল্পকথক

৪. উদ্দীপকের সুরেশ ও গল্পের মমতাদির মধ্যে সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে যে বিষয়ে–
   i. কর্মনিষ্ঠা
   ii. সততা
   iii. জীবন সংগ্রাম

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i　খ. ii　গ. iii　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি−

- মমতার অসুখী দাম্পত্য জীবনের পরিচয় লিখতে পারবেন;
- মমতার বাড়ির অসহনীয় গরিবির বিবরণ দিতে পারবেন;
- প্রতিকূলতার মধ্যেও কীভাবে মমতা নিজের ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষা করেছে, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

তিন চার দিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হয়, আঙ্গুলের দাগ। মাস্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙ্গুলের দাগ কেন? কে চড় মেরেছে?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়া বলল, দূর! তারপর হেসে বলল, আমি নিজে মেরেছি! কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে−

মশা মারতে গালে চড়! বলে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদবুদফাটা বাম্পে কি দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নিচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলছ দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি না। কে মারবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হলো। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠার আনা আছে! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ওকথা ঘোষণা করে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপি চুপি বলল, কারো কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দিলাম আমি?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারী নামাতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়া একরাশি চুল মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বৈকি। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস করে ছোট ছেলেকে শোনানো; কারও কাছে যা পাই না তুমি তা দেবে কেন? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড় রহস্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেয়নি! ভেবেচিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণী পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ করে দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হলো সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরি হলে তুমি কি করবে?

তুমি কি করতে বল? হরির লুট দেব? না তোমায় সন্দেশ খাওয়াব।

ধেৎ তা বলছি না। তোমার বরের চাকরি নেই বলে আমাদের বাড়ি কাজ করছ তো চাকরি হলে করবে না?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে!

তোমার বরের চাকরি হয়েছে।

হয়েছে বলে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা স্বামীর চাকরি নেই বলে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরির জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার চাকরি হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরি হয়েছে?

সে স্বীকার করে বলল, হয়েছে। বেশি দিন নয়, ইংরাজি মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক করে দিতে পারছ না বলে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছ? তার কোনো দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এবেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরি হয়েছে তবু?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরি, তাতে কুলবে না মা। আমায় ছাড়বেন না। আমার কাজ কি ভালো হচ্ছে না?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবে না মা। সেজন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কি হয় খোকা?

মিথ্যে বললে কি হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যে বললে?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশি পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি! কাঁদছ কেন?

তখন তার চাকরির একমাস বোধহয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলা লেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছ নেই টের পেয়েও এক রকম জোর করেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দুটি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল! গলিটা আস্ত ইট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। দুদিকের বাড়ির চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না?

সাতাশ নম্বরের বাড়িটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যত ক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোট একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নিচে ঘরের সংখ্যা বোধহয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যেভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোট ছোট কুঠরির বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রনের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লার ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘরে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই শোবার ঘর করে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশি মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনি অবস্থান যে আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসা যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিসই প্রায় এঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কম দামী শ্রীহীন জিনিস। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড় চৌকি, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকির তলে একটি চরকা আর ভাঙ্গা বেতের বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তরালে হয়তো আরও জিনিস আছে। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাংক– দুটিরই রঙ চটে গেছে, একটির তালা ভাঙ্গা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনের ঠিক ঊর্ধ্বে কোনাকুনি টাঙ্গানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণের মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙ্গা টেবিল, আগাগোড়া দড়ির ব্যান্ডেজের জোরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্প দামী টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আর্সি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিস। টেবিলের ঊর্ধ্বে দেওয়ালের গর্তের তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে আর একটি জিনিস ছিল– একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকিতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিল, তারপর গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিশ টেনে বার করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথার তলে বালিশ দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি তো রাগ করে– কই, তুমি লেবু খেলে না।?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ করে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেব না, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম!

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল, কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মতো ভালোবাসত!

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, পানি তুলল, তারপর মশলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ি যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্তরালে– আড়ালে। **কৃতার্থ–** সফল; ধন্য। **দীনতা–** দারিদ্র্য। **প্রাচীর–** দেওয়াল। **সন্তর্পণে–** অতি যত্নে; অতি সাবধানে। **সন্দিগ্ধ–** সন্দেহযুক্ত। ***হরির লুট–*** হিন্দুদের হরি-সংকীর্তনের পর ভক্তদের মধ্যে হরির নামে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়া।

সারসংক্ষেপ :

মমতার গালের দাগ থেকে বোঝা যায়, সে স্বামীর নির্যাতনের শিকার। কিন্তু সে কথা কারো কাছে সে স্বীকার করে না। স্বামীর চাকরি হওয়ার পরেও সে গৃহপরিচারিকার কাজ ছেড়ে দেয় না। এ থেকে তার পরিবারের দারিদ্র্য আর স্বামীর অসহযোগিতার বিষয়ে ধারণা হয়। এক নোংরা গলিতে ছোট্ট ঘরে সে থাকে। দমবন্ধ পরিবেশ। অতিথি আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য রক্ষা করে সমস্ত পরিস্থিতি সুন্দরভাবে সামলানোর ক্ষমতা আছে মমতাদির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. মমতাদির ঘরে কয়টি ট্রাংক আছে?
ক. পাঁচটি খ. চারটি গ. তিনটি ঘ. দুটি

৬. মমতাদি অপরের বাড়িতে কাজ নেয় যে কারণে–
ক. অধিক উপার্জন প্রত্যাশী খ. স্বামীর চাকরি নেই
গ. লজ্জাহীন মনোভাব ঘ. গল্পকথকের মায়ের অনুরোধে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শমীর স্বামী হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ায় তাকে চাকরি নিতে হয় পাশের মুন্নু এ্যাপারেলস্-এ। পরবর্তী সময়ে স্বামী চাকরি ফিরে পেলেও সে আর চাকরিটা ছাড়তে চায়নি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন গল্পের মিল রয়েছে?
ক. আম আঁটির ভেঁপু খ. বাঁধ গ. মমতাদি ঘ. পালামৌ

৮. উদ্দীপকের শমী ও গল্পের মমতাদির মিল রয়েছে যে বিষয়ে–
i. দুজনই কর্মঠ নারী ii. দুজনই আত্মপ্রত্যয়ী iii. দুজনই অল্প আয়াসে ধনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'মমতাদি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত ?
 ক. সরীসৃপ খ. সহরতলী গ. জননী ঘ. চতুষ্কোণ

১০. 'আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন ?'– বাক্যটি দ্বারা কী বোঝায়?
 ক. অনুসন্ধান খ. বিস্ময় গ. অনুজ্ঞা ঘ. জিজ্ঞাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পথে দেখি এক পর্বত প্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল– একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হতো।'

১১. উদ্দীপকের আবদুর রহমান 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
 ক. গল্পকথক খ. মমতাদি গ. মমতাদির স্বামী ঘ. গল্পকথকের মা

১২. উদ্দীপকের আবদুর রহমান আর মমতাদির চরিত্রে ফুটে উঠেছে–
 ক. কর্মনিপুণতা খ. কর্মদক্ষতা গ. দায়িত্বশীলতা ঘ. অভিনয় প্রবণতা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তরাই নদীর তীরে একটি ইটের ভাটায় কাজ করে গোবিন্দ। সে সেখানে কাজ করে বেশ ভালোভাবে। সবার সঙ্গে তার ভদ্র আচরণ। তার সততা ও ভদ্র আচরণ সত্ত্বেও ইট ভাটার মালিক তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। ঠিকমতো তাকে বেতন দেয় না। নিরীহ গোবিন্দ নীরবে সকল কিছু সহ্য করে যায়।

ক. মমতাদির বয়স কত?
খ. 'পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছেন।' –কে এবং কেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পে রয়েছে আলাদা রকমের বাস্তবতাবোধ।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার মহান দার্শনিক প্লেটো। তিনি অবলোকন করেছেন যে, মানব চরিত্রের সুন্দর বিকাশ আর মহৎ গুণাবলীর সমাবেশে তার অনন্য পরিচয় ফুটে উঠে। এজন্য তাকে কর্মমুখর জীবন যাপন করতে হয়। কর্মময় জীবনের বিচিত্র ও মহৎ অবদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের গৌরবময় বিকাশ সাধিত হয়।

ক. মমতাদির গালে কয়টি দাগ ছিল?
খ. 'মমতাদি' গল্পকথককে বাইরের রোয়াকে বসাল কেন?
গ. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের সাযুজ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "মানুষের গৌরব নিহিত রয়েছে তার কর্মময় জীবনে।" –উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. মমতাদির বয়স ২৩ বছর।

খ. সংসারে দারিদ্র্যের কারণে মমতাদি পর্দা ঠেলে বাইরে এসেছেন।
স্বামী আর ছেলেকে নিয়ে মমতাদির সংসার। চার মাস ধরে তার স্বামীর চাকরি নেই। সংসারে অভাব। কোনো মতেই সংসার আর চলছে না। তাই বাধ্য হয়ে পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য মমতাদি বাইরে এসেছেন।

গ. উদ্দীপকের গোবিন্দের সাথে মমতাদির সাদৃশ্য রয়েছে চাকুরির ধরন ও চাকুরিতে তাদের মনোনিবেশে।

দারিদ্র্যের কারণে অনেক সময় মানুষকে প্রত্যাশার চাইতে ছোট কাজ করতে হয়। তাই বলে তার সম্মানহানী হয় না। নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মগুণে সে সকলের মন জয় করতে পারে। এভাবে সে তার কর্মে একটি মর্যাদাজনক অবস্থান তৈরি করতে পারে। উদ্দীপকের গোবিন্দ ও গল্পের মমতাদি এই শ্রেণির চরিত্র।

মমতাদি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। সে গৃহকর্মী হিসেবে নীরবে কাজ করে যায়। মনিব যে ভাবে উপদেশ দেয় ঠিক সে ভাবে সে কাজ সম্পন্ন করে। যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, সেক্ষেত্রে সে অনর্থক প্রশ্ন না করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তা সমাধান করে ফেলে। উদ্দীপকের গোবিন্দও ইট ভাটায় চাকরি করে। সে সবার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কর্মীর অবস্থান কর্ম দ্বারা নিরূপিত হয়। কর্মী হিসেবে 'মমতাদি' গল্পের মমতাদি এবং উদ্দীপকের গোবিন্দ একই রকমের চরিত্র।

ঘ. উদ্দীপকের বাস্তবতা ও মমতাদি গল্পের বাস্তবতা আলাদা।

মানুষ তার জীবনকে প্রকাশ করে কর্মের মাধ্যমে। কর্মময় জীবন তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। সে তার জীবনকে কর্মময় জীবনের বৈচিত্র্য ও মহৎ অবদানের মাধ্যমে বিকশিত করে তোলে। ফুটে উঠে তার অনন্য পরিচয়। আলোচ্য উদ্দীপক ও 'মমতাদি' গল্পে তারই পরিচয় পাই।

'মমতাদি' গল্পে গৃহকর্মে নিয়োজিত মমতাদির প্রতি মানবিক আচরণ করার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে গৃহকর্মের কাজে একজন গৃহকর্মীর আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা, দক্ষতা ও পরিমিত ভাষা প্রয়োগের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে একজন ইট ভাটার শ্রমিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের বাস্তবতা ও গল্পের বাস্তবতা ভিন্ন।

উদ্দীপকে গোবিন্দ ইট ভাটায় কাজ করলেও সে সবার সাথে ভদ্র ব্যবহার করে এবং সততার সাথে কাজ করে। তবে মালিক তাকে উপযুক্ত মাইনে দেয় না বরং তার সাথে খারাপ আচরণ করে। পক্ষান্তরে 'মমতাদি' গল্পের বাস্তবতায় ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। মমতাদি অভাবের তাড়নায় পর্দা ঠেলে বাইরে এসে অন্যের গৃহে কাজ করে, তার সততা ও কর্মদক্ষতায় বাড়ির লোকজন খুশি। সবাই তার সাথে ভালো আচরণ করে। আর মমতাদি যে কোন পরিস্থিতিতে নির্দেশ ছাড়াই নিজের মত কাজ করে এবং পরিবারের সবার ভালোবাসা ও সম্মান লাভ করে। তাই, উদ্দীপক ও মমতাদি গল্পের বাস্তবতা আলাদা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে বিকালে হাজির হলুম ঐশীবুর বাড়িতে। বুবু আমাকে দুটো পেয়ারা খেতে দিলেন। আমি একটা খেলাম। বুবু আমার খাওয়া দেখে বললেন, ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি বললাম, তাহলে আর একটা পেয়ারা খাই। বুবু হাসলেন, এ হাসি যেন কতকালের জমানো কষ্টের। বললেন, খুশি হয়েছি। সবাই যদি তোর মতো ভালোবাসত।

ক. কত বৎসর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন?

খ. 'বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বুবু চরিত্রটি 'মমতাদি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে ? –আলোচনা করুন।

ঘ. 'উদ্দীপকের বুবু ও মমতাদির অপত্য স্নেহ যেন একইসূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. খ ১২. গ

পয়লা বৈশাখ

কবীর চৌধুরী

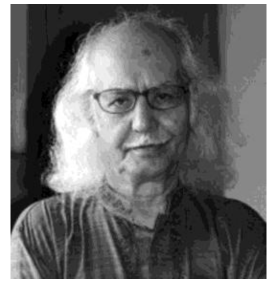

লেখক পরিচিতি

জাতীয় অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, লেখক, সংস্কৃতি ও সমাজকর্মী কবীর চৌধুরী ১৯২৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী ও মাতা আফিয়া বেগম। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালীর চাটখিল থানার গোপাইরবাগ গ্রামের মুন্সীবাড়ি। তাঁর স্ত্রী মেহের কবীর ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। কবীর চৌধুরী ১৯৩৮ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকায় সপ্তম স্থান ও ১৯৪০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ও ১৯৪৪ সালে স্নাতকোত্তর উভয়টিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও সভাপতিসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। তিনি শিক্ষাবিদ প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতেরও বেশি। একদিকে বাঙালি পাঠকদের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা এবং অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা ছিলো তাঁর অনুবাদকর্মের অনন্য দিক। কবীর চৌধুরী আজীবন ছিলেন প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবক্তা। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। কবীর চৌধুরী ২০১১ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

অবিস্মরণীয় বই, *ছয় সঙ্গী*, *প্রাচীন ইংরেজি কাব্য সাহিত্য*, *আধুনিক মার্কিন সাহিত্য*, *সাহিত্য কোষ*, *পুশকিন ও অন্যান্য*, *অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রাম ও অন্যান্য*, *নজরুল দর্শন*, *ছোটদের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস*, *বঙ্গবন্ধু*, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, *বিবিধ রচনা*, *মানুষের শিল্পকর্ম*, *স্মৃতিকথা*, *বাংলাদেশের উৎসব: নববর্ষ* প্রভৃতি।

ভূমিকা

কবীর চৌধুরীর 'পয়লা বৈশাখ' রচনাটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের উৎসব : নববর্ষ' (২০০৮) নামক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে, যা মোবারক হোসেন সম্পাদনা করেন। সর্বজনীন উৎসব হিসেবে পয়লা বৈশাখের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নববর্ষের ইতিহাস ও বাংলা নববর্ষের সাথে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ঐক্যসূত্র সম্পর্কে লেখক এখানে ধারণা দিয়েছেন।

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- নববর্ষ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের রূপ-রূপান্তর বর্ণনা করতে পারবেন;
- শহরে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে আরো তাৎপর্যময় করার জন্য কী করতে হবে তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে, সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। অবশ্য উদ্‌যাপনের রীতি-প্রকৃতি ও পদ্ধতি-প্রকরণের মধ্যে তারতম্য আছে, তবু সর্বক্ষেত্রেই একটি মৌলিক ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে। তা হল নবজন্ম বা পুনর্জন্ম বা পুনরুজ্জীবনের ধারণা, পুরানো জীর্ণ এক অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। টেনিসন যখন বলেন :

রিং আউট দি ওল্ড, রিং ইন দি নিউ,
রিং, হ্যাপি বেলস্‌ এ্যাক্রস দি স্নো :
দি ইয়ার ইজ গোয়িং, লেট হিম গো,
রিং আউট দি ফল্‌স, রিং ইন দি ট্রু ॥

তখন তার মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ করি। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক ॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক ॥
মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্‌ঝটিজাল যাক দূরে যাক ॥

তখন তার মধ্যে আমরা সেটা লক্ষ করি। একজন বলেছেন, পয়লা জানুয়ারিকে উদ্দেশ্য করে, আরেকজন লিখেছেন পয়লা বৈশাখকে মনের মধ্যে রেখে, কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবটি উভয়ক্ষেত্রেই এক।

পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব, তার অন্যতম জাতীয় উৎসব। এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। আবশ্য কালের যাত্রাপথ ধরে এর উদ্‌যাপন রীতিতে নানা পালাবদল ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন মাত্রিকতা অর্জন করেছে। সুদূর অতীতে এর সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্র ছিলো অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীন কৃষি সমাজের শীতকালীন নির্জীবতার পর নবজীবনের আবির্ভাবের ধারণার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বিষয়টি সম্পর্কিত ছিলো, একথা ভাবা অসঙ্গত নয়। এক সময় গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলা সব মানুষ, সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক, বাংলা নববর্ষের উৎসবে সোৎসাহে যোগ দিতো। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা, বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানা রকম খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলে সারা বছরের অন্যান্য দিনগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে এই দিনটি গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠতো। সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশি আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের নওরোজ বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তারও বহু শতবর্ষ আগে থেকে বাংলা মানুষ নানাভাবে এই দিনটি পালন করে আসছে।

কিন্তু পালা বদলের কথা বলছিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের দিনগুলোর এক পর্যায়ে বাংলা নববর্ষ পালনের মধ্যে এদেশের শোষিত ও পরশাসিত জনগণের চিত্তে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, যদিও সে সময়কার মুসলিম মানসে এর কোনো গভীর বা প্রত্যক্ষ অভিঘাত লক্ষ করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনকে অবলম্বন করে তার জাতীয়তাবাদী অনুষঙ্গের সঙ্গে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা যুক্ত হয়েছিলো, একটু লক্ষ করলেই তা বোঝা যায়। ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে তৎকালীন নয়া উপনিবেশবাদী, ক্ষীণদৃষ্টি, ধর্মান্ধ, পাকিস্তানি শাসকবর্গ যে মনোভাব প্রদর্শন করেন তা একইসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ও ন্যাক্কারজনক। তখন এ অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে একটি প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে পরম উৎসাহ ভরে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা

তাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তুলে ধরেছে, তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘোষণা করেছে, তাদের দীর্ঘদিনের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

আজ স্বাধীন বাংলাদেশেও এই দিনটি নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী মহলে হালখাতা ও মিঠাই বিতরণের অনুষ্ঠান তো আছেই। তার পাশাপাশি আছে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ও মেলার আসর, সঙ্গীতানুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সভা, বক্তৃতা-ভাষণ ইত্যাদি। তবে যে গ্রামবাংলা ছিলো পয়লা বৈশাখের আনন্দানুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র আজ অর্থনৈতিক কারণে শহরে, বিশেষভাবে রাজধানী ঢাকায়, পয়লা বৈশাখকে উপলক্ষ করে এখন যে চাঞ্চল্য ও আনন্দ-উৎসব দেখা যায় তা নিতান্তই মেকি একথা বলা যাবে না, কিন্তু তার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিকের বুর্জোয়া বিলাস ও ফ্যাশনের একটি বড় অংশ কাজ করছে সেকথা মানতেই হবে। পয়লা বৈশাখকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে, শ্রমজীবী মানুষের আন্তরসত্তার সঙ্গে এর রাখীবন্ধনকে আবার নতুন করে বাঁধতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদের আজ বাংলা নববর্ষের মধ্যে সচেতনভাবে নতুন মাত্রিকতা যোগ করতে হবে। বাংলা নববর্ষের উৎসব যে বিশেষভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত, শ্রেণিগত অবস্থান নির্বিশেষে, সাধারণ মানুষের উৎসব, এর একান্ত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র যে অত্যন্ত তাৎপর্যময় আজ সেকথাটা আবার জোরের সঙ্গে বলা চাই। নিজেকে একবার একজন হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে ভেবে দেখুন, তাহলেই এর শভিনিস্টিক দিকটি বুঝতে পারবেন। অথচ এ অঞ্চলের ঐতিহ্য তো তা নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শক্তির সামনে স্বাধীন বাঙলার সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সিরাজদ্দৌলা শেষ বারের মতো লড়াই করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয়কে। আমাদের ঐতিহ্য তো মীর মদন ও মোহন লালের, তিতুমীর ও মঙ্গল পাণ্ডের, গোবিন্দ দেব ও মুনীর চৌধুরীর। তবে কেন এখন এর রকম ঘটছে? পাকিস্তানি আমলের ধর্মের নামে নৃশংসতার ইতিহাস ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ?

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অপরাজেয় শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করুক, এক হোক আমাদের শুভ কামনা। জয় পয়লা বৈশাখ।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনুষঙ্গ– প্রসঙ্গ; সম্বন্ধ। **অপরাজেয়–** পরাভূত করা যায় না এমন। **অবিচ্ছেদ্য–** বিযুক্ত বা খণ্ডিত করণের অযোগ্য। **আইন-ই-আকবরী–** বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত গ্রন্থ। **আন্তরসত্তা–** অকৃত্রিম অস্তিত্ব। ***উপনিবেশ–*** জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য দলবদ্ধভাবে বিদেশে যে বসতি স্থাপন করা হয়; Colony. **ঐতিহ্য–** লোকপ্রসিদ্ধি; পরম্পরাগত কথা। **ঔপনিবেশিক–** উপনিবেশ স্থাপনকারী। ***কৌতূহলোদ্দীপক–*** যাতে কোনো অজানা বিষয় জানার আগ্রহ বাড়ে। ***ক্ষীণদৃষ্টি–*** সংকীর্ণ দৃষ্টি। ***গৌরবমণ্ডিত–*** মহিমাময়; মর্যাদাপূর্ণ। ***জাতীয়তা–*** স্বজাতিপ্রীতি সংক্রান্ত। ***নওরোজ–*** নতুন দিন। পারস্য দেশের নিয়ম অনুযায়ী নতুন বছরের প্রথম দিন। ***নির্জীবতা–*** প্রাণশূন্যতা। **নৃশংসতা–** নিষ্ঠুরতা। ***ন্যাক্কারজনক–*** অত্যন্ত নিন্দনীয়; ধিক্কারজনক। ***প্রত্যক্ষ অভিঘাত–*** সরাসরি আঘাত; এখানে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে। ***বুর্জোয়া বিলাস–*** উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের শখ। ***রাখিবন্ধন–*** শ্রাবণ পূর্ণিমায় প্রিয়জনের ডান হাতে মঙ্গল কামনায় রাখি বেঁধে দেওয়ার উৎসব। ***শভিনিস্টিক–*** রুশ রাজনৈতিক মতবাদী। **স্বতন্ত্র–** ভিন্ন; পৃথক; স্বাধীন। **সংস্কৃতি–** কৃষ্টি। ***সামাজিক প্রকৌশলী–*** সমাজবিনির্মাণের কারিগর। ***সাম্রাজ্যবাদ–*** পররাজ্যের ওপর কর্তৃত্ববিস্তাররূপ রাজনৈতিক কূটকৌশল। ***স্বাদেশিকতা–*** দেশপ্রেমিকতা; ***সোৎসাহ–*** উৎসাহের সঙ্গে; আগ্রহসহকারে। ***হালখাতা–*** নতুন বছরের হিসাবনিকাশের জন্য নতুন খাতা আরম্ভের উৎসব।

সারসংক্ষেপ :

নববর্ষের একটা বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা হল: পুরনোকে বিসর্জন দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানো। বাংলা নববর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। একসময় কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। নববর্ষে নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন হত। সময়ের পালাবদলে এর সঙ্গে রাজনৈতিক দিকও যুক্ত হয়। পাকিস্তানি শাসকপক্ষ বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা পেয়ে এ উদ্‌যাপন আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শোষণ আর পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে বাংলা নববর্ষ। বাংলা নববর্ষের যে একটা চমৎকার অসাম্প্রদায়িক দিক আছে, সে কথা মনে রাখলে আমাদের নববর্ষ পালন আরো বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা নববর্ষের কথা উল্লেখ আছে কোন গ্রন্থে?

ক. আইন-ই-আকবরী খ. তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী
গ. বাবরনামা ঘ. ফতোয়া-ই-আলমগীরী

২. 'শভিনিস্টিক' বলতে বোঝায়–

ক. রুশ জীবন পদ্ধতি খ. রুশ সংস্কৃতি চর্চা
গ. রুশ শিক্ষাব্যবস্থা ঘ. রুশ রাজনীতিক মতবাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষকে নববর্ষ উদযাপন করতে দেয়া হতো না। বলা হতো এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। ফলে পাকিস্তান আমলে নানা সময়ে বাঙালি জাতি ফুঁসে উঠেছে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'পয়লা বৈশাখ' রচনায় কোন শাসককে নির্দেশ করে?

ক. পাকিস্তানি খ. পাঠান
গ. রাজপুত ঘ. পাল

৪. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ' রচনায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ধর্ম পালনে বাধা ii. উৎসব পালনে বাধা iii. পাকিস্তানিদের ক্ষীণদৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বাংলা নববর্ষ বাঙালির কোন ধরনের উৎসব?

ক. ধর্মীয় খ. সামাজিক
গ. জাতীয় ঘ. পারিবারিক

৬. পয়লা বৈশাখ যে চেতনাকে ধারণ করে–

i. সাধারণ মানুষের উৎসব ii. বিশেষভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত iii. ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হালখাতা ও মিঠাই বিতরণ বাংলা নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এছাড়া রয়েছে বৈশাখি মেলা, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের আনন্দ আয়োজন। সাধারণ মানুষ শতবর্ষ আগে থেকে নববর্ষ উদযাপন করে আসছে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' রচনার মিল রয়েছে–

ক. নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতায় খ. মহরমের আনুষ্ঠানিকতায়
গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঘ. সাম্রাজ্যবাদী চেতনায়

৮. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ'প্রবন্ধে নববর্ষের যে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে–

i. আনুষ্ঠানিকতা ii. শোভাযাত্রা iii. ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সেই বাংলাদেশ ছিল সহস্রের একটি কাহিনি
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা পার্বণের ঢাকে ঢোলে
আউল বাউল নাচে; পূণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখ কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে ছাওয়া ঘরের আঙনে।

ক. 'স্বাদেশিকতা' শব্দের অর্থ কী?
খ. ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপক ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মধ্যে কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত চিত্রই যেন শোভা পায় বাঙালির পয়লা বৈশাখ উদযাপনে।" –'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল অংশ-১ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'স্বাদেশিকতা' শব্দের অর্থ দেশপ্রেম।

খ. ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা হচ্ছে ভেদাভেদহীন ধর্ম চেতনা। যে চেতনা একক কোন ধর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে সকল ধর্মের উদার চর্চায় বিশ্বাস করে।
বাঙালির বাংলা নববর্ষ উদযাপন একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসবে জাতি, ধর্ম, গোত্র, উঁচু-নিচু, সাদা-কালো কোনো ভেদাভেদ করা হয় না। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলাদেশের সব মানুষ, সে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যে ধর্মেরই হোক না কেন সবাই বাংলা নববর্ষের উৎসবে একসাথে অংশগ্রহণ করে। বিগত বছরের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার স্মৃতি মুছে ফেলে নব আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। তারা পরস্পর পরস্পরের আনন্দ ও কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বরণ করে নেয় বাংলা নববর্ষকে।

গ. বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে নানা বয়স, ধর্ম ও শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বজনীন এক জাতীয় উৎসবে অংশগ্রহণের বিষয়টিতে উদ্দীপকের বর্ণনার সঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য দেখা যায়।
পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। একসময় গ্রাম-নগর নির্বিশেষে পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খাওয়া-দাওয়া, নানা রকম খেলাধুলা, আনন্দ উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী মিলিয়ে এ দিনটি আনন্দমুখর হয়ে উঠত।
'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে নববর্ষের দিন বাঙালির পালন করা উৎসবের কথা বলা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসবে আনন্দ করে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকেও বাঙালির উৎসবের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায় বাঙালির পালা-পার্বণে ঢাক- ঢোল বাজে। পূণ্যাহের উৎসবে সকলে মিলে একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠে। এদিক থেকে উদ্দীপকের বর্ণনা ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মিল রয়েছে। রঙ-বেরঙের নানা সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রেও উদ্দীপক ও'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার প্রকাশ হয়েছে।
একটি জাতির সকল মানুষ যখন বিশেষ কোনো চেতনাকে ধারণ করে তখন তাকে জাতীয় চেতনা বলা হয়। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই একসঙ্গে মিলিত হয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসব। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখি মেলা ও লোকমেলার আয়োজন করা হয়। এ উৎসব কোন ধর্মের নয়, কোনো সম্প্রদায়ের নয়, এ উৎসব সকল বাঙালির।
উদ্দীপকের চিত্রে দেখা যায় নানা ধরনের মানুষ উৎসব উপলক্ষে একত্রে আনন্দ করছে। এটা তাদের জাতীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধেও এদেশের ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার সকল মানুষের একত্রে উৎসব পালন করার কথা

বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে সব ধরনের মানুষ একই সঙ্গে দুঃখ-বিষাদ ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। প্রবন্ধে পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির একত্র হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।
'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে জাতীয় চেতনাটি উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের চিত্রেও উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মানুষের একত্রীকরণ দেখানো হয়েছে, যা জাতীয় চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র ও 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের উৎসবের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনাই অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

পহেলা বৈশাখ। বাংলা বর্ষের প্রথম দিন। বাঙালির উৎসবের দিন। পহেলা বৈশাখ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতিবৎসরই বিপুল জনতা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এ শুধু আনন্দের উৎসব নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। বাঙালির নববর্ষ উৎসব অসাম্প্রদায়িক, ঐতিহ্যমণ্ডিত এবং সর্বজনীন। পয়লা বৈশাখের চেতনা চিরজীবী হোক, এই আমাদের কামনা।

ক. কবীর চৌধুরী কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন?
খ. 'বুর্জোয়া বিলাস' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের যে বিষয়গুলো 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করুন।
ঘ. 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের চেতনা উদ্দীপকটি কিছুটা হলেও ধারণ করেছে।' –স্বীকার করেন কি ? আপনার মতামত দিন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ঘ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

বাঁধ

জহির রায়হান

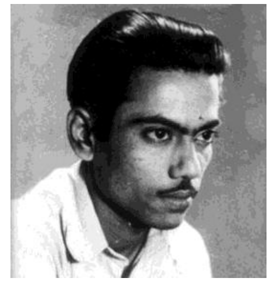

লেখক পরিচিতি

১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে জহির রায়হান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ কলকাতা ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আইএসসি পাস করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বোপরি চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি 'স্টপ জেনোসাইড' পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। এ-ছাড়াও তিনি আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। তিনি বাংলা একাডেমি ও স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহিদ হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী, আর কতদিন, কয়েকটি মৃত্যু।* এছাড়া তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন।

ভূমিকা

নেতৃত্ব, একতা, কর্মস্পৃহা যে সকল প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করতে পারে জহির রায়হান রচিত 'বাঁধ' গল্পে তা খুব সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির মানুষের ধর্ম ব্যবসার কথা লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জহির রায়হানের 'বাঁধ' গল্প পাঠ করলে আপনি–

- ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ বিড়ম্বনা আনতে পারে, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিশ্রমের সঙ্গে ভাগ্য পরিবর্তনের যোগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সমাজে দুই ধরনের মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি-

- কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে পীরদের প্রতাপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের প্রবীণ মাতব্বর সমাজ আর নবীন শিক্ষিত সমাজের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাহেবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবে চিন্তে বললেন রহিম সর্দার। তাই করেন হুজুর, তাই করেন! একবাক্যে সায় দিল চাষীরা। গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষ রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবির মনোয়ার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু'দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিয়েছিল তাঁকে।

কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সব্জী। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা।

দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন তিনটি গরুর গাড়ি লেগেছিল তাঁর।

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুররা। বললে, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথা দাঁতে জিভ কাটলো জমির মুন্সি।

তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা! ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা! কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার। কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখা তো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিয়ে বললেন জমির ব্যাপারী। চাঁদা দিলে দিবা না দিলে নাই, এত বাহাত্তরী কথা ক্যান?

কিন্তু, বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হলো তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেড়াতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল, পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইলো?

কথা নয় হারামজাদা! জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জি উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। আল্লাহর ওলি, পীর দরবেশ; ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁরা। এই বলে নূহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরি হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদী জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছ থেকে কথাটা শুনে রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলেন তিনি, এ্যাঁ! খোদার পীরের ঠাট্টা তামাসা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম্ব বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানী সুরত দেখে গাঁয়ে ছেলে বুড়োরা অবাক হলো। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে! ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই। গরিব মানুষ হুজুর! মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন। বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে।

বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হলো। সারা রাত চললো তার একটানা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তার বিরাম নেই। প্রতি বছর এ সময়ে শ্রাবণ মাসের 'ডাওর'। কেউ কেউ বলে বুড়ো বুড়ির 'ডাওর'। এই ডাওরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পুর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায় তাহলে সর্বনাশ! নির্ঘাত বন্যা!

'খোদা, রক্ষা কর! রক্ষা কর খোদা! রহম কর এই অধমগুলোর ওপর! কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমির ব্যাপারী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পীর সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তছবি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাকরেদরা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবতারণা– প্রস্তাবনা; ভূমিকা। **অলৌকিক–** মানুষের পক্ষে অসম্ভব; পৃথিবীতে ঘটে না এমন। **আয়ুষ্কাল–** জীবৎকাল। **ইতিবৃত্ত–** ইতিহাস। ***ওলাবিবি–*** প্রাচীন সমাজে পূজ্য কলেরা রোগের দেবী। ***কাফের–*** সত্য প্রত্যাখ্যানকারী; ইসলাম-বিরোধী লোক। ***তল্পিতল্পা–*** বিছানাপত্র বা অন্য জিনিসপত্রের বোঁচকা। ***নাফরমান–*** অবাধ্য; আদেশ অমান্যকারী। ***বাহাত্তরি কথা–*** বাহাত্তর বছর বয়স্ক শক্তিহীন অকেজো বৃদ্ধের সংলাপ; বাজে কথা। ***ভেংচি–*** উপহাসসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি। ***সাকরেদ–*** শাগরেদ; চেলা; সহকারী। **সন্তর্পণে–** অতি সাবধানে।

সারসংক্ষেপ :

প্রতি বছরই প্রবল বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে যায়। বন্যায় ভেসে যায় ফসল। ফসল হারানোর বেদনায় সবাই আহাজারি করে। কিন্তু কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয় না। এ বছরও বন্যার সময় ঘনিয়ে এসেছে। গ্রামের মাতব্বররা ঠিক করল, বন্যা ঠেকানোর জন্য গফরগাঁ থেকে পীরসাহেবকে নিয়ে আসবে। বাধা দিল মতি মাস্টার আর কলেজ-পড়ুয়া রশিদ। দোয়া পড়ে বন্যা ঠেকানো যায় – এ কথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। মাতব্বররা রুষ্ট হলেন। এদের পাপে খোদায়ি গজব নেমে আসবে ভেবে শঙ্কিত হলেন। যথারীতি পীরসাহেব এলেন। দোয়া-জিকির চলতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জহির রায়হান কোন ধরনের জীবনের রূপকার?
   ক. উচ্চবিত্ত　　খ. মধ্যবিত্ত
   গ. উচ্চ-মধ্যবিত্ত　　ঘ. নিম্ন-মধ্যবিত্ত

২. 'পীর আইন্যা বন্যা রুখবো! এ একটা কথা অইলো?' –উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
   ক. পীরের প্রতি ভালবাসা　　খ. সংস্কারমুক্ত চেতনা
   গ. পীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ　　ঘ. সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সরসপুরের পীর এসেছেন সফরে। কালু সর্দার বোকা নন। তিনি জানেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে।

৩. উদ্দীপকের কালু সর্দার 'বাঁধ' গল্পের কোন চরিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. জমির ব্যাপারী খ. মতি মাস্টার

গ. গনি মোল্লা ঘ. বুড়ো কাজী

৪. এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত যে বিষয়টিতে–

i. কুসংস্কারে ii. ধর্মভীরুতায় iii. পার্থিব লালসায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বহুজনের অংশগ্রহণে কীভাবে বাঁধ রক্ষা পেল, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধর্মান্ধ মানুষজনের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মনে আশা জাগে চাষিদের। আনন্দে চক্চক্ করে ওঠে কোটরে ঢোকা চোখগুলো। ভীড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, কই নাই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীর নয় খোদার খাস পীর!

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আর যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করলো কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। কিন্তু, থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু, মতি মাস্টার বিশ্বাস করলো না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বললো, ঝড় থামাবে ওই বুড়োটি? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?

হ্যাঁ, থামাবে। আলবত থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থন করলেন বুড়ো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলোর গাঁ থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই।

কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে "ঢল' রোখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বারবার সাবধান করছে। ঢল হইবো ঢল। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা। রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল।

হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন তিনি, খোদা!

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস। টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়লো ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, কে? ভয় নাই আমি মতি মাস্টার।

ব্যাপার কি? এ রাত্তির বেলা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ছকু। মতি মাস্টার বললো, যাও কনহানে?

যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?

না। স্বল্প থেমে মতি মাস্টার বললো। এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওয়া এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর। কোদাল দিয়া কি অইবো? রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি। যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বললো মন্তু শেখ।

এতক্ষণে পুরো দলটার দিকে চোখ পড়লো ছকু মুন্সির। একজন দুজন নয়, অনেক। অন্তত জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি।

মতি মাস্টার এত লোক জোটাল কেমন করে? কাজী বাড়ির পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাস্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে? ফল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষ তো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই, সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?

মতি মাস্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি-গালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, এস মিলাদ পড়তে এস। এস মঙ্গলের জন্য এস।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালো সে। খপ করে একখানা হাত চেপে ধরলে রশিদ, ছকু।

এই ছকা। ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা। ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়াল ছকু। খোদা সাবধান করছে তাদের। খবরদার যাইও না।

যাইও না মাস্টার। থামো, থামো! হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চল সবাই।

ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাস্টার। এখন কথা কইবার সময় না। জলদি চল।

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরুদের শব্দে ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরুদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মত ঊর্ধ্বে হাত তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক! হে রহমানের রহিম! তুমিই সব! তুমি রক্ষা কর আমাদের!

ওদিক মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাস্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না। তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা কিছুতেই। কখনই না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙে পড়বে।

হায় খোদা! ঘরের বৌ-ঝিয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই তাই তা খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর ঢুলে ঢুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল!

সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাস্টার। কোদাল চালাও! আরো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে।

এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বললে, আলির নাম নাও ভাইয়া, আলির নাম নাও।

আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত। তারছে একডা গান গাও। গায়ে জোস আইবো।

মন্তু শেখ গান ধরলো।

গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়লো একটা কাছে কোথায়। কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাস্টারকে আর তার চৌদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

ঝুড়ি মাথায় বিড়বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ির চাঁদু, হাত-পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাস্টারের গলার শব্দ শোনা গেল, আর ভয় নাই চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে! এতক্ষণে হাসি ফুটলো সবার মুখে। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পুব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ আলো অন্ধকার আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালি ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির বেপারী। ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেয়ে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে। ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন, খোদার কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো, সারারাত না ঘুমাইয়া খোদারে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙ্গে সাধ্য কি?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলের রক্তিমাভার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অশ্রাব্য– শোনা যায় না এমন। **আর্তনাদ–** কাতর চিৎকার; বিপদসূচক ক্রন্দনধ্বনি। **খরস্রোতা–** প্রবল স্রোত; অত্যন্ত বেগবান প্রবাহ। **ঝঞ্ঝা–** প্রচণ্ড ঝড়। **ফরিয়াদ–** অভিযোগ জানানো। **বিক্ষুব্ধ–** অত্যন্ত রাগান্বিত; বিচলিত। **বেদীন–** ধর্মহীন। **মৃদুমন্দ–** কোমল; মন্থর। **রক্তিমাভা–** লাল আভা যুক্ত। **রোখা–** বাধা দেওয়া।

সারসংক্ষেপ :

বেশিরভাগ মানুষ পীরসাহেবের দোয়া-জিকিরে অংশ নিচ্ছিল। এদিকে কয়েকদিনের টানা বর্ষণে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সে রাতে পীরসাহেব সবাইকে ডাকলেন মিলাদ পড়ার জন্য। আর মতি মাস্টার গ্রামের অন্তত পঞ্চাশজন লোক জড়ো করে বৃষ্টিতে ভিজে রওয়ানা দিলেন বাঁধের ভাঙন ঠেকানোর জন্য। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে মাটি কেটে তারা বাঁধের ভাঙন রোধ করতে সমর্থ হল। সকালবেলা মসজিদ থেকে লোক বেরিয়ে দেখল, বাঁধ ভাঙেনি। তারা ভাবলো, পীরসাহেবের কেরামতিই বুঝি তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পীর সাহেব গাঁয়ের সবাইকে কী জন্য ডেকেছিলেন ?

ক. মিলাদ পড়ার জন্য খ. গজল গাওয়ার জন্য

গ. আজান দেয়ার জন্য ঘ. তসবিহ পড়ার জন্য

৬. ছকু ভয়ে আঁতকে উঠেছিল কেন?

ক. কাজির সঙ্গে তর্ক করায় খ. প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ায়

গ. অশ্রাব্য গালি-গালাজ শুনে ঘ. সকলের হাতে ঝুড়ি-কোদাল দেখে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বৃদ্ধ মকবুল শেখ নদীর ঘাটে গাছের গুঁড়ি নৌকায় টেনে তুলছেন। আর সকলকে চিৎকার করে বলছেন, "আলির নাম নাও ভাইয়া, আলির নাম নাও।"

৭. উদ্দীপকের মকবুল শেখ 'বাঁধ' গল্পের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে–

ক. মন্তু শেখ খ. মতি মাস্টার

গ. জমির ব্যাপারী ঘ. আয়নাল শেখ

৮. উদ্দীপক ও 'বাঁধ' গল্প অনুযায়ী আলির নাম নিলে –

i. কাজে মনোবল বাড়ে ii. কাজে অবসর পাওয়া যায় ii. অন্যের সহযোগিতা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii, iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ওলা বিবি কে?

ক. কলেরা রোগের দেবী খ. বসন্ত রোগের দেবী

গ. মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী ঘ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী

১০. মতি মাস্টার জমির ব্যাপারীর বিরোধিতা করেছিল–

i. পীরকে ভেট দিতে হবে বলে ii. কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে iii. কর্মই জীবনের মূলমন্ত্র বলে

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ইভান গ্রামে স্কুল করতে চায়। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করে ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হবে, আলোকিত হবে। কিন্তু আমিন ব্যাপারি বলে– এইহানে পীরের দরগা বানাও। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। তবেই না সমাজের উন্নতি।

১১. উদ্দীপকের ইভান চরিত্রে 'বাঁধ' গল্পের কার প্রতিফলন রয়েছে?

ক. জমির ব্যাপারী খ. মতি মাস্টার

গ. মন্তু শেখ ঘ. রহিম সর্দার

১২. উদ্দীপকের আমিন ব্যাপারি ও 'বাঁধ' গল্পের গণি মোল্লার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে–
ক. ধর্মভীরুতা
খ. ধর্মসচেতনতা
গ. ধর্মহীনতা
ঘ. ধর্মবিমুখতা

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলার কারণে সয়ফুল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এক বন্ধুর পরামর্শে সে পরিচিত হয় নবীপুরের পীরের সঙ্গে। পীরের কথাবার্তায় সয়ফুল মুগ্ধ হয়ে একসময় তাঁর মুরিদ হয়। তার পীরকে খেদমত করার সামর্থ্য নেই। তবু কল্যাণের প্রত্যাশায় একদিন তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সয়ফুলের স্ত্রী অবশ্য এ কাজটি একদম পছন্দ করে নি।

ক. 'ভেংচি' কী?
খ. 'তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব।' –কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?
গ. উদ্দীপকের সয়ফুলের স্ত্রী ও 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সীর বৈসাদৃশ্য কোথায়? –আলোচনা করুন।
ঘ. "সয়ফুল এবং জমির মুন্সীর মতো লোকেরাই আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।" –উদ্দীপক এবং 'বাঁধ' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদ নামে এক লোকের আবির্ভাব ঘটে। তার বক্তব্য, এই গ্রামের ঘন ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ শ্যাওলা-ধরা যে প্রাচীন কবরটি রয়েছে তা একজন মোদাচ্ছের পীরের। এরপর সে ঐ কবরের উপর লালসালু কাপড় বিছিয়ে দেয়। কবরকে অবলম্বন করে সে গুছিয়ে নেয় তার আয়-রোজগারের পথ। গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে নানা সংস্কারের কথা বলে, মাজারের ভয় দেখিয়ে সে শিকড় গাড়ে গ্রামটিতে। অবশ্য আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মজিদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে চায়।

ক. 'কাফের' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'এ ফসল নষ্ট হতে পারে না।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের মজিদ ও 'বাঁধ' গল্পের মনোয়ার হাজীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কি? –বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. "সংস্কারাচ্ছন্ন পীরপ্রথার কবল থেকে সমাজকে এগিয়ে নিতে আক্কাস ও মতি মাস্টারের মত অগ্রসর চিন্তার মানুষের প্রয়োজন।" –উদ্দীপক ও 'বাঁধ' গল্পের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. ভেংচি হল উপহাসসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি।

খ. দাবিকৃত চাঁদা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে জমির ব্যাপারী মতি মাস্টারের বিরুদ্ধে উক্তিটি করেছিল।
গ্রামের পীরভক্তরা গফরগাঁও থেকে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে এলাকার বন্যা ঠেকানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করে পীর সাহেব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, মুমূর্ষু রোগীকেও তিনি বাঁচাতে পারেন। তবে তাকে আনতে গেলে, সোজা বাংলায় বলা যায়, টাকার প্রয়োজন। সবাই চাঁদা দিতে রাজি হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী আধুনিকমনস্ক মতি মাস্টার তার বিরোধিতা করে। জমির মুন্সির মতো লোকে মনে করে শিক্ষিত হয়ে এখনকার ছেলেরা মুরুব্বিদের মানে না, পীরদের শ্রদ্ধা করে না। তাই মতি মাস্টারের কথায় অনেকটা হতচকিত হয়ে জমির ব্যাপারী উক্তিটি করেছিল।

গ. উদ্দীপকের সয়ফুলের স্ত্রী ও 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য পীরবিশ্বাসে।
আমাদের সমাজে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য বেশি থাকে। এর সুযোগ নেয় একশ্রেণির পীর, এরা ধর্মব্যবসায়ী। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য এরা অনেক সময় ধর্মের অপব্যাখ্যা করে। তাদের ধর্মীয় অপব্যাখ্যা অনেক সময় মূল ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করে। উদ্দীপকের পীর এবং 'বাঁধ' গল্পের মনোয়ার হাজি এই শ্রেণির প্রতিনিধি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সয়ফুল ব্যবসায়ে মার খেয়ে বন্ধুর পরামর্শে নবীপুরের পীরের মুরিদ হয় এবং তার সেবাযত্নের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পীরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু সয়ফুলের বাস্তববাদী স্ত্রী বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখে নি। তিনি মনে করেন পীর নয়, মেহনত ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়। পীর কখনো ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না। পক্ষান্তরে, 'বাঁধ' গল্পে এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব হলে জমির মুন্সি গফরগাঁও হতে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে দোয়া-দরুদের মাধ্যমে বন্যা রোখার চেষ্টা করে । সে মনে করে আল্লার পীর ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে।

ঘ. ধর্মান্ধ সয়ফুল এবং জমির মুন্সীর মতো লোকেরাই আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

কুসংস্কার প্রতিটি সমাজে একটি সামাজিক ব্যাধি। মানুষের এই কুসংস্কার চেতনাকে কাজে লাগায় একশ্রেণির পীর। এভাবে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে। আর তাদের সহযোগিতা করে মুরিদ নামে একশ্রেণির পরগাছা টাইপের লোক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ধর্মান্ধ সয়ফুল ব্যবসায়ে মার খেয়ে বন্ধুর পরামর্শে নবীপুরের পীরের মুরিদ হয়। পীরকে সেবাযত্নের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ঘরে নিজের স্ত্রী আছে– একথাটা তার মনে থাকে না। সয়ফুলের বাস্তববাদী স্ত্রী বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখেনি। পক্ষান্তরে, 'বাঁধ' গল্পে দেখা যায়, এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটলে জমির মুন্সি গফরগাঁও হতে পীর মনোয়ার হাজিকে এনে দোয়া-দরুদের মাধ্যমে বন্যা রুখবার চেষ্টা করে । সে মনে করে আল্লার পীর ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। মতি মাস্টার চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে সে মতি মাস্টারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে। জমির মুন্সি সমমনাদের কাছে মতি মাস্টারদের মতো সংস্কারমুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। মুন্সি মনে করে, খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। তারপরে খোদা মুখ তুলে তাকাবেন। একসময় পীর মনোয়ার হাজি গ্রামে আসেন এবং খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। প্রসঙ্গক্রমে অসংখ্য আজগুবি ঘটনারও অবতারণা করেন তিনি।

মূলত 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সি ও উদ্দীপকের সয়ফুলের মত ধর্মান্ধ লোকদের সরলতা, প্রশ্রয় ও সমর্থনে আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভণ্ড পীরেরা সাধারণত খুব কৌশলী ও বিচক্ষণ হয়ে থাকে। তারা মেধাশূন্য,এবং হুজুগে লোকদের বেছে নেয় পরগাছা সাজার জন্য। 'বাঁধ' গল্পের জমির মুন্সি এবং উদ্দীপকের সয়ফুলেরা পীরদের চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে, আর ক্ষতির সম্মুখীন হয় সমাজের সকলে। এভাবেই তারা আমাদের সমাজে পীরপ্রথা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

শিলার ছোটভাই সাদমান একটি কূপের কাছে খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাদু তাকে জ্বীনে ধরেছে মনে করে মসজিদের ইমামের কাছে তাবিজ আনতে যান। এতে শিলার মন সায় দেয় না। সে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তার স্কুলশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে। শিলা সিদ্ধান্ত নেয় তার ভাইকে নিয়ে একজন চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হবে। অল্পক্ষণ পরেই সে বাবাকে নিয়ে হাঁটা দেয় চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে।

ক. 'নাফরমান' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'বাহাত্তরী কথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'বাঁধ' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধরুন।
ঘ. "মতি মাস্টারের সংস্কারমুক্ত চেতনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের শিলা চরিত্রে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ　২. খ　৩. ক　৪. খ　৫. ক　৬. খ　৭. খ　৮. ক　৯. ক　১০. গ　১১. খ　১২. ক

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

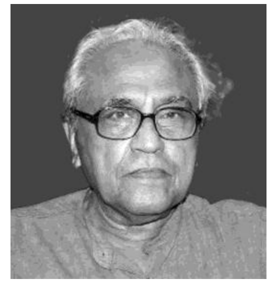

হায়াৎ মামুদ

লেখক পরিচিতি

হায়াৎ মামুদ ২ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মৌড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মনিরুজ্জামান। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে। দেশবিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে পিতার সঙ্গে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং বর্তমানে তিনি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর পিতা মুহম্মদ শমসের আলী এবং মাতা আমিনা খাতুন। হায়াৎ মামুদ ১৯৫৬ সালে ঢাকার সেন্টগ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯৫৮ সালে তৎকালীন কায়েদে-আজম কলেজ (বর্তমানে সরকারি হোসেন শহীদ সোহওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন বাংলা একাডেমিতে চাকরি করেন এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তিনি একজন আধুনিক কবি, প্রবন্ধকার, গবেষক ও শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ রচনা তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি প্রায় অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। শিশুসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

স্বগত সংলাপ, প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী, নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী, প্রতিভার খেলা– নজরুল, বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, কিশোর বাংলা অভিধান।

ভূমিকা

হায়াৎ মামুদ রচিত ‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে বিচিত্র ধরনের সাহিত্য রীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লেখক এখানে সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতার দিকটি এবং সাহিত্যের প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সম্পর্কে এই লেখায় একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে।

সাধারণ উদ্দেশ্য

‘সাহিত্যের রূপ-রীতি’ প্রবন্ধ পাঠ শেষে আপনি–

- সাহিত্যের প্রধান পাঁচটি শাখার পরিচয় লিখতে পারবেন;
- সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলোর শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কবিতা ও নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিচয় দিতে পারবেন;
- কবিতা ও নাটকের প্রধান ভাগগুলোর বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয়। আমরা সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য' বলি বটে, কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য, পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা-বিশে ষণ করে হৃদয়ঙ্গম করি। সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বুঝে থাকি, যেমন– কবিতা, মহাকাব্য, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি। আর 'রীতি' হলো ঐ শাখাগুলো কীভাবে নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা।

কবিতা

ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ পদ্যে, যা লিখিত হয় তাকেই আমরা 'কবিতা' বলে থাকি। কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো– মহাকাব্য ও গীতিকবিতা। বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যে। মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনি অবলম্বন করে। ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনির একটি হলো 'রামায়ণ' আর অন্যটি 'মহাভারত'। 'মহাভারত' সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– 'যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে', এর অর্থ : 'মহাভারত' গ্রন্থে যা নেই তা ভারতবর্ষেও নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না। 'মহাভারত' আয়তনে বিশাল। 'রামায়ণ' তার তুলনায় ক্ষুদ্র; কাহিনি হলো : পত্নী সীতাকে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস, তাঁদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; বনবাসে থাকার সময়ে লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণ তার বোন শূর্পনখার সম্মান রক্ষার জন্য সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগান বাড়িতে বন্দী করে রাখে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটিই রামায়ণ-কথা। অর্থাৎ এককথা, মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনি-কবিতা। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা, তবে তাকে গদ্যে না লিখে পদ্যে লিখতে হয়। এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা, যা 'গীতিকবিতা' হিসেবে পরিচিত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও তা তাঁর প্রধান সৃষ্টিকর্ম নয়। তিনি বলেছিলেন : 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফূটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। গীতিকবিতা কবির অনুভূতির প্রকাশ হওয়ায় সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যদি দীর্ঘও হয় তাতেও অসুবিধে নেই, যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতাবলি।

যদি গীতিকবিতাকে শ্রেণিবিভাজনের অন্তর্গত করতেই হয়, তাহলে এ রকম শ্রেণিবিভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় : ভক্তিমূলক (যেমন- রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, রজনীকান্তের রচনা), স্বদেশপ্রীতিমূলক (যেমন- বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম', রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা-গান), প্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক চিন্তামূলক বা দর্শনাশ্রয়ী কবিতা। শোক-গাথা বা শোক আশ্রয় করে লিখিত কবিতাও এর সমপর্যায়ভুক্ত।

বাংলা কবিতায় বিশেষ দুটি ধারার জনক কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্‌দীন। প্রথম জন আমাদের সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' ও দ্বিতীয় জন 'পল্লিকবি' হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। নজরুলের কবিতায় যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর ও দৃপ্ত ভাবের দেখা মেলে তা পূর্বে বাংলা কাব্যে ছিল না। জসীম উদ্‌দীনের 'নকশীকাঁথার মাঠ' ও 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' জাতীয় কোনো কাব্য পূর্বে কেউ রচনা করেন নি এবং এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীও কেউ নেই।

নাটক

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মনে রাখা দরকার, নাটক সেকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে (তখন তো ছাপাখানা ছিল না) ঘরে ঘরে পঠিত হত না, নাটক অভিনীত হতো। নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ। তার কারণ সাহিত্যের সকল শাখার ভিতরে নাটকই একমাত্র যা সরাসরি সমাজকে ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন। প্রাচীনকালে সে রকমই প্রথা ছিল। যেমন, শেক্সপীয়রও তাঁর সকল নাটক কবিতায় রচনা করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাব্য দুই ধরনের : দৃশ্যকাব্য ও

শ্রাব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য, সেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভবপর না হলে নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

নাটক সচরাচর পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত থাকে : ১. প্রারম্ভ, ২. প্রবাহ (অর্থাৎ কাহিনির অগ্রগতি), ৩. উৎকর্ষ বা Climax, ৪. গ্রন্থিমোচন (অর্থাৎ পরিণতির দিকে উত্তরণ), ৫. উপসংহার।

কাহিনির বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটককে প্রধানত ***ট্র্যাজেডি*** (Tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক), ***কমেডি*** (Comedy বা মিলনান্ত নাটক) এবং প্রহসন (Farce)– এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এদের মধ্যে ট্র্যাজেডিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। ট্র্যাজেডির ভিতরে দুইটি অংশ ক্রিয়াশীল থাকে : প্লট (Plot বা নাটকের আখ্যানভাগ), চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, চিন্তা বা জীবনদর্শনের পরিস্ফুটন, মঞ্চায়ন, সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে সুরসঙ্গতি। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যবেত্তা আরিস্টটল বলতে চেয়েছেন, রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনির দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্র্যাজেডি।

কমেডি বিষয়ে আরিস্টটলের বক্তব্য এ রকম : মানবচরিত্রের যে কৌতুকপ্রদ দিক কাউকে পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তা-ই কমেডির উপজীব্য। এই কৌতুকের জন্ম ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তিযোগের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের বা কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতির মধ্যে। কমেডি আমাদের মানবসুলভ ত্রুটিবিচ্যুতি ও নির্বুদ্ধিতার পরিণাম প্রদর্শন করে অশোভন দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে।

শ্রেণিবিন্যাসের বিবেচনায় নাটককে বহু শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন–ধ্রুপদী (বা ক্ল্যাসিক্যাল) নাটক, রোম্যান্টিক নাটক। অথবা ধরা যাক- কাব্যধর্মী নাটক, সামাজিক নাটক, চক্রান্তমূলক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন। এসব ব্যতিরেকেও হতে পারে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চরিতনাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ, সাঙ্কেতিক নাটক, সমস্যাপ্রধান নাটক, একাঙ্কিকা ইত্যাদি। ট্র্যাজেডি ও কমেডি-মোটা দাগে এই দুইটি বিভাজন তো রয়েছেই।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেলের লেখনীতেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসন বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়। তারপর দীনবন্ধু আবির্ভূত হন সামাজিক নাটক নিয়ে। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটক এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) একইসঙ্গে নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। তিনি পৌরাণিক নাটক ('জনা', 'বুদ্ধদেব'), ঐতিহাসিক নাটক ('কালাপাহাড়'), সামাজিক নাটক ('প্রফুল্ল') ইত্যাদি রচনা করেছেন।

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'শাজাহান' বাঙালি দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়। তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উল্লেখযোগ্য। আর তার পরেই আবির্ভাব কবি রবীন্দ্রনাথের, যিনি বাংলা নাটকেরও মোড় ঘুরিয়ে দেন নানা দিকে : রক্তকরবী, ডাকঘর, অরূপরতন প্রতীকধর্মী নাটক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হয়ে রয়েছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)– জন্ম ঢাকায় ১৮৭১ এর ২০ অক্টোবর এবং মৃত্যু লখ্নৌ শহরে ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যারিস্টারি পাস করে স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। সংগীত রচনার জন্য বাঙালির সংস্কৃতিজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গান অদ্যাবধি জনপ্রিয়। **অনুগামী–** অনুসরণকারী; সহচর; সহযাত্রী। **অভিব্যক্তি–** প্রকাশ; বিকাশ। ***অরূপরতন–*** রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক; ***এইচ.জি.ওয়েল্স্– (১৮৬৬-১৯৪৬***)– ইংরেজ ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক; বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির স্রষ্টা। ***একাঙ্কিকা–*** এক অঙ্কের নাটক। ***এড্গার্ অ্যালান পো*** (১৮০৯-৪৯)– আমেরিকার কবি; গল্পকার ও সমালোচক। ***এরিস্টোট্ল্ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ***)– গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যতাত্ত্বিক; দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। ***কপালকুণ্ডলা–*** ঊনবিংশ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস; উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে নায়িকার নামে। ***কালাপাহাড়–*** একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। হিন্দুধর্মবিদ্বেষী এক সেনাপতি; তিনি দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। ***গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)–*** বাংলা নাটকের যুগন্ধর পুরুষ। নাট্যরচনার পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন। **গীতিকবিতা–** আত্মনিষ্ঠ কবিতা। ***চন্দ্রগুপ্ত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নৃপতি; রাজত্বকাল ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দ; কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-

১৯১৩) বিখ্যাত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। ***চন্দ্রশেখর–*** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস। **ছন্দোবদ্ধ–** ছন্দে রচিত। ***জনা–*** পৌরাণিক নাটক। ***ডাকঘর–*** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক। ***তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)–*** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। ***দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)–*** কবি, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতা; তাঁর 'শাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। **পদ্য–** ছন্দবদ্ধ রচনা; ছন্দযুক্ত বাক্য বা শ্লোক। **পরিস্ফুটন–** স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; সুস্পষ্ট। **প্রশমিত–** নিবারিত; শান্ত; দমিত। **বনবাস–** অরণ্যে নির্বাসন। **ভাবোচ্ছ্বাস–** ভাব বা আবেগের প্রাবল্য। **মহাকাব্য–** পুরাণ বা ইতিহাস থেকে বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত দেবতা, রাজা বা বীরকে নায়ক করে বিশেষ নিয়মে ও রীতিতে রচিত কাব্য, যে কাব্যে জীবন ও জগৎ ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়। ***মেঘনাদ-বধ–*** কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। ***মহাভারত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। **রথ–** প্রাচীন অশ্বাদি বাহিত যান; প্রাচীন যুদ্ধ শকট বা যান। ***রামায়ণ–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। ***লঙ্কা দ্বীপ–*** সিংহল দ্বীপ; বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। **হরণ–** চুরি; বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া।

সারসংক্ষেপ :

সাহিত্যের রূপ বলতে বোঝায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা। আর রীতি হল বিভিন্ন শাখার রচনাশৈলী। কবিতা সাহিত্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এর প্রধান ভাগ দুটি: মহাকাব্য আর গীতিকবিতা। মহাকাব্যে সাধারণত একটি দীর্ঘ কাহিনি আর অসংখ্য খণ্ডকাহিনি ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করা হয়। গীতিকবিতায় থাকে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ। নাটক অতি প্রাচীন সাহিত্যরূপ। ট্র্যাজেডি, কমেডি আর প্রহসন এর তিন প্রধান ভাগ। মঞ্চে দর্শকদের জন্য উপস্থাপনই নাটকের মূল লক্ষ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি?
   ক. সৃজনশীলতা খ. গতানুগতিকতা গ. হাস্যরস ঘ. করুণ রস

২. মানব চরিত্রের যে দিকটি হাস্যরসের সৃষ্টি করে তা যার উপজীব্য–
   ক.গ্রুপ থিয়েটার খ.কমেডি গ. প্রহসন ঘ. ক্যাম্পু থিয়েটার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গীতিকবিতায় কবি হৃদয়ের বিশেষ অনুভূতি অনবদ্যরূপে ফুটে ওঠে। কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি এর উপজীব্য, সঙ্গীতের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ।

৩. উদ্দীপকটি আপনার পঠিত কোন রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?
   ক. বাঙলা শব্দ খ. সাহিত্যের রূপ ও রীতি
   গ. বাঁধ ঘ. পালামৌ

৪. উদ্দীপক ও 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধ অনুযায়ী গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য–
   i. কবির হৃদয়ের অনুভূতি ii. সমাজ চিত্র iii. কাহিনির রূপায়ণ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ–২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছোটগল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধের রূপ-রীতির পরিচয় লিখতে পারবেন;
- ছোটগল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধের বিভিন্ন ভাগের বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছোটগল্প :

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যা বলেছিলেন সে-কথাটি ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। তিনি লিখেছিলেন :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

'শেষ হয়ে হইল না শেষ'– কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথার ভিতরেই বলে দেওয়া হলো যে, ছোটগল্প কখনোই কাহিনির ভিতরে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেয় না– যেমনটা ঘটে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে 'ছোটগল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বেশি নয়। তার পূর্বে শুধু 'গল্প' বলা হতো। বড়ো আকারের গল্প হলে 'উপন্যাসিকা' কথা চল ছিল, অর্থাৎ ছোট উপন্যাস। সাহিত্যের যত শাখা আছে, যেমন কাব্য মহাকাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদি, সে-সবের মধ্যে ছোটগল্পই হচ্ছে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। ছোটগল্পেও থাকে উপন্যাসের মতোই কোনো-না-কোনো কাহিনির বর্ণনা, তবে তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নয়, কাহিনির ভিতরে থেকেই বেছে নেওয়া কোনো অংশ থাকে মাত্র।

ইংরেজি সাহিত্যের উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলায় যেমন উপন্যাস লিখিত হয়েছে, ছোটগল্পেরও অনুপ্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই। 'ছোটগল্প' বলতে কোন ধরনের কাহিনি বোঝাবে সে বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ছোটগল্পকার এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) মনে করতেন আধ ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই 'ছোটগল্প'। ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্স্ বলতেন যে ছোটগল্পের আয়তন এমন হওয়া সঙ্গত যেন ১০ থেকে ৫০ মিনিটের ভিতরে পড়া শেষ হয়। ইংরেজি ভাষায় পো-কে ছোটগল্পের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি লিখেছেন : In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. ... undue brevity is just as exceptional here as in the poem, but undue length is yet more to be avoided.

বলাই বাহুল্য, উপন্যাসে যেমন বিস্তারিতভাবে কাহিনি বর্ণনা থাকে, ছোটগল্পের পরিধি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন সেখানে সম্ভব নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সাহিত্য গবেষক শ্রীশচন্দ্র দাশ যথার্থই বলেছেন : 'আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোট হইবে বলিয়া ইহাতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকিতে পারে না, জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই ইহার সার্থকতা। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কেমন ভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা তাহারই রূপায়ণ। আকারে ছোট বলিয়া এখানে বহু ঘটনা-সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড় সম্ভবপর নহে। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহার নাটকীয় হওয়া চাই। সত্য কথা বলিতে কি, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোথায় সমাপ্তির রেখা টানিতে হইবে, এই শিল্পদৃষ্টি যাহার নাই তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্ছনা বই কিছুই নহে।' বাংলা ভাষায় সার্থক ছোটগল্পকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছোটগল্প বহুপ্রকার হতে পারে। সাধারণত শ্রেণিবিভাগ হিসেবে এগুলোকে উল্লেখ করা যায় : ১. প্রেমবিষয়ক, ২. সামাজিক, ৩. প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে, ৪. অতিপ্রাকৃত কাহিনি, ৫. হাস্যরসাত্মক, ৬. উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী, ৭. সাঙ্কেতিক বা প্রতীকধর্মী, ৮. ঐতিহাসিক, ৯. বিজ্ঞানভিত্তিক, ১০. গার্হস্থ্য বিষয়ক, ১১. মনস্তাত্ত্বিক, ১২. মনুষ্যেতর প্রাণিজগৎ, ১৩. বাস্তবনিষ্ঠ, ১৪. গোয়েন্দাকাহিনি বা ডিটেকটিভ গল্প, ১৫. বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প। আমাদের জন্য

গর্বের বিষয় এটাই যে, বাংলা ভাষায় উপরোক্ত সব ক'টি শ্রেণির গল্পই বাঙালি গল্পলেখকবৃন্দ লিখে গেছেন ও এখনো লিখছেন।

উপন্যাস

সাহিত্যের শাখা প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। শুধু তাই নয়, পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে এবং কাহিনিটি গদ্যে লিখিত হয়। কিন্তু পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন কাহিনি পদ্যে লেখা হতো; তখন অবশ্য তাকে উপন্যাস বলা হতো না। যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সব ধরনের মঙ্গলকাব্যই ছন্দে রচিত এবং তাতে গল্প বা কাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে, তবু তাকে উপন্যাস না বলে কাব্যই বলা হতো– যেহেতু কবিতার ন্যায় তা ছন্দে রচিত হয়েছে। উপন্যাস রচিত হয় গদ্যভাষায়, এই তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দোবদ্ধ রচনার অনেক পরে যেহেতু গদ্যের আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গদ্যে কাহিনি লেখা হয়েছে, যেমন- গল্প বা ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যকাহিনি ইত্যাদি। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট (Plot)। ঐ প্লট বা আখ্যানভাগ তৈরি হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভিতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ও কালজয়ী (এবং অনেকের মতে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিম উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি কালজয়ী কথাসাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝি। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে যেখানে যত বাঙালি রয়েছে তাদের ভিতরে শরৎচন্দ্রই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পঠিত ও জনপ্রিয়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে অবশ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সমরেশ বসু, শহীদুল্লা কায়সার, আবু ইসহাক, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ বিভিন্ন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উপন্যাস বহু রকমের হতে পারে। যেমন– ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, মনোবিশে ষণধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁরই মতো বহু ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছিলেন– যেমন মাধবী-কঙ্কণ, রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত ইত্যাদি।

তবে তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বাঙালি পাঠকসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে জয় করে নেন, তার সমকক্ষ আর কাউকে দেখা যায় না।

প্রবন্ধ

আমরা সকলেই অস্পষ্টভাবে বুঝি 'প্রবন্ধ' কাকে বলে বা কী রকম। গদ্যে লিখিত এমন রচনা যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। কোনো সন্দেহ নেই, এ জাতীয় লেখায় তথ্যের প্রাধান্য থাকবে যার ফলে অজ্ঞাত তথ্যাদি পাঠক জানতে পারবে। ধরা যাক, সংবাদপত্রের যাবতীয় খবরাখবর-দেশের, বিদেশের, মহাকাশের ইত্যাদি। সবই গদ্য ভাষায় রচিত এবং যার লক্ষ্য পাঠকের অজানা বিষয় পাঠককে জানানো। গদ্যসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও তথ্যবহুল রচনা হলেই তাকে প্রবন্ধসাহিত্যের উদাহরণরূপে গণ্য করা চলবে না, যদি-না লেখাটি সাহিত্য পদবাচ্য হয়। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা। লেখকের সৃজনীশক্তির কোনো পরিচয় যদি পরিস্ফূটিত না হয়, তো তেমন কোনো লেখাকে প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে না। এ-কারণে খবরের কাগজে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই গদ্যে রচিত হলেও তাদেরকে প্রবন্ধসাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। তাহলে তো জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল রচনাই প্রবন্ধসাহিত্য বলে গণ্য হতে পারত। তা না হওয়ার কারণ ঐ সৃজনশীলতার অভাব।

মনে রাখা প্রয়োজন : সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য– সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধের সেই একই উদ্দেশ্য। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই 'প্রবন্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য নানা রকম হতে পারে ঠিকই, তবে তা গদ্যে ও নাতিদীর্ঘ আকারে লিখিত হয়।

প্রবন্ধের দুটি মুখ্য শ্রেণিবিভাগ আছে : তন্ময় (objective) প্রবন্ধ ও মন্ময় (subjective) প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে-সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় সেগুলোকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তাপ্রধান সৃষ্টি। এ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

আরেক শ্রেণির রচনাও সম্ভব যেখানে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। এদেরকে মন্ময় প্রবন্ধ বলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্যায়ের। ফরাশি ভাষায় বেল্ লেৎর্ (belle letre) বলে একটি শব্দ আছে, ইংরেজিতেও বেল্ লেৎর্ই বলে। এর বাংলা নেই। বাংলায় বলা যেতে পারে চারুকথন। বেল্ শব্দের অর্থ-সুন্দর, চমৎকার। আর লেৎর্ অর্থ– letter, অক্ষর। বেল্ লেৎর্ মন্ময় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির সকল রচনাই এ জাতীয় মন্ময় প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। অনেকে এ ধরনের লেখাকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলারও পক্ষপাতী। 'রম্য রচনা' নামে একটা কথা অনেক দিন যাবত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বোঝাতে 'রম্য রচনা' ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ 'রম্য রচনা' শব্দদ্বয়ের 'রম্য' শব্দের ভিতরে এমন ইঙ্গিত রয়ে যায় যে, লেখাটি সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে নয়, অথচ রম্যরচনার বিষয় খুবই গুরুগম্ভীর হতে পারে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা গুরুগম্ভীর হলে চলবে না।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য আয়তনে বিশাল এবং গুণগত মানে অতি উত্তম। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তার প্রবহমাণতা কখনো ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আবু ইসহাক– (১৯২৬-২০০৩) বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। **উপজীব্য–** জীবিকার বা প্রয়োজনের জন্য গ্রহণযোগ্য। ***দৃশ্যকাব্য–*** প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হত। ***দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)–*** বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা লেখক; 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) তাঁর সর্বাধিক খ্যাত নাটক, 'সধবার একাদশী' তাঁর বিখ্যাত প্রহসন। ***নকশীকাঁথার মাঠ–*** পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত আখ্যান কাব্য। ***নীলদর্পণ–*** দীনবন্ধু মিত্রের নাটক; দেশের তৎকালীন শাসনকর্তা ব্রিটিশদের হুকুমে বাধ্যতামূলক নীলচাষ করানোর সমালোচনা করে এই নাটক রচিত হয়েছিল। **প্রামাণ্য–** বিশ্বাসযোগ্য; দলিলসিদ্ধ। ***প্রফুল্ল–*** নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা নাটক। ***প্রহসন–*** উপন্যাস বা নাটকের রচনাশৈলী অবলম্বনে হাস্যরসাত্মক রচনা। ***প্লট–*** গল্প, উপন্যাস বা নাটকের কাহিনিসজ্জাকে প্লট বলা হয়। ***পৌরাণিক নাটক–*** পুরাণের কোনো কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। ***বনফুল–*** গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বা লেখক নাম। ***বন্দে মাতরম–*** এই দু শব্দের অর্থ জননীকে অর্থাৎ মাকে বন্দনা করি; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে স্বরচিত এই গানটি যুক্ত করেছেন। ***বিচিত্র প্রবন্ধ–*** রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। ***বিষবৃক্ষ–*** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। ***বৈষ্ণব কবিতা–*** মধ্যযুগের বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিকবিতা ও গান। ***মঙ্গলকাব্য–*** বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত এক ধরনের কাহিনি-কাব্য। ***মহাভারত–*** প্রাচীন ভারতবর্ষে দুটি মহাকাব্যের একটি, অন্যটি রামায়ণ, মূল রচনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, কয়েকশত বৎসর পরে বাংলায় অনূদিত হয়। ***মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত–*** উনিশ শতকের ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***মাধবী কঙ্কণ–*** রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত উপন্যাস। ***মেঘনাদবধ কাব্য–*** কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। ***রক্তকরবী–*** রবীন্দ্রনাথ রচিত সাংকেতিক নাটক। ***রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)–*** সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ***রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)–*** কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বাঙালি কমিশনার এবং খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***রাজপুত জীবনসন্ধ্যা–*** রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। ***রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩৪)–*** পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের শিল্পী। 'বেদন্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ***রামপ্রসাদ সেন (আনু: ১৭২৩-৮১)–*** কবি ও সংগীত রচয়িতা; ভক্তিগীতি রচনার জন্য বিখ্যাত; এঁর গানকে 'রামপ্রসাদী' আখ্যা দেওয়া হয়। ***শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১)–*** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহিদ হন। ***শাজাহান–*** নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত

নাটক। ***শ্রাব্যকাব্য–*** যে কাব্য পড়া ও শোনার জন্য রচিত, এর বিপরীতে রয়েছে দৃশ্যকাব্য। ***শ্রীশচন্দ্র দাস–*** 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থের রচয়িতা; বইটি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (যেমন গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থ। ***শূর্পণখা–*** রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনিতে লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। ***শেক্সপীয়র–*** ইংরেজি কবি ও নাট্যকার। ***সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ–*** প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পুরনো আমলে যাঁরা আলোচনা করেছেন বা বইপত্র লিখেছেন। ***সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)–*** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। ***সীতা–*** পৌরাণিক চরিত্র; রামচন্দ্রের স্ত্রী; লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণের বিরুদ্ধে রাম যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'সীতা' ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। ***সোজনবাদিয়ার ঘাট–*** পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত কাহিনীকাব্য। ***হাসান আজিজুল হক–*** জন্ম ১৯৩৯ সালে, বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাশিল্পী।

সারসংক্ষেপ :

ছোটগল্প সাহিত্যের নবীনতম শাখা। ছোটগল্পে সাধারণভাবে একটি বাহুল্যবর্জিত ছোট কাহিনি উপস্থাপিত হয়। ভাবের দিক থেকেও তা একমুখী। অন্যদিকে উপন্যাসে থাকে লম্বা কাহিনি। কাহিনিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাস জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করতে চায়। ছোটগল্প ধরতে চায় একটি মুহূর্তকে; আর উপন্যাসের লক্ষ্য বিস্তৃত জীবন। প্রবন্ধ অন্য চারটি সাহিত্যরূপ থেকে আলাদা। এতে কল্পনার প্রাধান্যও থাকে না, কাহিনিও থাকে না। তথ্য ও বিশ্লেষণে সাজিয়ে প্রবন্ধে লেখক নিজের চিন্তা, মনোভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করতে চান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধ–
   ক. রম্যরচনা খ. মন্ময় প্রবন্ধ
   গ. তন্ময় প্রবন্ধ ঘ. অভিসন্দর্ভ

৬. উপন্যাস জনপ্রিয়তার শীর্ষে কেন?
   ক. গদ্যে রচিত খ. পদ্যে রচিত গ. সুখপাঠ্য ঘ. মনোগ্রাহী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছোটগল্পের শুরুটা হয় নাটকীয়। আবার এর শেষটাতে রয়ে যায় অতৃপ্তি।

৭. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে?
   ক. কবিতা খ. উপন্যাস গ. মহাকাব্য ঘ. ছোটগল্প

৮. উদ্দীপক এবং 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে মিল রয়েছে ছোটগল্পের যে বিষয়টিতে–
   i. গঠনরীতিতে ii. শিল্পরীতিতে iii. সমাজ চিত্রে
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই' গ্রন্থটির লেখক কে?
   ক. হায়াৎ মামুদ খ. কবির মামুদ গ. কবীর চৌধুরী ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১০. বিষয়বস্তু ও ভাবগত দিক দিয়ে গীতিকবিতা–
   i. কবির লিপিকুশলতা ii. কবির অভিব্যক্তি iii. কবির মানবতাবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i গ. ii ঘ. iii

১১. 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।' –মন্তব্যটি করা হয়েছে সাহিত্যের যে রূপ সম্পর্কে–

ক. প্রবন্ধ খ. গীতি কবিতা গ. ছোটগল্প ঘ. মহাকাব্য

১২. 'জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই উহার সার্থকতা।' –উদ্দীপক এবং 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধ অনুসারে উক্তিটি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–

ক. মহাকাব্য খ. ছোটগল্প গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সমালোচকের মতে ছোটগল্পে মানব জীবনের ছোট ছোট দুঃখ কথা থাকে। এতে বর্ণনার ছটা নেই, থাকে না ঘটনার ঘনঘটা। জীবনের গূঢ় তত্ত্ব কিংবা উপদেশেরও কোন বালাই নেই ছোটগল্পে। ছোটগল্প পাঠ শেষে অন্তরে অতৃপ্তি রয়ে যাবে এবং মনে হবে যেন শেষ হয়েও শেষ হল না।

ক. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা কে?

খ. 'প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা।' –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের সমগ্র ভাবকে নয় একটি মাত্র অংশকে তুলে ধরেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

ট্র্যাজেডি রসের দিক হতে বিশেষ ধরনের নাটক। এ জাতীয় নাটকে নায়কের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে অনর্থ এসে পড়ে। কখনো দৈব বা অদৃষ্ট-পীড়িত হয়ে তাকে কালগ্রাসে পতিত হতে হয়। নাট্যকার বিশেষ গুরুগম্ভীর বাণীভঙ্গিতে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনাকে রূপ দান করেন। নায়ক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে, একদিকে তাঁর আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, অপর দিকে বাইরের ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্যের নাম কী?

খ. 'নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য'– বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটিতে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?

ঘ. 'উদ্দীপকে সব ধরণের নাটক নয়, কেবল একটি বিশেষ শ্রেণির নাটকের বর্ণনা রয়েছে।' –'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খ. উক্তিটির মাধ্যমে লেখক পাঠকের কাছে প্রবন্ধের গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠার বিষয়কে নির্দেশ করেছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে যেসব তত্ত্বকেন্দ্রিক, বস্তুগত ও চিন্তামূলক গদ্য নিবন্ধ রচিত হয় সেগুলোকে প্রবন্ধ সাহিত্য বলে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। প্রবন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, জ্ঞান ও ব্যক্তি হৃদয়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। অজানা তথ্য সম্পর্কে পাঠক মনে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মূলত তা পূরণ করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের অন্যতম রূপ ছোটগল্পকে নির্দেশ করে।

মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের নবীন অতিথি তথা আধুনিককালের সৃষ্টি। তবে দেশীয় গল্পকারদের হাতে এটি অল্প সময়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শাখায় পরিণত হয়েছে।

উদ্দীপকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি হবে ব্যঞ্জনাময়, অর্থাৎ পাঠকের হৃদয়ে একটা অতৃপ্তির বেদনাবোধ জন্ম নেয়। পাঠক চিন্তায় পড়ে যান, এর পরে যেন কী হয়? এই যে একটি আক্ষেপ তাই ছোটগল্পের প্রাণ। উদ্দীপকে বলা হয়েছে গূঢ় তত্ত্ব কিংবা উপদেশেরও কোন বালাই নেই ছোটগল্পে; শেষ হয়েও শেষ হয় না। গল্পের পাঠক প্রশ্নের উত্তর না

পাওয়ার আগেই পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এটিকে 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে সাহিত্যের সকল শাখার প্রতিনিধিত্ব করে না।
সাহিত্য মানব জীবনের চিত্র। এই চিত্র রূপায়ণে এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন– কবিতা, ছোটগল্প, মহাকাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। শুধু ছোটগল্প বা মহাকাব্য নয় সাহিত্যের রয়েছে নানা স্তর। এগুলোও আবার নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। সাহিত্য যেন বটবৃক্ষের মত ছায়া বিস্তার করে পাঠকের মনোরঞ্জন করে।
'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয় বলে তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে ছোটগল্প ছাড়াও কবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির রূপ-রীতির সুস্পষ্ট বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। সাহিত্যের কোনো শাখা অন্য শাখার সাথে মিলে না। প্রত্যেক শাখার রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে বলা হয়েছে মানব জীবনে ছোট ছোট দুঃখ-কথা থাকে; বর্ণনার ছটা নেই; অন্তরে অতৃপ্তি রয়ে যাবে; শেষ হয়েও শেষ হবে না– এগুলো ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপকে শুধু ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।
বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার নাম, সংজ্ঞার্থ, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, বিশেষ বিশেষ সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্যের ফর্ম লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। এতে শুধু গল্পের আলোচনা প্রাধান্য পায়নি, সাহিত্যের অন্যান্য রূপও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকটি কেবল ছোটগল্পকেই নির্দেশ করেছে। তাই বলা যায় মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

ক. বেল্ লেৎর্ (belle letre) কী?
খ. 'ঔপন্যাসিকা' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকটি 'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে গীতিকবিতার যে বিষয়টি প্রকাশিত করে তা আলোচনা করুন।
ঘ. "'সাহিত্যের রূপ ও রীতি' প্রবন্ধে আলোচিত গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. খ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

বাঙলা শব্দ

হুমায়ুন আজাদ

লেখক পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রাশেদ ও মা জোবেদা খাতুন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও প্রথাবিরোধী লেখক হিসেবে তিনি পরিচিত। রাড়িখালের স্যার জে সি বোস ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৬৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ুন আজাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক মননশীল লেখক। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা তাঁর সাহিত্যকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। গতানুগতিক চিন্তাধারা তিনি সচেতনভাবে পরিহার করতেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০টিরও বেশি। তিনি বাংলা একডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট জার্মানির মিউনিখে মৃত্যুবরণ করেন। **তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :**

কাব্যগ্রন্থ : *অলৌকিক ইস্টিমার, সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু;*

উপন্যাস : *ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল, সব কিছু ভেঙে পড়ে, একটি খুনের স্বপ্ন;*

গল্পগ্রন্থ : *যাদুকরের মৃত্যু;*

প্রবন্ধ-গবেষণা : *নারী, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র, বাক্যতত্ত্ব, লাল নীল দীপাবলি, কতো নদী সরোবর;*

ভূমিকা

'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। লেখক এখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ এবং অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন প্রক্রিয়া এ প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি–

- বিভিন্ন প্রকার বাংলা শব্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয় লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাঙলা ভাষার এক রকম শব্দকে বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ'। আরেক রকম শব্দকে বলা 'তৎসম শব্দ'। এবং আরেক রকম শব্দকে বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। এ-তিন রকম শব্দ মিলে গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার শরীর। 'তৎসম', 'তদ্ভব' পারিভাষিক শব্দগুলো চালু করেছিলেন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা। তাঁরা 'তৎ' অর্থাৎ 'তা' বলতে বোঝাতেন

'সংস্কৃত' (এখন বলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য) ভাষাকে। আর 'ভব' শব্দের অর্থ 'জাত, উৎপন্ন'। তাই 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো 'সংস্কৃত থেকে জন্ম নেয়া', আর 'তৎসম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সংস্কৃতের সমান' অর্থাৎ সংস্কৃত। বাঙলা ভাষার শব্দের শতকরা বায়ান্নটি শব্দ 'তৎভব' ও অর্ধতৎসম'। শতকরা চুয়াল্লিশটি 'তৎসম'। তাই বাঙলা ভাষার শতকরা ছিয়ানব্বইটিই মৌলিক বা বাঙলা শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের স্রোতে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাঙলা শব্দে। এগুলোই তদ্ভব শব্দ। এ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাঙলা ভাষা। তবে তদ্ভব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসে নি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই এসেছে বেশি সংখ্যক শব্দ।

'চাঁদ', 'মাছ', 'এয়ো', 'দুধ' 'বাঁশি'। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নিয়ম মেনে প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে এসেছে বাঙলায়। 'চাঁদ' ছিলো সংস্কৃতে 'চন্দ্র', প্রাকৃতে ছিলো 'চন্দ'। বাঙলায় 'চাঁদ। 'মাছ' ছিলো 'মৎস' সংস্কৃতে, প্রাকৃতে হয় 'মচ্ছ'। বাঙলায় 'মাছ'। 'এয়ো' ছিলো সংস্কৃতে 'অবিধবা'। প্রাকৃতে হয় 'অবিহবা'। বাঙলায় 'এয়ো'। 'দুধ' ছিলো সংস্কৃতে 'দুগ্ধ"; প্রাকৃতে হয় 'দুদ্ধ'। বাঙলায় হয় 'দুধ'। 'বাঁশি ছিলো 'বংশী' সংস্কৃতে। প্রাকৃতে হয় 'বংসী'। বাঙলায় 'বাঁশি'। বেশ নিয়ম মেনে, অনেক শতক পথ হেঁটে এসেছে এ-তীর্থযাত্রীরা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা।

আরো আছে কিছু তীর্থযাত্রী, যারা পথ হেঁটেছে আরো বেশি। তারা অন্য ভাষার। তারা প্রথমে ঢুকেছে সংস্কৃতে, তারপর প্রাকৃতে। তারপর এসেছে বাঙলায়। এরাও তদ্ভব শব্দ। মিশে আছে বাঙলা ভাষায়।

'খাল' আর 'ঘড়া'। খুব নিকট শব্দ আমাদের। 'খাল' শব্দটি তামিল ভাষার 'কাল' থেকে এসেছে। 'কাল' সংস্কৃতে হয় 'খল্ল'। প্রাকৃতে হয় 'খল্ল'। বাঙলায় 'খাল'। তামিল-মলয়ালি ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'কুটম'। সংস্কৃতে সেটি হয় ঘট। প্রাকৃতে হয় 'ঘড়'। বাঙলায় 'ঘড়া'।

'দাম' আর 'সুড়ঙ্গ'। প্রতিদিনের শব্দ আমাদের। 'দাম' শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার 'দ্রাখ্‌মে' (একরকম মুদ্রা, টাকা) থেকে। 'দ্রাখ্‌মে' সংস্কৃতে হয় 'দ্রম্য'। প্রাকৃতে 'দম্ম'। বাঙলায় 'দাম'। গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'সুরিংক্‌স্‌'। শব্দটি সংস্কৃতে ঢুকে হয়ে যায় 'সরঙ্গ'/সুরুঙ্গ'। প্রাকৃতেও এভাবেই থাকে। বাঙলায় হয়ে যায় 'সুড়ঙ্গ'।

'ঠাকুর'। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ কবির নামের অংশ। শব্দটি ছিলো তুর্কি ভাষায় 'তিগির'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে হয়ে যায় 'ঠক্কুর'। বাঙলায় 'ঠাকুর'।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষয় অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাঙলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। বাঙলা ভাষায় এমন শব্দ অনেক। তবে এ-শব্দগুলো যে একেবারে বদলায় নি, তাও নয়। এদের অনেকে পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু আমরা সে-পরিবর্তিত রূপগুলোকে বাদ দিয়ে আবার খুঁজে এনেছি খাঁটি সংস্কৃত রূপ।

জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, দর্শন, দৃষ্টি, বংশী, চন্দ্র এমন শব্দ। এদের মধ্যে 'বংশী' ও 'চন্দ্র'র তদ্ভব রূপও আছে বাঙলায়। 'বাঁশি' আর 'চাঁদ'। পুরোনো বাঙলায় 'সসহর' ছিলো, 'রএণি' ছিলো। এখন নেই। এখন আছে সংস্কৃত শব্দ 'শশধর' আর 'রজনী'। বাঙলা ভাষার জন্মের কালেই প্রবলভাবে বাঙলায় ঢুকতে থাকে তৎসম শব্দ। দিন দিন তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে তৎসম শব্দ বাঙলা ভাষাকে পরিণত করে তার রাজ্যে।

কিছু শব্দ বেশ রুগ্নভাবে এসেছে বাঙলায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতের কিছু শব্দ কিছুটা রূপ বদলে ঢুকেছিলো প্রাকৃতে। তারপর আর তাদের বদল ঘটে নি। প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে সেগুলো এসেছে বাঙলায়। এগুলোকেই বলা হয় অর্ধতৎসম। 'কৃষ্ণ' ও 'রাত্রি' বিকল হয়ে জন্মেছে 'কেষ্ট' ও 'রাত্তির'। শব্দগুলো বিকলাঙ্গ। মার্জিত পরিবেশে সাধারণত অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূল নির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয় যে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের আগে যে সব ভাষা ছিলো আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকে এসেছে ওই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় 'দেশি' শব্দ। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতোই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকেও গ্রহণ করা উচিত বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী ক'রে বিদেশি বলি?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিকশিতভাবে– বিকশিত নয় এমন। **অটল–** স্থির। ***অর্ধতৎসম শব্দ–*** অর্ধেক তার সমান; তৎসম শব্দের আংশিক পরিবর্তিত রূপ। ***আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা–*** বাংলাভাষায় আগত শব্দসমূহ আমাদের বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ কারণে আগত শব্দসমূহকে লেখক সবচেয়ে প্রিয় বলে বিশেষায়িত করেছেন। ***এ-তীর্থযাত্রীরা–*** এখানে বাংলা ভাষায় আগত শব্দভান্ডারকে বোঝানো হয়েছে। ***তদ্ভব শব্দ–*** তা থেকে উৎপন্ন; প্রাকৃত বাংলা শব্দ; এই শব্দগুলো প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ক্রম পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে। ***তৎসম শব্দ–*** তৎসদৃশ; তদ্রূপ; সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ। **তীর্থযাত্রী–** পবিত্র স্থানে গমনকারী। ***প্রাকৃত–*** প্রকৃতিজাত; স্বাভাবিক; প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার রূপান্তর বিশেষ। ***বিকলাঙ্গ–*** অঙ্গহীন; ত্রুটিযুক্ত। **ভাষাতাত্ত্বিক–** ভাষার উৎপত্তি বা বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান নিয়ে যিনি আলোচনা করেন। **মার্জিত–** ত্রুটিশূন্য; দোষমুক্ত। **সাবলীল–** সহজ।

সারসংক্ষেপ :

বাংলা শব্দের শতকরা প্রায় ছিয়ানব্বইটি শব্দ তৎসম, তদ্ভব আর অর্ধতৎসম। এগুলোই বাংলা ভাষার মূল শব্দভাণ্ডার। সংস্কৃত থেকে হুবহু বাংলায় গৃহীত হয়েছে অনেক শব্দ। এগুলোর নাম তৎসম। অল্প কিছু শব্দ খানিকটা বদলে বাংলায় এসেছে। এগুলোকে বলা হয় অর্ধতৎসম। অন্য বিপুল পরিমাণ শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দের রূপ পেয়েছে। এদের নাম তদ্ভব। বিদেশি ভাষার কিছু শব্দও আমরা নানা প্রয়োজনে গ্রহণ করেছি। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলো সম্ভবত পুরনো স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলো দেশি শব্দ নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার অপর নাম কী?

ক. অপভ্রংশ খ. সংস্কৃত
গ. প্রাকৃত ঘ. তামিল

২. বাংলা ভাষার শরীর কত রকম শব্দ দিয়ে গড়ে উঠেছে?

ক. তিন রকম খ. চার রকম গ. পাঁচ রকম ঘ. ছয় রকম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাংলাভাষায় এমন কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়। দেখা যায় ভাষার পরিবর্তনের সময় বিকৃতির মাধ্যমে এদের জন্ম। সাধারণত ভদ্র পরিবেশে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় না।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত বক্তব্যটি 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধে আলোচিত কোন ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. তৎসম শব্দ খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ গ. দেশি শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ

৪. উদ্দীপক ও 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায় উদ্দীপকে আলোচিত শব্দগুলো–

i. বিকৃতভাবে তৈরি হয়েছে ii. সবার নিকট বোধগম্য নয় iii. ব্যাকরণ সঠিক নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'দ্রাখমে' কোন ভাষার শব্দ?

ক. ল্যাটিন খ. গ্রিক গ. সুইডিশ ঘ. ফ্লেমিশ

৬. 'প্রাকৃত শব্দ' যে শব্দের পরিবর্তিত রূপ–

ক. তৎসম শব্দ খ. তদ্ভব শব্দ গ. গ্রিক শব্দ ঘ. দেশি শব্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যে সব শব্দ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে।

৭. উদ্দীপকের ভাব 'বাংলা শব্দ' রচনার যে শব্দগুচ্ছে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. চা, চিনি, চাকু খ. ডাব, ডিঙ্গি, ডাঙ্গা গ. জুডো, জেব্রা, জিরাফ ঘ. আয়া, আতা, আচার

৮. উদ্দীপক ও 'বাংলা শব্দ' রচনায় বাংলা শব্দকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে–

i. গঠন অনুসারে ii. অর্থ অনুসারে iii. উৎপত্তি অনুসারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ওপরের কোনটিই নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

যদিও আমরা এমন বলি না যে, ঘর প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে: কিন্তু আমরা এমন বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা: আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত।

ক. 'লাল নীল দীপাবলি' কী জাতীয় গ্রন্থ?

খ. 'কিছু শব্দ বেশ রুগ্‌ণভাবে এসেছে বাঙলায়।' –কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটির সাযুজ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. "বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ নিয়ে আলোচনা হলেও উদ্দীপক ও 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ভিন্নধর্মী।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. ড. হুমায়ুন আজাদ রচিত 'লাল নীল দীপাবলি' প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার কতগুলো শব্দ লোক মুখে কিছুটা বিকৃত হয়ে তার রূপের খানিকটা পরিবর্তন করে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে। 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে এই শব্দগুলো এভাবেই রুগ্‌ণভাবে বাংলায় এসেছে।

বাংলা ভাষার মূল উৎস ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা। ভারতে এই শাখার আদিম রূপ হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা 'সংস্কৃত ভাষা' সময়ের বিবর্তনে লোকমুখে বিকৃত বা অর্ধবিকৃত হয়ে নিয়মকানুনের ধাপ পেরিয়ে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। তবে কিছু কিছু প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ রয়েছে যেগুলো আসল রূপ থেকে কিছুটা বদল হয়ে মধ্য ভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তেমনি ত্রুটিযুক্ত প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত এ শব্দগুলো সম্পর্কে উক্তিটি করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধটির সাযুজ্য নেই, রয়েছে বৈসাদৃশ্য।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ এসেছে। সময়ের বিবর্তনে গড়ে উঠেছে এ ভাষার মহীরূহ। একসময় এ ভাষার মানুষ বাইরে থেকে আসা শব্দগুলো নিজের করে নেয়। বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা থেকে আসা শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো একবারে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

উদ্দীপকে লেখক বলতে চেয়েছেন, অকারণে কঠিন শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাংলা শব্দ; আর গৃহ, মস্তক, পত্র , তাম্র সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ছেড়ে বাংলা শব্দ ব্যবহার করলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। পক্ষান্তরে 'বাঙলা শব্দ' প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের আগমন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষার শরীর গঠন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা শব্দ' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু এক হলেও তাদের উদ্দেশ্য নানাদিক থেকে আলাদা।

বাংলা ভাষায় শব্দের একটি সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় কঠিন শব্দ বাদ দিয়ে সবার বোঝার সুবিধার্থে সহজ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কারণ তাতে ভাষার গতি ও প্রকৃতি দুটোই রক্ষা করা যায়।

উদ্দীপকে ভাষাকে মধুর করতে সহজ শব্দ ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, মাথার পরিবর্তে মস্তক, পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যদিকে ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধ দুটো রচনাতেই বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ‘বাঙলা শব্দ’ প্রবন্ধ ও উদ্দীপক উভয়ের বিষয়বস্তু এক হলেও রচনার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কারণ প্রবন্ধে তৎসম শব্দের ব্যবহার করে বাক্যকে গুরুগম্ভীর না করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আর উদ্দীপকে তৎসম শব্দের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

যে ভাষা বেশি শব্দ গ্রহণ করতে পারে সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। ব্যাকরণবিদদের তথ্য মতে বাংলা ভাষায় মোট শব্দের সংখ্যা সোয়া লক্ষের মতো। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ তৎসম, প্রায় আড়াই হাজার শব্দ আরবি-ফারসি, চারশত তুর্কি, আটশত ইংরেজি শব্দ এবং দেড়শত রয়েছে পর্তুগিজ ও ফরাসি শব্দ। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে। আর বাকি শব্দগুলো বাংলা ভাষায় তদ্ভব ও দেশি শব্দ নামে পরিচিত।

ক. ‘খাল’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
খ. ‘এ তীর্থ যাত্রীরা’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
গ. ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় উদ্দীপকের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. ‘বাংলা শব্দের ভাণ্ডার দেশি-বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে।’ –উদ্দীপক ও ‘বাংলা শব্দ’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. গ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র

কবিতা

কবিগণ

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কাজী নজরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

জসীমউদ্‌দীন

ফররুখ আহমদ

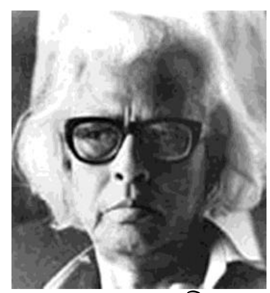
আহসান হাবীব

শামসুর রাহমান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: meherin2010@bou.ac.bd

আমার সন্তান

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

কবি পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ১৭১২ সালে হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরশুট পরগনার জমিদার ছিলেন, কিন্তু বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বাস্তুচ্যুত হয়ে সপরিবারে ভারতচন্দ্রের মামাবাড়িতে চলে আসেন। সেখানে থেকেই ভারতচন্দ্র মাত্র কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জীবনের বহু উত্থান-পতনের পর ভারতচন্দ্র নদীয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সভাকবি হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন এবং রায়গুণাকর খেতাব পান। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে নতুন এক বাগভঙ্গি এবং তাতে শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে তুলনা করেছেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সঙ্গে। তিনি ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সত্যপীরের পাঁচালী, রসমঞ্জরী, অন্নদামঙ্গল, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, চণ্ডীনাটক।

ভূমিকা

'আমার সন্তান' কবিতাটি আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত 'মানসিংহ-ভবানন্দ' উপাখ্যানে'র 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' কবিতার সম্পাদিত অংশ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অংশবিশেষ। বাঙালি মায়ের নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে সন্তানের কল্যাণ কামনার চিরন্তন মানসিকতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে মধ্যযুগের শেষ পর্বের ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা, সংস্কার, পৌরাণিক চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যাবে এই কবিতার মাধ্যমে। দেবীকর্তৃক ভক্তকুলের মনোবাঞ্ছনা পূরণের ধরন এবং রূপকের মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশীর্বাদের বিষয়টি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই কবিতায়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- পুরনো বাংলা কবিতার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেবী অন্নপূর্ণা আর ঈশ্বরী পাটুনীর কাহিনি বর্ণনা করতে পারবেন;
- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' –উক্তিটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥

… … …

পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে ॥

… … …

সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা ॥
সেঁউতী লইয়া বক্ষে চলিলা পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিয়া আপনি ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ॥

কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্নপূর্ণা– অন্নদাত্রী; দেবী দুর্গা। ***অষ্টাপদ–*** সোনা; স্বর্ণ। ***উত্তরিলা–*** উপস্থিত হলেন। **কন্দল–** ঝগড়া। **কহিছে–** বলেছে। **কাশী–** তীর্থস্থান; পুণ্যস্থান। **কুলবধূ–** গৃহবধূ। **খেয়া–** নৌকা। ***গজগমনে–*** হস্তীর ন্যায় ধীর ও গুরুগম্ভীর চলন। ***গাঙ্গিনীর–*** নদীর। **ছল–** ছলনা। **তথাস্তু–** ঠিক আছে। ***ত্বরায়–*** তাড়াতাড়ি; দ্রুত। ***থুয়েছিলা–*** রেখেছিলে। **দুধে ভাতে–** কোনো অভাবে না থাকা। **নিবাস–** বাসস্থান; আবাস। ***পাটুনী–*** খেয়াঘাটের মাঝি। ***ফেরফার–*** ছলাকলা; ঘোরপ্যাঁচ। ***বট–*** বল। ***বরদান–*** আশীর্বাদ। ***বামাস্বর–*** স্ত্রীকণ্ঠ; মেয়েদের কণ্ঠস্বর। **মাগ–** প্রার্থনা করা। **শুক্ল অষ্টমী-** তিথির নাম; শুক্ল পক্ষের অষ্টম রাত। ***সেঁউতী–*** নৌকার পানি সেচবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র। ***হের–*** দেখ। **হৈলা–** হলো।

সারসংক্ষেপ :

অন্নপূর্ণা অর্থাৎ দেবী দুর্গা গৃহবধূর বেশে খেয়া পার হতে এসেছেন। তাঁর পায়ের স্পর্শে নৌকার সেঁউতি সোনা হয়ে যায়। তখন খেয়া পারাপারকারী ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে, ইনি দেবী। পরে দেবী নিজেই নিজের পরিচয় দেন। পাটুনীকে বর চাইতে বলেন। পাটুনী নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য বর চায়। দেবী আশা পূরণ করে বলেন : তোমার সন্তান দুধে-ভাতে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সত্যপীরের পাঁচালী'র লেখক কে?
   ক. নবীনচন্দ্র রায় — খ. হেমচন্দ্র রায়
   গ. ভারতচন্দ্র রায় — ঘ. প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২. 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী' এখানে 'ঈশ্বরী' বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে–
   ক. ঈশ্বরী দেবী — খ. ঈশ্বরী রায়
   গ. ঈশ্বরী পাটুনী — ঘ. ঈশ্বরী সাহা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আলী অটোরিক্সা চালাতে গিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়া যাত্রীদের মুখোমুখী হয়। এভাবে সে একদিন একজন মহিলাকে রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পরিচয় জানতে চায়। মহিলা আলীকে নিজের সব পরিচয় জানালেও স্বামীর নামটি বলেনি।

৩. উদ্দীপকের মহিলার সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার কার মিল রয়েছে ?
   ক. অন্নপূর্ণা — খ. ঈশ্বরী পাটুনী
   গ. মানসিংহ — ঘ. ভবানন্দ

৪. উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতায় স্বামীর নাম মুখে নিতে না চাওয়া হয়নি যে কারণে–
   ক. স্বামী বেকার — খ. স্বামী সন্ত্রাসী
   গ. সংস্কার — ঘ. লোকলজ্জা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?
ক. কৃষ্ণচন্দ্র রায় খ. গৌরাঙ্গচন্দ্র রায় গ. মানিকচন্দ্র রায় ঘ. যশোধাচন্দ্র রায়

৬. 'আমার সন্তান' কবিতায় 'দুধেভাতে' থাকা হচ্ছে–
i. সবসময় দুধ-ভাত খাওয়া ii. ঐশ্বর্যশালী হতে চাওয়া iii. প্রশান্তিতে জীবনযাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i গ. ii ঘ. iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার মায়ের চোখ মমতায় পূর্ণ হয়ে আছে
বিশাল নীরব মেঘমুক্ত সাদা আকাশের মতো!

৭. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতায় যার সাদৃশ্য রয়েছে–
ক. অন্নপূর্ণা খ. হরিহোড় গ. পাটুনী ঘ. ভবানন্দ

৮. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার সাদৃশ্যের ক্ষেত্র হলো–
i. মানবতাবোধ ii. ঈশ্বরভক্তি iii. সন্তানবাৎসল্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর। হুমায়ুন ছিলেন তাঁর পরম আদরের সন্তান। একবার হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। অনেক সাধ্য-সাধনার পরও তার রোগের কোনো উপশম হচ্ছিল না। বরং দিনে দিনে অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। অগত্যা বাবর জনৈক দরবেশের পরামর্শে মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হন। প্রভুর নিকট তিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান। মহান প্রভু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। অতঃপর একসময় সম্রাট বাবর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আর হুমায়ুন অনারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করে জীবন ফিরে পান।

ক. বামাস্বর কী?
খ. 'এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়' –কথাটি কেন বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের বাবরের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ "উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতার মূলসুর একই।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. বামাস্বর শব্দের অর্থ হচ্ছে নারীকণ্ঠ অর্থাৎ মেয়েদের কণ্ঠস্বর।

খ. ঈশ্বরী পাটুনীর খেয়া নৌকায় নদী পার হতে আসা বধূটির পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনা হয়ে গেলে তার মনে হয় যে এ মেয়েটি সাধারণ ঘরের কেউ নয়, এ কোনো দেবতা হবে।
'আমার সন্তান' কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণা ঘরের বউয়ের ছদ্মবেশে নদী পার হতে আসে। খেয়া নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী তার পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু দেবী বাঙালি নারী স্বামীর নাম মুখে নেয় না বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে ঈশ্বরী পাটুনীর অনুরোধে দেবী নৌকার সেঁউতিতে পা রাখেন। তার রাঙা চরণের ছোঁয়ায় সেঁউতি তখন সোনা হয়ে যায়। দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে পাটুনী অনুমান করে যে, এ মেয়েটি সাধারণ কেউ নয়, নিশ্চয়ই কোনো দেবী হবেন।

গ. উদ্দীপকের বাদশাহ বাবরের সঙ্গে 'আমার সন্তান' কবিতার ঈশ্বরী পাটুনীর সাদৃশ্য রয়েছে।
মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় তার নিজের জীবন। সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে মানুষ নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে পারে। সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা সম্রাট বাবর ও নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীকে সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দুজনেরই ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে নিজেদের প্রিয়সন্তান। এদের মধ্যে একজন নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আর অন্যজন সন্তানের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উদ্দীপকে বাদশাহ বাবর যখন শুনলেন তাঁর কোনো প্রিয় বস্তুকে নিঃশঙ্ক চিত্তে উৎসর্গ করলে প্রিয় সন্তানের প্রাণ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তিনি সন্তানের জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে বাদশাহ বাবর বাৎসল্যপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে 'আমার সন্তান' কবিতায় দেখা যায় নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী দেবী অন্নপূর্ণার কাছে নিজের জন্য কোনো বর না চেয়ে সন্তানের জন্য সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় ঈশ্বরী পাটুনীর সন্তানের জন্য তীব্র ভালোবাসা প্রকাশের সঙ্গে বাদশাহ বাবরের সন্তান বাৎসল্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুই 'আমার সন্তান' কবিতার মূল আলেখ্য।

মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আবার পিতা-মাতার নিকট নিজের সন্তানের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান। সন্তানের সুখের জন্য মানুষ নিজের জীবনের আনন্দ-সুখ ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। 'আমার সন্তান' কবিতার মূলভাব হচ্ছে সন্তানের জন্য একজন দরদী জননীর অপরিমেয় ভালোবাসা। উদ্দীপকের মধ্যেও একজন ভারত সম্রাট অর্থাৎ একজন বাবাকেও সন্তানের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করতে দেখি।

কবি ভারতচন্দ্র রচিত 'আমার সন্তান' কবিতায় দেবী অন্নপূর্ণা গৃহবধূর ছদ্মবেশ ধারণ করে নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় ওঠেন। অন্নপূর্ণার পাদস্পর্শে নৌকার সেঁউতি সোনা হয়ে গেলে ঈশ্বরী পাটুনী বুঝতে পারে তার নৌকার যাত্রী কোনো সাধারণ মহিলা নন। অবশ্য দেবী শেষ পর্যন্ত পাটুনীর নিকট নিজের পরিচয় দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে দেবী পাটুনীকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। পাটুনী দেবীর নিকট খুব বেশি কিছু চায়নি। অবশ্য সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য অনেক ধনসম্পদ চাইতে পারত। কিন্তু সে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে সন্তানের জন্য 'দুধ-ভাত' অর্থাৎ সচ্ছল জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা চেয়েছে। মোটকথা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী। উদ্দীপকেও আমরা একই চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি। এখানে বাদশাহ বাবরের পুত্র হুমায়ুন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। কোনো চিকিৎসকের চিকিৎসাই তাকে ভালো করতে পারছে না। অবশেষে একজন দরবেশ বাদশাহ বাবরকে পরামর্শ দিলেন বাবর যেন তার সন্তানের জন্য কোনো প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করেন।

'আমার সন্তান' কবিতায় পিতা সন্তানের প্রশান্তিময় জীবন কামনা করেছেন। আর উদ্দীপকে বাবর মহান প্রভুর নিকট আরজ করেন যে তাঁর জীবনের বিনিময়ে পুত্র হুমায়ুনকে যেন ভালো করে দেয়া হয়। কেননা বাবর জানেন মানুষের নিকট তার নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু নেই। প্রভুর নিকট নিজের জীবনকে সমর্পণ করলেন বাদশাহ বাবর। অন্তরে আশা তাঁর একমাত্র সন্তান যেন ভালো থাকে। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক ও 'আমার সন্তান' কবিতার মূলসুর একই ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নামাযের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসুল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর।

ক. 'বরদান' কী?

খ. ভারতচন্দ্রের কাব্যের বৈশিষ্ট্য কেমন?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশে 'আমার সন্তান' কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'আমার সন্তান' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করেনি।" –যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. গ

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। শৈশবেই তিনি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। বাল্যকাল থেকেই মধুসূদন ইংরেজি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি বড় কবি হবেন এ-ই ছিল তাঁর বাল্যের স্বপ্ন। এ উদ্দেশ্যেই ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় 'মাইকেল'। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইউরোপ যান। তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যান ও বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা আরম্ভ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির আবিষ্কার ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা তাঁর অমর কীর্তি। মহাকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্র্যাজেডি নাটক ইত্যাদি সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ	:	*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী;*
নাটক	:	*পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী;*
প্রহসন	:	*একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ;*
গদ্য-কাব্য	:	*হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)।*

ভূমিকা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামক সনেট কাব্য থেকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবির শৈশবে দেখা কপোতাক্ষ নদের প্রতি ভালোবাসার অন্তরালে স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। সাময়িক মোহে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে প্রবাস জীবনে স্বদেশের প্রতি অনুরাগের স্বরূপ তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির আকূল আকুতি কপোতাক্ষ নদ যেন তাঁর স্বদেশের প্রতি হৃদয়ের কাতরতা বঙ্গবাসীর নিকট ব্যক্ত করে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সনেট কবিতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবির ভাষাপ্রেম ও দেশপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে !
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা? – যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কর– খাজনা; রাজস্ব। **কলকলে–** নদীর কলকল আওয়াজে। **নিশা–** রাত্রি; রাত। **বঙ্গজ জন–** বঙ্গে জন্মেছেন যিনি, বাঙালি। **বঙ্গের সঙ্গীতে–** বাংলার গানে। **বারি–** পানি। **বারি-রূপ কর–** জল রূপ খাজনা, প্রজা যেমন রাজাকে কর বা রাজস্ব দেয় তেমনি কপোতাক্ষ নদও সাগরকে জলরূপ কর বা রাজস্ব দিচ্ছে। **বিরলে–** একান্ত নিরিবিলিতে। ***ভ্রান্তি–*** ভুল। **ভ্রান্তির ছলনে–** ভুলের ছলনায়। **মিনতি–** প্রার্থনা। **যেমতি–** যেমন। **সখা-রীতে–** বন্ধুর রীতিতে; বন্ধুর নিয়মে। **সতত–** সর্বদা; সবসময়।

চতুর্দশপদী কবিতা– ইংরেজিতে Sonnet, বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা। গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক (Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে। চতুর্দশপদী কবিতায় কয়েক প্রকার অন্ত্যমিল প্রচলিত আছে। যেমন, প্রথম আট চরণ : কখখক কখখক। শেষ ছয় চরণ : ঘঙচ ঘঙচ। অথবা প্রথম আট চরণ : কখখগ কখখগ, শেষ ছয় চরণ : ঘঙঘঙ চচ। 'কপোতাক্ষ নদ' একটি চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে মিলবিন্যাস : কখকখকখখক গঘগঘগঘ।

সারসংক্ষেপ :

বিদেশে বসে দেশের নদী কপোতাক্ষের কথা কবির মনে পড়ে। বহু দেশের বিচিত্র নদী কবি দেখেছেন। কিন্তু ওই নদীর তুলনা আর কোথাও পাননি। তাঁর কাছে এ নদী মায়ের দুধের মতো তৃপ্তিদায়ক। কবির আশঙ্কা, তাঁর সাথে কপোতাক্ষের আর দেখা নাও হতে পারে। কবির আকুতি : বিদেশে বসেও কবি যে দেশের নদীরই গান গাইছেন, কপোতাক্ষ যেন বাংলার মানুষকে সে কথাটা জানায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সনেটের বৈশিষ্ট্য কী?
   ক. আট চরণ, চৌদ্দ মাত্রা খ. ছয় চরণ, ছয় মাত্রা গ. চৌদ্দ চরণ, চৌদ্দ মাত্রা ঘ. আট চরণ, আট মাত্রা
২. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় যাকে 'রাজ'রূপে কল্পনা করা হয়েছে–
   ক. সাগরকে খ. কবিকে গ. জন্মভূমিকে ঘ.স্বদেশকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই–
আজ আর নেই।’

৩ উদ্দীপকে প্রকাশিত অনুভূতি নিচের কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?

ক. আমার সন্তান খ. পল্লিজননী গ. কপোতাক্ষ নদ ঘ. মানুষ

৪. ‘কপোতাক্ষ নদ’ ও উদ্দীপকের অনুভূতির যে বিষয়ে মিল রয়েছে–

i. স্নেহকাতরতা ii. স্মৃতিকাতরতা iii. মানবপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii. গ. iii ঘ. i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মধুসূদন দত্ত কত সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন?

ক. ১৮৪১ খ. ১৮৪২ গ. ১৮৪৩ ঘ. ১৮৪৪

৬. ‘বঙ্গজ জনের কানে’ এখানে ‘বঙ্গজ জন’ বলতে কবি বুঝিয়েছেন–

i. বাংলার প্রবাসী জনগণকে ii. বাংলায় নিবাসী জনগণকে iii. বাংলাভাষী ভিনদেশী জনগণকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।

৭. উদ্দীপকের আঙ্গিকের সঙ্গে নিম্নের কোন কবিতার মিল রয়েছে?

ক. স্বাধীনতা খ. মানুষ গ. পল্লিজননী ঘ. কপোতাক্ষ নদ

৮. উদ্দীপক ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

ক. দেশপ্রেম খ. প্রকৃতিপ্রেম গ. মানবপ্রেম ঘ. বাৎসল্যপ্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন :

লাবণ্যকে উচ্চশিক্ষার্থে ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে শিকড় গাড়তে হয়। সেখানকার পরিবেশে সে এখনো খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি। সারাক্ষণ তার অন্তর পড়ে থাকে দেশে অবস্থানরত মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। প্রবাসে জন্মভূমি বাংলার প্রকৃতি তার চোখ জুড়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে যায়। বাংলা গান না শুনলে তার চোখে ঘুম আসে না। এভাবে শয়নে-স্বপনে দেশ এবং দেশের মানুষগুলো তার নিকট স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি কোনটি?

খ. ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের লাবণ্যের সঙ্গে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্য কোথায়? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “লাবণ্য ও কবির ভাবানুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।” –উদ্দীপক ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কীর্তি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

খ. গীতিকবিতার যে রূপটি চৌদ্দ চরণ এবং চৌদ্দ মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট বলে। সনেট কখনো চৌদ্দ চরণের কম বা বেশি হয় না। প্রতিচরণে সাধারণত চৌদ্দটি মাত্রা ব্যতিক্রম হিসেবে আঠারো মাত্রা থাকে। সনেটের প্রথম আট চরণের স্তবককে বলা হয় অষ্টক এবং শেষ ছয় চরণের স্তবক বলা হয় ষটক। প্রথম স্তবকে

অর্থাৎ অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার, আর শেষ স্তবকে অর্থাৎ ষটকে থাকে ভাবের পরিসমাপ্তি। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম সনেট জাতীয় কবিতার প্রবর্তন করেন।

গ. স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি অনুভূতির দিক দিয়ে কবি মধুসূদন ও লাবণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।
স্বদেশপ্রেম একটি অশরীরী অনুভূতি। পৃথিবীর সকল মানুষই জন্মভূমির মাটি, মানুষ, প্রকৃতিকে ভালোবাসে। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই স্বদেশের জন্য বিরহ বেদনা অনুভব করে। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি ও উদ্দীপকের লাবণ্যের মধ্যে আমরা সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমের চিত্রই দেখতে পাই।
উদ্দীপকের লাবণ্য ম্যাসাচুসেটস্ সিটিতে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমায়। সেখানে তার কিছুই ভালো লাগে না। সবসময় তার মন পড়ে থাকে দেশে মা-বাবা আর স্বজনদের নিকট। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মানুষ, বাংলার গান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যেমন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় কবি মধুসূদন প্রবাস জীবনে নিজ দেশের প্রিয় নদীটিকে ভুলতে পারেননি। জীবনের প্রয়োজনে কবি কত দেশে গিয়েছেন, কতো নদী-সরোবর দেখেছেন, কিন্তু তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটেনি। একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জল তার স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে বলে তিনি মনে করেন। জন্মভূমিকে ভালোবাসেন বলেই কবির মনে এ অনুভূতি কাজ করেছে। বলা যায়, প্রবাস জীবনের আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভোগ-বিলাস কবি মধুসূদন কিংবা লাবণ্য কারো কাছে ভালো লাগেনি। উভয়ের কাছে দেশপ্রেম তথা জন্মভূমি প্রীতিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত দেশপ্রেমের দিক থেকেই কবি ও লাবণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. লাবণ্য ও কবি মধুসূদনের গভীর অনুভূতির পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে অকৃত্রিম দেশপ্রেম।
বাস্তব পৃথিবীতে একজন দেশপ্রেমিক মানুষ কখনোই তার দেশকে ভুলতে পারেন না। দেশের মাটি, মানুষ, নদ-নদী, মায়াভরা প্রকৃতি সবকিছুই যেন তাকে ফিরে ফিরে ডাকে। কেবল জন্মভূমির আলো, বাতাস আর পানিতে তার প্রাণের তৃষ্ণা মেটে। বস্তুত এর স্বরূপই ফুটে উঠেছে উদ্দীপক আর 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই লাবণ্য পড়াশোনার জন্য ম্যাসাচুসেটস্-এ গেলেও সেখানে সে মন বসাতে পারে না। তার অন্তর জুড়ে থাকে বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি আর তার আপনজন। সে সারাক্ষণ অন্তরে অনুভব করে বাংলার মমতাময়ী রূপকে। তার জন্মভূমি বাংলা যেন তাকে সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায়ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। কবিও জীবনে অনেক দেশ ঘুরেছেন। তিনি ফ্রান্সে গিয়েছেন বড় কবি হওয়ার আশায়। কিন্তু সেখানে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের আনন্দ কিংবা বেদনা-বিধুর স্মৃতি সারাক্ষণ কাঁদায়। তিনি আবেগে আপ্লুত হন, সুদূর ফ্রান্সে বসেও যেন কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। বিদেশের মাটিতে অন্য কোনো জল তাঁর স্নেহের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। একমাত্র কপোতাক্ষ নদের জলই যেন মেটাতে পারে তাঁর অন্তরের অতৃপ্ত তৃষ্ণা। এভাবে কবি দেশের বাইরে গভীরভাবে অনুভব করেন নিজের দেশকে, জন্মভূমিকে। তাই বলা যায়, লাবণ্য ও কবির গভীর জীবন অনুভূতির অন্তরালে কাজ করেছে গভীর দেশপ্রেম।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন: দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধুধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

ক. বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে?
খ. 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে ভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের ভাবটিই যেন কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূল সুর।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ক

জীবন সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ১৭ এপ্রিল হুগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাট গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। হেমচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলির উত্তরপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খুব দরিদ্র। হেমচন্দ্র কলকাতার খিদিরপুর বাংলা স্কুলে পড়াকালে আর্থিক সংকটে পড়েন ও পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অত্যন্ত মেধাবি হেমচন্দ্র কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আশ্রয়ে ইংরেজি শেখেন এবং হিন্দু স্কুলে ভর্তি হয়ে জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় পরীক্ষায় বৃত্তি পান। পরে তিনি ১৮৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৮৬৬ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬১ সালে হাইকোর্টের উকিল হন। ১৮৬২ সালে মুন্সেফ হিসেবে নিয়োগ পেলেও তা ছেড়ে দিয়ে আবার ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯০ সালে হাইকোর্টের সরকারি উকিল হন। কর্মজীবনে তিনি আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও শেষজীবনে আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। হেমচন্দ্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো তিনি যেমন গুরুগম্ভীর আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেছিলেন তেমনি আবার সহজ সুরের খণ্ডকবিতা, ওজস্বিনী স্বদেশসঙ্গীত এবং লঘু কবিতাও রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার অনুরাগী ছিলেন এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁর ছায়া পড়েছিল। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে ছিলো স্বদেশচিন্তা ও উনিশ শতকের বাঙালির সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের বলিষ্ঠ রূপায়ণ, ভাষা ও ছন্দের অনর্গলতা। শেষজীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং ১৯০৩ সালের ২৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :

চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১), বীরবাহু (১৮৬৪), বৃত্রসংহার (১৮৭৫), আশাকানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০)।

ভূমিকা

'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদমূলক রচনা থেকে গৃহীত। কবিতাটি মার্কিন কবি Henry Wadsworth Longfellow (১৮০৭-১৮৮২)-এর 'A Psalm of life' শীর্ষক ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ। কবিতাটিতে অত্যন্ত মূল্যবান ও ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যথার্থ কর্মের মাধ্যমে জগতে টিকে থাকার ধারণা লাভ করা যাবে। জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করে সংসারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে মহান ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে বরণীয় হওয়ার প্রক্রিয়া কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানব-জীবনের উন্নতির উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন;
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসারে-সমরাঙ্গনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হইও না কাতর।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়
সমর-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অনিত্য– অস্থায়ী; যা চিরকালের নয়। ***আকিঞ্চন***– চেষ্টা; আকাঙ্ক্ষা। ***আয়ু যেন শৈবালের নীর***– শেওলার ওপর পানির ফোঁটার মতো ক্ষণস্থায়ী। ***আশ***– আশা। ***কাতর স্বরে***– দুর্বল কণ্ঠে; করুণভাবে। **ক্রন্দন**– কান্না। **ঘুচায়**– অতিবাহিত বা অতিক্রান্ত হওয়া। ***জীবাত্মা***– মানুষের আত্মা; আত্মা যদিও অমর, কিন্তু মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কাজেই দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন চলে যাবে, চিরকাল দেহকে আঁকড়ে থাকতে পারবে না। ***দারা***– স্ত্রী। **দুর্লভ**– দুষ্প্রাপ্য; পাওয়া কঠিন। **দৃঢ়পণে**– অটল সংকল্প। ***ধ্বজা***– পতাকা; নিশান। **নিশার স্বপন**– মিথ্যা বা অসার ভাবনা। **পদাঙ্ক**– কোনো মহৎ ব্যক্তির কৃতকর্ম বা চরিত্র। ***প্রাতঃস্মরণীয়***– সকাল বেলায় স্মরণ করার যোগ্য; অর্থাৎ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। **ফাঁস**– ফাঁসি; ইচ্ছা অনুযায়ী শক্ত বা শিথিল করা যায় এমন রজ্জু বা দড়ির বাঁধন। ***বরণীয়***– সম্মানের যোগ্য। ***বাহ্যদৃশ্যে***– বাইরের জগতের চাকচিক্যময় রূপে বা জিনিসে। ***বীর্যবান***– শক্তিমান। **বৃথা**– ব্যর্থ। **মহাজ্ঞানী মহাজন**– কীর্তিমান মহৎ ব্যক্তি। ***ভবের***– জগতের; সংসারের। ***মহিমা***– গৌরব। **যশোদ্বার**– খ্যাতির দ্বার। ***সমরাঙ্গনে***– যুদ্ধক্ষেত্রে (কবি মানুষের জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন)। ***সংসারে-সমরাঙ্গনে***– যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের মতো সংসারেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হবে। **সার**– একমাত্র সম্বল। ***স্বপন***– রাতের স্বপ্নের মতোই মিথ্যা বা অসার। **স্বীয়**– নিজ; আপন।

সারসংক্ষেপ :

মানুষের জীবন পরম মূল্যবান। এ জীবন স্বপ্ন বা মায়া নয়; অকারণও নয়। দুঃখের জন্য হা-হুতাশ বা সুখের জন্য কাতরতা দেখিয়ে লাভ নেই। বরং কর্তব্যকর্মে অগ্রসর হয়ে বাধাবিঘ্ন জয় করাই সফলতার উপায়। মহাপুরুষদের অনুসরণ করা জরুরি। তাহলে আমরাও তাঁদের মতো হতে পারব। জীবনে সাফল্য লাভের জন্য দরকার বিপদ মোকাবেলা করা আর সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বৃত্রসংহার' কী জাতীয় রচনা?

ক. গীতিকাব্য　　খ. মহাকাব্য

গ. কাহিনি কাব্য　　ঘ. পত্রকাব্য

২. 'জীবন সঙ্গীত' একটি–

i. অনুবাদমূলক কবিতা　　ii. নীতিশিক্ষামূলক কবিতা　　iii. ভাবানুবাদমূলক কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুমন্ত কাঞ্জিলাল তার অতীতের স্বর্ণময় জীবনের কথা ভেবে আকুল হন। কেননা আজ তিনি নিঃস্ব, রিক্ত। কোনো কিছুতেই তার মন সায় দেয় না।

৩. উদ্দীপকের ভাবের প্রতিফলন দেখা যায় যে কবিতায়–

ক. প্রাণ　　খ. মানুষ

গ. জীবন সঙ্গীত　　ঘ. কপোতাক্ষ নদ

৪. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা অনুযায়ী সুমন্ত কাঞ্জিলালের ভাবনা–

i. জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ　　ii. সফলতার জন্য প্রেরণা　　iii. সফলতার জন্য প্রতিবন্ধকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii.　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি কোন কবিতার অনুবাদ?

ক. A Psalm of life | খ. A Passion of life
গ. The Sands of Dee | ঘ. The Horns of Dilema

৬. 'শৈবালের নীর' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. বরণীয় | খ. দীর্ঘস্থায়ী
গ. ক্ষণস্থায়ী | ঘ. স্মরণীয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।

৭. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার যে বিষয়টি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে–

ক. খ্যাতি | খ. বিত্ত | গ. অমরত্ব | ঘ. বিদ্যা

৮. উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রকাশিত জীবন–

ক. নিশার স্বপন | খ. সমরাঙ্গন | গ. তাৎপর্যময় | ঘ. মায়ার জগৎ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকতে দিনের সাধন কেন করলে না ॥
জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কী হয় তার বাঁধন দিলে
শুকনা মোহনা ॥
অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল তো ধরে না ॥

ক. 'নিশার স্বপন' অর্থ কী?
খ. 'ভবের উন্নতি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার কবির জীবন ভাবনাকে কীভাবে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার কেবল একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরেছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর:

ক. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় ব্যবহৃত 'নিশার স্বপন' শব্দের অর্থ হচ্ছে রাতের স্বপ্ন।

খ. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় ভবের উন্নতি বলতে সংসার তথা পৃথিবীর উন্নতিকে বোঝানো হয়েছে।
প্রচলিত অর্থে সংসার বলতে দারা-পুত্র-পরিজনের সমবায়কে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংসার মানে মানুষের বসবাসের ক্ষেত্র তথা পৃথিবী। ভব মানে এই পৃথিবীই। ব্যক্তি মানুষ যদি নিজ কর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়, তার কর্ম সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয় এবং সে তা সুষ্ঠুরূপে পালন করে তবেই ভবের উন্নতি হবে। মূলত কাজকে প্রাধান্য দিলে শুধু পৃথিবীর উন্নতিই নয়, বরং ব্যক্তি মানুষেরও উন্নতি সাধন হয়। ব্যক্তি তার মহিমা লাভ করে এবং সে জীবনের প্রকৃত স্বাদও পায়। বস্তুত 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় 'ভবের উন্নতি' উন্নতি বলতে কবি এটিকেই বুঝিয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে বর্তমানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এদিকটিই 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় বর্ণিত কবির জীবন ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বুদ্ধিমানেরা বর্তমানের ভাবনাই ভাবেন। কেননা অতীত নিয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বরং তা মানুষের জীবনকে স্থবির ও জড় করে দেয়। তাছাড়া কেবল অতীত নিয়ে ভাবলে অনেক সময় ভবিষ্যতের পাথেয়ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একজন মানুষকে বর্তমানের সর্বোত্তম ব্যবহারই সফল করে তুলতে পারে।

'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় কবি বলেছেন পৃথিবীতে মানব জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। অতীত জীবনের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে কারোর কাতর হওয়া উচিত নয়। সুখের প্রতিমা গড়ে অজানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করাও বোকামি। উদ্দীপকেও দেখা যায় বর্তমানের কাজ বর্তমানেই করতে বলা হয়েছে। বিষয়টিকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে উদ্দীপকে বোঝানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সময় অর্থাৎ বর্তমান পার হয়ে গেলে সাধন হবে না। সুতরাং উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো বর্তমানকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জীবন ভাবনা 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত, 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার এই বিশেষ ভাবটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ভবের সংসারে মানব জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। এখানে মিথ্যা সুখের প্রতিমা গড়ে কোনো লাভ নেই। অবশ্য মানব জীবনের উদ্দেশ্যও তা নয়। সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালন করতে হবে। কেননা বৈরাগ্য সাধনে মানুষের মুক্তি নেই।

'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় বলা হয়েছে মানুষের জীবন কেবল নিছক স্বপ্ন নয়। আর এ পৃথিবীকে কেবল স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ বলা চলে না। অতীত সুখের দিন ও অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে বাদ দিলে চলবে না। বর্তমানেই বর্তমানের কাজ করে যেতে হবে। অন্যদিকে উদ্দীপকে বেশ কয়েকটি উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে নদীতে জল শুকালে যেমন মাছ থাকে না, তেমনি অসময়ে কৃষিকাজ করলে কোনো ফল আসে না। উদ্দীপকের কবির ভাষায় বলা যায়, সময় গেলে সাধন হয় না। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় মানব জীবনের অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু উদ্দীপকে বার বার এসেছে একটি প্রসঙ্গ। আর এই বিষয়টি হচ্ছে সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরেছে, কবিতার সমগ্র ভাবকে নয়।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সময়ের যারা সদ্ব্যবহার করে, তারা জিতবেই। সময়েই টাকা, সময় টাকার চেয়ে বেশি। জীবনকে উন্নত করো কাজ করে। জ্ঞান অর্জন করো। চরিত্রকে ঠিক করে বসে থাকো। কৃপণের মতো সময়ের কাছ থেকে তোমার পাওনা বুঝে নাও।

ক. 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'জীবাত্মা' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের যে বিষয়টি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় রয়েছে জীবনকে সমৃদ্ধ করার মহৎ বাণী।' –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. গ ৮. গ

প্রাণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারির তত্ত্বাবধান-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। বাংলা ছোটগল্পকে তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কবিতা	:	*মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, শেষলেখা;*
উপন্যাস	:	*চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা;*
ছোটগল্প	:	*গল্পগুচ্ছ, তিনসঙ্গী, গল্পসল্প;*
নাটক	:	*বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী;*
প্রবন্ধ	:	*আধুনিক সাহিত্য, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, সাহিত্যের স্বরূপ;*
আত্মজীবনী	:	*জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা।*

ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণ' কবিতাটি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতায় স্বীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই অমরত্ব লাভ করা সম্ভব। আর মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় থাকার জন্য প্রয়োজন মহৎ সৃষ্টির দৃঢ় সংকল্প।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে কবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবি ও কবিতার কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই !
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময় –
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয় !

তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায় ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অমর আলয়– অমর সৃষ্টি অর্থে। **কানন–** বাগান। ***চিরতরঙ্গিত–*** সর্বদা কল্লোলিত; বহমান। ***জীবন্ত হৃদয় মাঝে–*** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য অংশে তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। **ঠাঁই–** ঠিকানা; স্থান। ***নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই–*** রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎ বিপুল; মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগৎকে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সৃষ্টির মধ্য থেকে রূপ-রস-গন্ধ যেন মানুষ অনুভব করতে পারে তার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ফুটিয়ে তুলছেন সৃষ্টির কুসুম। ***বিরহমিলন কত হাসি-অশ্রুময়–*** মানুষের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হাসি-কান্না; আনন্দ-বেদনা নিয়ে তার জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থান করে নিতে চেয়েছেন। আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিপুল এক আখ্যান। **ভুবনে–** পৃথিবীতে; ধরায়। ***লভি–*** লাভ করি। ***সূর্য করে–*** সূর্যের আলোতে।

সারসংক্ষেপ :

দুনিয়াটা সুন্দর। এই সুন্দর ছেড়ে কবি মরতে চান না। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে চান। মানুষের জীবন হাসি-কান্নায় ভরপুর। কবি তাঁর কাব্যে জীবনের এই বৈচিত্র্যকে অমর রূপ দিয়ে মানুষের চিরন্তন ভালোবাসা পেতে চান। অমর কাব্য না লিখতে পারলেও ক্ষতি নেই। যতদিন তাঁর কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, ততদিন যেন মানুষ সেগুলো গ্রহণ করে– এই কবির একান্ত চাওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘প্রাণ’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

ক. কড়ি ও কোমল | খ. বনফুল
গ. সোনার তরী | ঘ. শেষের কবিতা

২. 'অমর আলয়' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. সূর্যের আলো অর্থে
খ. সুরধ্যান অর্থে
গ. অমর সৃষ্টি অর্থে
ঘ. সুরবাণী অর্থে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে ॥

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. প্রাণ
খ. জীবন সঙ্গীত
গ. পল্লিজননী
ঘ. বাংলা শব্দ

৪. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত কবিতায় মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ভাবে
ii. আঙ্গিকে
iii. বিষয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i, ii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

ক. ১৯১১
খ. ১৯১২
গ. ১৯১৩
ঘ. ১৯১৪

৬. 'প্রাণ' কবিতায় কবি কোথায় স্থান পেতে চেয়েছেন?

ক. সূর্যকরে
খ. পুষ্পিত কাননে
গ. নবসঙ্গীতে
ঘ. মানবের মাঝে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেব না ভুলিতে।

৭. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে নিচের কোন চরণের মিল রয়েছে?

i. এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

ii. পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

iii. পাক্কা নতুন টাটকা ওষুধ এক্কেবারে দিশি–
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৮. যে কারণে উদ্দীপক ও সাদৃশ্যপূর্ণ চরণে মিল দেখা যায়–

ক. সৃষ্টির আনন্দ
খ. খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা
গ. সম্পত্তির লোভ
ঘ. ক্ষমতা ভোগের আকাঙ্ক্ষা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক,
শুধু থাক
সম্রাটের ছিল এ সাধনা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।

ক. 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
খ. 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' –কবি একথা বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'প্রাণ' কবিতার কোন বিষয়টিকে প্রকাশ করে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের শাজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতায় কবির অনুভূতি একই সূত্রে গাঁথা।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বনফুল' কাব্যগ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ. হাসি, আনন্দ, সুখ-দুঃখে ঘেরা এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবী ছেড়ে কবি কিছুতেই চলে যেতে চান না।
পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। যদিও এটা সকলেই জানেন মানুষ মরণশীল। এই সুন্দর আকর্ষণীয় পৃথিবীতে মানুষ আসেই পুনরায় চলে যাওয়ার জন্য। তবুও মানুষ এ ধরণীতে বাঁচতে চায়, কিছুতেই হারিয়ে যেতে চায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চান না এ পৃথিবীর মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে, চান না মরে যেতে। তিনি পৃথিবীর মানুষের হৃদয় ও প্রকৃতির অপরূপ রূপ-লাবণ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। এভাবে তিনি মহৎ কর্ম সৃষ্টি করে মানবের হৃদয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে চান। বস্তুত 'প্রাণ' কবিতায় একথাই তিনি উক্ত চরণটি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকার প্রত্যাশাই 'প্রাণ' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।
রূপ-রস-আনন্দে ভরপুর এই জগত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। মানুষ এখানে নিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে ও টিকে থাকতে। আবেগ ও ভালোবাসায়, মান ও অভিমানে, হাসি ও কান্নায় পূর্ণ এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যেন আনন্দের। কেউই চায় না এই মায়াবী পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলীন করে দিতে।
'প্রাণ' কবিতাটিতে কবিমনের এক সুন্দর আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে কবি অন্য কিছুর আহ্বানে প্রলুব্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান না। তাই তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, কালজয়ী রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে জগতের নিকট আদৃত হওয়ার। উদ্দীপকের কবিতাংশটুকুতে সম্রাট শাহজাহানের মনের যে বাসনা ব্যক্ত হয়েছে তা 'প্রাণ' কবিতায় প্রকাশিত কবির মনোভাবেরই একটু ভিন্নরূপ। সম্রাট শাহজাহান জানেন সময়ের কালস্রোতে জীবন-যৌবন-ধন-মান একদিন সবই লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি চেয়েছেন নিজের আপনজন হারানোর বেদনাটি যেন জগতের মানুষ সহজে ভুলে না যায় সেজন্য কিছু সৃষ্টি করতে। আর এর প্রত্যক্ষ ফসল আগ্রায় সৃষ্ট অমর তাজমহল। উদ্দীপকে বর্ণিত সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাই 'প্রাণ' কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শাহজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতার কবির অনুভূতি একসূত্রে গাঁথা।
মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। জন্মগ্রহণ করলে তাকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। জীবনের এই ধ্রুব সত্যটি সকলের জানা। তবুও মানব মনের বাসনা যে, সে পৃথিবীতে মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকবে। যেহেতু দৈহিকভাবে মানুষের অবিনশ্বর হওয়া সম্ভব নয়, তাই আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মনে জাগরূক হয়ে থাকতে পারাটাই হচ্ছে এ অমরতা।
'প্রাণ' কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজ সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানব জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মাঝে নিজের স্থান করে নিতে চেয়েছেন। তাই কবি মানব জীবনের বিচিত্র অনুভব-অনুভূতি, ভাব-ভাবনা ও কর্মের জগতকে আপন সৃষ্টির মধ্যে প্রাণময় করে তোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। কবির

অবর্তমানে মানুষ যেন জীবনের রূপ-রস-গন্ধ অনুভব করতে পারে সেজন্যই তিনি রচনা করেছেন তার নব নব সৃষ্টির ডালি। উদ্দীপকে সম্রাট শাহজাহানের জীবনের আকাঙ্ক্ষাও তাই। তিনি জানেন সময়ের কালপ্রবাহে তার পায়ে চলার স্মৃতিটুকুও মুছে যাবে। তাই তিনি সৃষ্টি করেছেন অমর তাজমহল। সম্রাট শাহজাহান যেদিন পৃথিবীতে থাকবেন না, সেদিন তার তাজমহল পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে। তিনিও পৃথিবীর মানুষের মনে জাগরূক থাকবেন, পৃথিবীর অনাগত কালের মানুষ জানবে তার অব্যক্ত হৃদয়ের গোপন কথা।
অতএব, দেখা যাচ্ছে 'প্রাণ' কবিতায় কবি যেমন আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন ঠিক তেমনি উদ্দীপকেও সম্রাট শাহজাহান আপন সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে নিজের মনোবেদনাকে আবহমান কালের পৃথিবীতে বর্তমান করে যেতে চেয়েছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাহজাহান এবং 'প্রাণ' কবিতায় কবির অনুভূতি একইসূত্রে গাঁথা।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রাণিমাত্রই মরণশীল। জন্ম মানেই মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া। তবু মানুষ এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সে সূর্যের আলোতে, ফুলের সমারোহে ও সৌন্দর্যে পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নেয়। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে ছেড়ে সে অন্ধকারে হারাতে চায় না। তার প্রজ্ঞা, মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। অন্য কথায় বলা যায়, মানবের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন।

ক. 'চিরতরঙ্গিত' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।' –কথাটির মানে কী?
গ. উদ্দীপকটি 'প্রাণ' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. 'প্রাণ' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।' –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক   ২. গ   ৩. ক   ৪. ঘ   ৫. গ   ৬. ঘ   ৭. ক   ৮. ক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

অন্ধবধূ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবি পরিচিতি

কবি ও সাংবাদিক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর নদীয়া জেলার জমশেরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। কলকাতার ডাফ কলেজ থেকে ১৯০২ সালে তিনি বিএ পাস করেন। বিভিন্ন চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি কাজ করেন। একসময় তিনি নাটোরের মহারাজার সচিব ছিলেন। সমকালীন অনেক সাহিত্যিক পত্রিকা তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রোত্তর যুগের শক্তিমান কবিদের মধ্যে অন্যতম। পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও পল্লিজীবনের হাসি-কান্না তাঁর কবিতার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রাম-বাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ উন্মোচনে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রামের অতি সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সহজ-সরল ভাষায় তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাগ্যবিড়ম্বিত ও নিপীড়িত নারীদের কথা তিনি বিশেষ দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'কাজলাদিদি' ও 'অন্ধবধূ' তাঁর এ ধরনের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *লেখা*, *রেখা*, *অপরাজিতা*, *বন্ধুর দান*, *জাগরণী*, *নীহারিকা*, *মহাভারতী*;

কবিতা : কাজলাদিদি, অন্ধবধূ।

ভূমিকা

আত্মকথনমূলক সংলাপের আদলে রচিত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'অন্ধবধূ' কবিতায় একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভূতিলোকের পরিচয় এবং তাদের প্রতি সমাজের নির্মমতা তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের অসহায় জীবনযাপনের সংবেদনশীলতায় ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সে যে জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তা সুস্পষ্টভাবে কবি উপস্থাপন করেছেন। তারা নৈরাশ্যবাদী নয়; বরং জীবনের প্রতি তাদের গভীর মমত্ববোধ আছে এবং তা আপনজনের মমত্ব প্রত্যাশা করে। তাই এই কবিতায় সুনিপুণ ভাবে ফুটে উঠেছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- অন্ধ নারীর করুণ জীবনের প্রতি কবির সহানুভূতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- দৃষ্টিহীনরা অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কীভাবে জীবন ও জগতের সাথে সম্পর্কিত থাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি –
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল– মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল– কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই –
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
– অনেক দেরি? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া – বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে –
শ্যাওলা-পিছল – এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায় –
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা – দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে –
দেখবি তখন – প্রবাস কেমন লাগে?

'চোখ গেল' ওই চেঁচিয়ে হলো সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা–
জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার – ছাই!
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কমত যে তার শোক।

'চোখ গেল'– তার ভরসা তবু আছে–
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!

টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি–
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা- সেই তো গৃহকোণ–
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে–
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যাক– অন্ধবধূ অনুভবঋদ্ধ মানুষ। আত্মমর্যাদা বোধেও সে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে অন্ধ। এই অন্ধত্বের কষ্ট সে গভীরভাবে অনুভব করে। দীঘির ঘাটে যখন শেওলা পড়া পিছল সিঁড়ি জাগে তখন সে পিছল খেয়ে জলে পড়ে ডুবে মরার আশঙ্কা প্রকাশ করে। আর এও অনুভব করে যে, ডুবে মরলে অন্ধত্বের অভিশাপ ঘুচত। কিন্তু কবিতাটির চেতনা থেকে মনে হয়, অন্ধবধূ নৈরাশ্যবাদী মানুষ নয়। জীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ আছে। **অন্ধবধূ জ্ঞান রাখে–** জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে এবং অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কে জানে। ***আকাশপাতাল–*** নানা বিষয়; নানান ভাবনা-অনুভাবনা অর্থে ব্যবহৃত। **আলাপন–** কথোপকথন। **কতক–** কিছু; কিয়দংশ। ***কাঁদার সুখ–*** মানুষ দুঃখে কাঁদে, শোকে কাঁদে। কিন্তু কান্নার মধ্য দিয়ে তার দুঃখ-শোকের লাঘব ঘটে; তাই কান্নার মধ্যেও সুখ অনুভব করা যায়। **চুকে–** মিটে যাওয়া। ***চোখ গেল–*** পাখি বিশেষ। এই পাখির ডাক 'চোখ গেল' শব্দের মতো মনে হয়। ***জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই...–*** একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভবের অসাধারণ এক জগৎ আলোচ্য অংশে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ধারণা ও অনুভবে এই অন্ধবধূ সমৃদ্ধ। সেই জ্ঞান ও অনুভব থেকে সে জেনে নিতে চায় ঋতুর বিবর্তন। ***ঠাকুরঝি–*** ননদ, স্বামীর বোন, শ্বশুরকন্যা। **তলিয়ে–** ডুবে। **দখিন হাওয়া–** দক্ষিণ দিকের বাতাস। **দোর–** দরজা। **নেহাত–** নিতান্ত, নিদেনপক্ষে। **পরশ–** স্পর্শ। **প্রবাস–** নির্বাসন, বিদেশ। **বারণ–** নিষেধ, মানা। **বাসে–** সুগন্ধে। ***মধুমদির বাসে–*** মধুর গন্ধে মোহময়।

সারসংক্ষেপ :

বধূটি অন্ধ। অন্ধ হলেও তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর। পায়ের নিচে পড়া বকুল ফুল, কোকিলের ডাক, দখিনা হাওয়া, পিচ্ছিল সিঁড়ি ইত্যাদি সে গভীরভাবে অনুভব করে। এভাবে সে সম্পর্কিত থাকে সময় ও প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু অন্ধ জীবনের দুর্গতিও কম নয়। তার ধারণা, সে অন্ধ বলেই স্বামী বিদেশ থেকে দেশে আসে না। বারবার মৃত্যুর ইচ্ছা জানিয়ে সে তার অভিমানী মনের বেদনাই প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পায়ের তলায় নরম ঠেকেছিল কোনটি?
   ক. ঝরা গোলাপ   খ. ঝরা বকুল   গ. ঝরা মালতী   ঘ. ঝরা কদম

২. 'অন্ধবধূর শোকের বোঝা' যেভাবে হালকা হয়েছে–
   ক. কাঁদতে পেরে   খ. বাপের বাড়ি যেতে পেরে
   গ. স্বামীকে কাছে পেয়ে   ঘ. গান শুনতে পেয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুভা যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে একথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাই বলিয়া সে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে নাই। গৃহকর্মে তাহার অখণ্ড মনোযোগ। শুধু তাহাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে সে পাতিয়া নিয়াছিল মিতালি।

৩. উদ্দীপকের সুভা ও 'অন্ধবধূ' কবিতার বধূর অমিল যেখানে–
   ক. জীবন ভাবনায়   খ. অর্থ -সম্পদে   গ. গায়ের রঙে   ঘ. সমাজ নীতিতে

৪. উদ্দীপকের সুভা ও অন্ধবধূর মিতালি রয়েছে যে বিষয়ে-
   i. প্রকৃতিপ্রেমে   ii. আবেগ প্রকাশে   iii. অধিকার আদায়ে

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'চোখ গেল' শব্দের অর্থ কী?

ক. লজ্জা খ. রাগ গ. পাখি ঘ. ফুল

৬. 'অন্ধবধূ' কাঁদতে পারলে কী হতো?

i. দুঃখ লাঘব হত ii. শোক কম হত iii. রাগ বেড়ে যেত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অর্ণব দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তাহার জীবনের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া আছে। সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত,আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার যে চরিত্রটির মিল রয়েছে–

i. অন্ধবধূ ii. দাদা iii. ঠাকুরঝি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৮. উদ্দীপক ও 'অন্ধবধূ' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. রাগ খ. ঘৃণা গ. অবহেলা ঘ. আনন্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমাদের সমাজ ও সংসারে প্রতিবন্ধীদেরকে ছোট করে দেখা হয়, মনে করা হয় তারা বোঝা। এটা করা উচিত নয়, কেননা তারাও মানুষ। প্রতিবন্ধী মানুষকে অবজ্ঞা করলে তাদের দুঃখ আরো বেড়ে যায়। আমাদের উচিত তাদের ভালোবাসা, তাদের যথোপযুক্ত মূল্য দেয়া। নির্মল পরিবেশ পেলে তারাও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। এমনকি তারা হয়ে উঠতে পারে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। একটি সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য তাদের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা ও মমত্বময় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ক. সমাজ কাদের অবজ্ঞা করে?

খ. 'বাঁচবি তোরা – দাদা তো তার আগে?' –অন্ধবধূ একথা বলেছে কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য আপনার নিজের ভাষায় তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'অন্ধবধূ' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করেছে।" – মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. সমাজ দৃষ্টিহীনদের অবজ্ঞা করে।

খ. অন্ধবধূ মনে করে অন্ধ বলে সে সকলের নিকট বোঝা। তাই মনের দুঃখে সে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

সমাজে ও সংসারে দৃষ্টিহীন বলে অন্ধবধূ নিজেকে খুব অসহায় মনে করে। তার ধারণা যে নিজের সংসারেও সে উপেক্ষিত। সে নিজেকে সংসারে একটি বোঝা বলে মনে করে। তার ধারণা সে মরে গেলে তার স্বামী, ঠাকুরঝি সবাই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। এসব কথা মনে করে সে ঠাকুরঝির উদ্দেশ্যে উক্তিটি করেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'অন্ধবধূ' কবিতার সাদৃশ্য নয়, বৈসাদৃশ্য রয়েছে। অন্ধবধূর প্রতিবন্ধকতা জয় করতে না পারার বিষয়টিই উদ্দীপকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। সমাজে চলতে গেলে তাদের অন্যান্য মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা পেলে তারাও প্রতিবন্ধী অবস্থা কাটিয়ে সমাজের অন্য কর্মক্ষম মানুষের মতো হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের আলোচ্য 'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূ একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও সে প্রকৃতিপ্রেমী। সে তার অনুভবের সাহায্যে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। কিন্তু সে সমাজের একজন কর্মক্ষম মানুষ নয়। নিজের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সে সমাজের স্বাভাবিক মানুষের মত সক্ষম বা ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে এর বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবন্ধীরা যথাযথ মনোযোগ ও সহায়তা পেলে দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এমনকি তারা হয়ে উঠতে পারে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব । সে কথাও রয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায় 'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে না পারার ব্যর্থতাটাই উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় নি।

ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধীরা পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে নিজেদের স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত করে তুলতে পারে।

সমাজে প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। তাদেরকে অবহেলা না করে আমাদের বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। কেননা সকলের সহযোগিতা পেলে এই বিশেষ ধরনের মানুষগুলো নিজেদের মেলে ধরতে পারে। তারাও দুঃখের অন্ধকার ছেড়ে আলোকিত জীবনের অধিকারী হতে পারে।

'অন্ধবধূ' কবিতায় অন্ধবধূ জন্ম থেকেই অন্ধ। আবার সে পল্লিগ্রামে মানুষ। অবশ্য অন্ধবধূ যথেষ্ট অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। তবু তার জীবন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয় নি। ফলে সে স্বনির্ভর নয়। তার জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। স্বামীর প্রতীক্ষা,প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা কিংবা গৃহকোণ তার জীবনের অনুষঙ্গ। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে ফুটে উঠেছে 'অন্ধবধূ' কবিতার বিপরীত দিকগুলো। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন করতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারাও মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে। আর আমাদের উচিত হবে প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভালোবাসা আর সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়। তারাও অন্যদের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদের প্রতি বেশি করে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, 'অন্ধবধূ' কবিতাটি উদ্দীপকের আংশিক চেতনা ধারণ করেছে।' –মন্তব্যটি যথার্থ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়,
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–
"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?"

ক. যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
খ. 'অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব' –কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকটি 'অন্ধবধূ' কবিতার কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? – ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "অন্ধবধূ' কবিতাটির সামগ্রিক অংশ নয়, একটি বিশেষ দিক উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. গ

ঝরনার গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বাংলা-গদ্যের প্রাণপুরুষ ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। পাণ্ডিত্যের একটি প্রবল ঝোঁক উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি তাঁর পিতামহের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের ছাপ অনেক কবিতার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা যখন মধ্যগগনে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তখন আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের বাইরেও একটি স্বতন্ত্র কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন; যে কারণে, তিনি বাংলা কাব্য জগতে সমাদৃত হয়ে আছেন। কবিতার ছন্দ ও রূপের নৈপুণ্যের জন্য তিনি ছন্দের যাদুকর হিসেবে বাংলার কাব্য জগতে পরিচিত। সাধারণ মানুষ যেমন তাঁর কাব্যের উপজীব্য; তেমনি আবার অতি সাধারণ দেশজ শব্দ, বিলুপ্তপ্রায় শব্দ ব্যবহার করে তিনি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কবিতা শব্দনির্মাণ কৌশল, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদের পথিকৃৎ হিসাবেও তিনি স্বীকৃত। তিনি আরবি, ফারসি, চিনা, জাপানি, ইংরেজি, ফরাসি ও উপমহাদেশের বহু ভাষা থেকে কবিতা অনুবাদ করেছেন। তাঁর 'কাব্য সঞ্চয়ন' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *সবিতা*, *সন্ধিক্ষণ*, *বেণু ও বীণা*, *হোমশিখা*, *কুহু ও কেকা*, *অভ্র আবীর*, *বেলা শেষের গান*, *বিদায় আরতী*।

অনূদিত কাব্যগ্রন্থ : *তীর্থরেণু*, *তীর্থ-সলিল*, *ভুলের ফসল*।

ভূমিকা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকৃতি বিষয়ক 'ঝরনার গান' কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গের রূপ সৌন্দর্যের তুলনা, পাহাড়ি প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পর্ক এবং পাহাড়ি ঝরনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কবি এই কবিতায় ঝরনার চঞ্চল গতিময়তা, চমৎকার ধ্বনি-মাধুর্য এবং নিথর পাথরের বুকে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া মনোমুগ্ধকর ও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য অবলোকনে কবি মানসিক শান্তি ও কর্মস্পৃহাকে শাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ঝরনার চলার গতি ও পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ।
শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝিঁর ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।
বিজন দেশ, কূজন নাই
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ সকাল।
ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়,
কোন গিরির হিম ললাট
ঘামল মোর উদ্ভবে,
কোন পরীর টুটুল হার
কোন নাচের উৎসবে।
খেয়াল নাই-নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়, –খিলখিলাই–
বুলবুলির বোল সাধি।
বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলায়
কালসারের দল চরে,
শিং শিলায়-শিলার গায়,
ডালচিনির রং ধরে।
ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাঁট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই–
টিলার গায় ডালিম-ফাট।
শালিক শুক বুলায় মুখ
থল-ঝাঁঝির মখমলে,
জরির জাল আংরাখায়
অঙ্গ মোর ঝলমলে।
নিম্নে ধাই, শুনতে পাই
'ফটিক জল।' হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক না সেই পাঁক ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাতকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।
তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান–তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ।
চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক,
দুল দোলাই মন ভোলাই,
ঝিলমিলাই দিগ্বিদিক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আংরাখা– লম্বা ও ঢিলা পোশাক বিশেষ। **উদ্ভব–** উৎপন্ন, জন্ম। **উপল-ঘায়**– পাথরের আঘাতে। **কূজন**– পাখির ডাক।, **গরজ–** দরকার; প্রয়োজন। **গিরি–** পাহাড়; পর্বত। ***চকোর***– পাখি বিশেষ, কবি-কল্পনা অনুযায়ী এই পাখি চাঁদের আলো পান করে। **চন্দ্রমা**– চাঁদের আলো। **চপল–** অস্থির; চঞ্চল। **ঝাঁঝি**– এক প্রকার জলজ গুল্ম; বহুদিন ধরে জমা শেওলা। ***ঝুম-পাহাড়***– নীরব পাহাড়; নির্জন পাহাড়। ***তরল শ্লোক***– লঘু বা হালকা চালের কবিতা। ***তান***– সুর। ***থল***– স্থল। **ধাই–** দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া; ধাওয়া। **পাতকুয়া–** কাঁচা কুয়া; ছোট কুয়া। **পুলক-** শিহরণ। ***'ফটিক জল'***– চাতক পাখি ডাকলে 'ফটিক জল' শব্দের মতো শোনা যায়। ***বিজন***– নির্জন; জনশূন্য; নিভৃত। **বিভোল–** অচেতন; বিভোর; বিবশ; বিহবল। ***বিলাই***– বিতরণ করি; পরিবেশন করি (বিলোনো থেকে)। **বোধ-** অনুভূতি; উপলব্ধি। **বোল–** বুলি; কথা। ***মখমল***– কোমল ও মিহি কাপড়। **ললাট–** কপাল। **শুক–** টিয়ে পাখি। **শিথিল–** শ্লথ; অবসন্ন; জড়তুল্য। **শিলা–** পাথর। **সাঁঝ–** সন্ধ্যা। **স্যাঁচার–** সেচন করার বা পানি তোলার যন্ত্র। ***হিম***– তুষার; বরফ।

সারসংক্ষেপ :

ঝরনার আছে গতির সৌন্দর্য। দূর পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বিজন পথে সে একাকী ধেয়ে চলে। চলাতেই তার আনন্দ। আশপাশের দিকে নজর না দিয়েই সে ঝলমলে অঙ্গ নিয়ে ছুটে যায়। সে চায় না, তার স্বচ্ছ পানিতে কেউ পিপাসা মেটাক। সৌন্দর্যই তার মূল পরিচয়। তাই সে যেতে চায় তার কাছে, যার সুন্দর দেখার চোখ আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঝরনা কীসের গান করে?
ক. বুলবুলির খ. ঝিঁঝির গ. শালিকের ঘ.পরির

২. ফটিক জলের কী হয়েছে?
ক. তৃষ্ণা পেয়েছে খ. ক্লান্তি পেয়েছে গ. ক্ষুধা লেগেছে ঘ. কষ্ট লেগেছে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'ঝরনা। ঝরনা। সুন্দরী ঝরনা।
তরলিত চন্দ্রিকা। চন্দন বর্ণা।
অঞ্চল সিঞ্চিত গৌরিক স্বর্ণে,
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে।'

৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে নিচের কোন কবিতার মিল রয়েছে?
ক. প্রাণ　খ. মানুষ　গ. ঝরনার গান　ঘ.সাঁকোটা দুলছে

৪. উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–
i. সৌন্দর্যময়তা　ii. গতিময়তা　iii. চঞ্চলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i　খ. ii　গ. iii　ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'ফটিক জল' কী?
ক. ফিঙ্গে পাখি　খ. ময়না পাখি　গ. চাতক পাখি　ঘ. হুদহুদ পাখি

৬. 'ঝর্ণার গান' কবিতায় পাহাড় কীভাবে ঘুমায়?
ক. মুখোশ পরে　খ. লাঠি নিয়ে　গ. ঘাড় ঘুরিয়ে　ঘ. ধমক দিয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :।

চুনিয়া তো ভালোবাসে শান্তস্নিগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ,
চুনিয়া প্রকৃত বৌদ্ধ স্বভাবের নিরিবিলি সবুজ প্রকৃতি
চুনিয়া যোজনব্যাপী মনোরম আদিবাসী ভূমি।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতাটির কোন বিষয়ে মিল রয়েছে?
ক. প্রকৃতি　খ. মানুষ　গ. ছন্দ　ঘ. ভাব

৮. উদ্দীপক ও 'ঝরনার গান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–
ক. প্রকৃতির শাশ্বত আবেদন　খ. প্রকৃতির রুক্ষতা
গ. প্রকৃতির মাদকতা　ঘ. প্রকৃতির ভয়াবহতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনিন্দ্য সুন্দর দেশ বাংলাদেশ। এদেশের কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্র আবার কোথাওবা বিভোল চিত্তে ছুটে চলা ঝরনা। বাংলার এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য শুভ্র এবং তার বন্ধুরা সেবার ছুটে গিয়েছিল পার্বত্য জেলা বান্দরবানে। সেখানে তারা দেখেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ছিটকে পড়া চলমান ঝরনার জলধারা। ঝরনার অবিরাম জলধারা মানব হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করে। পতিত এ জলরাশির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব এককথায় অপূর্ব। শুভ্রর ভাবনায়, প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যের আধার ঝরনা।

ক. বাংলা সাহিত্যে 'ছন্দের রাজা' বলে কে পরিচিত?
খ. 'শঙ্কা নাই, সমান যাই' –বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।
ঘ. 'ঝরনার গান' কবিতার মূলভাব প্রকাশ করায় উদ্দীপকের সাফল্য বিচার করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে ছন্দের রাজা বলে পরিচিত।

খ. 'শঙ্কা নাই, সমান যাই' বলতে ঝরনার নির্ভয় ও শঙ্কাহীন চলার গতিকে বোঝানো হয়েছে।

প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এ পৃথিবী। এর মধ্যে একটি অনিন্দ্য উপাদান ঝরনা। স্তব্ধ পাথরের বুকে এক আনন্দের চিহ্ন ঝরনা। দৈত্যের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে ভয় দেখানো পাহাড় থেকে নেমে আসে ঝরনা। তার আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে ধেয়ে আসে সাদা জলরাশির ধারা। চপলা, চঞ্চলা এ ঝরনা ভয় কাকে বলে জানে না। সে জানে না চলার গতি থামাতে বা কমাতে। তাই ঝরনা তার চলার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছে, 'শঙ্কা নাই,সমান যাই'।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার নানা বিষয়ে মিল রয়েছে।

প্রকৃতি সৌন্দর্যের এক অনুপম আধার। সে তার নানা আয়োজনে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শৈলপ্রপাত, ঝরনা তার অন্যতম উদাহরণ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে শুভ্র এবং তার বন্ধুরা দেখেছে পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া চলমান ঝরনার অবিরাম ধারা। ঝরনার অনিকেত জলধারা তাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করেছে। তাদের কাছে এ ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব অপূর্ব মনে হয়েছে। অন্যদিকে 'ঝর্ণার গান' কবিতায় ঝরনা নিজেই তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে। সে চঞ্চল পায়ে পুলকিত গতিময়তায় স্তব্ধ পাথরের বুকে আনন্দের পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। সে পর্বত থেকে নেমে আসা আনন্দময় পদধ্বনির সাদা জলরাশির ধারা। গিরি থেকে পতিত এই অম্বুরাশি পাথরের বুকে আঘাত হেনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'ঝরনার গান' কবিতা দুটিরই উপজীব্য প্রাকৃতিক উপাদান এবং এর সৌন্দর্য ও বর্ণবিভা।

পৃথিবীর প্রকৃতি জগতে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র সব উপাদান। প্রত্যেকটি উপাদান তার আপন বৈশিষ্ট্যে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই তা হয়েছে। উদ্দীপক এবং 'ঝরনার গান' কবিতায় আমরা দুটি ঝরনার কারুকার্যময় পথচলা এবং তার সৌন্দর্য উপভোগ করি।

উদ্দীপকে বান্দরবান জেলার একটি ঝরনার কথা বলা হয়েছে। এ ঝরনা পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে পড়া একটি চলমান জলধারা। শুভ্র ও তার বন্ধুদের কাছে ঝরনাটির অবিরাম জলধারা অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস হিসেবে ধরা দিয়েছে। তাদের কাছে ঝরনাটির ধ্বনিমাধুর্য ও বর্ণবৈভব মনোহর মনে হয়েছে। অন্যদিকে 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনা তার আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। এখানে ঝরনা চঞ্চলা চপলা গিরি নন্দিনী। তার পা পুলকিত গতিময়। সে যেন পাথরের বুকে আনন্দের চিহ্ন। এই ঝরনা পাহাড় থেকে আনন্দময় পদধ্বনিতে নেমে আসা এক চঞ্চল সাদা জলরাশির ধারা। এ জলধারার সৌন্দর্য এবং অমিয় স্বাদ তুলনারহিত।

উদ্দীপকে ঝরনার অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য মানব মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার বর্ণনা রয়েছে। উদ্দীপকের বর্ণনাতে পাওয়া যায় সৌন্দর্যপিপাসু মনের আত্মার খোরাক। অপরদিকে 'ঝরনার গান' কবিতায় ঝরনার চলার পথের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা ফুটে উঠেছে। পাহাড়, শিলা, বন, টিলা, বুলবুলি পাখি ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক উপাদানে পূর্ণ করে কবি তার কবিতাটিকে গড়ে তুলেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'ঝরনার গান' কবিতার মূলভাব তুলে ধরতে সফল হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে বিচিত্র উপাদানে সজ্জিত করেছেন। এর অন্যতম নিদর্শন হল ঝরনা। ঝরনা পুলকিত গতিময় ছন্দে পৃথিবীর বুকে পদচিহ্ন এঁকে ছুটে চলে। তার চঞ্চল ও আনন্দময় পদধ্বনিতে পর্বত থেকে নেমে আসে সাদা জলরাশি। পাহাড় থেকে পতিত এই জলরাশি পৃথিবীর বুকে এক মোহনীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সত্যিই, পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর এক উপাদান ঝরনা।

ক. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কে?

খ. কেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের রাজা' বলা হয়?

গ. কোন দিক দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঝরনার গান' কবিতার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে 'ঝরনার গান' কবিতাটির একটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়েছে, পুরো অংশের প্রতিফলন ঘটেনি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ   ২. ক   ৩. গ   ৪. ঘ   ৫. গ   ৬. গ   ৭. ক   ৮. ক

মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচিতে যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও প্রায় চার হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *অগ্নি-বীণা*, *বিষের বাঁশী*, *সাম্যবাদী*, *সর্বহারা*, *ফণিমনসা*, *ছায়ানট*;
উপন্যাস : *বাঁধনহারা*, *কুহেলিকা*, *মৃত্যুক্ষুধা*;
গল্প : *ব্যথার দান*, *রিক্তের বেদন*;
প্রবন্ধ : *যুগবাণী*, *রুদ্রমঙ্গল*, *দুর্দিনের যাত্রী*, *রাজবন্দীর জবানবন্দী*।

ভূমিকা

'মানুষ' কবিতাটি বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সম্পাদনা করে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটিতে মানব সেবার মধ্য দিয়েই যে মনুষ্যত্বের বড় পরিচয় নিহিত রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মহিমা, ধর্মগ্রন্থ ও আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে মানুষের গুরুত্ব এবং সমাজের তথাকথিত মোল্লা পুরোহিতদের স্বরূপ উন্মোচন করে কবি তার সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই কবিতাতে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সাম্যের ধারণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্মের বরাতে যারা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে, তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

গাহি সাম্যের গান –
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে–ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো !'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ–
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন !'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমিররাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !'
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, – অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা–'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে ! নমাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারি কহিল, 'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল–'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে–
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু।
তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !'
কোথা চেঙ্গিস, গজনি মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার !
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয় !

(সংক্ষেপিত)

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অভেদ– অভিন্ন; নির্বিশেষে। ***আজারি–*** রুগ্‌ণ; ব্যথিত। **কপাট–** দরজার পাল্লা। ***কালাপাহাড়–*** প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ; রাজনারায়ণ; কারো কারো মতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেক দেবালয় ধ্বংস করেছেন। যারা পবিত্র উপাসনালয়ের দরোজা বন্ধ করে তাদের ধ্বংসের জন্য কবিতায় কালাপাহাড়কে আহ্বান জানানো

হয়েছে। ***ক্ষুধার ঠাকুর–*** ক্ষুধার্ত মানুষকে দেবতাজ্ঞান করা হয়েছে। যেমন 'অতিথি নারায়ণ'। ***ক্ষুধার মানিক জ্বলে–*** ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জঠরজ্বালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ***গজনি মামুদ–*** গজনির সুলতান মাহমুদ। তিনি সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালান। এখানে তাঁকে উপাসনালয়ের ভণ্ড দুয়ারিদের ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। ***গো-ভাগাড়–*** মৃত গরু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। ***চেঙ্গিস–*** চেঙ্গিস খান; মঙ্গোলীয় দুর্ধর্ষ নেতা। **জ্ঞাতি–** সগোত্র; স্বজন; একই বংশে জাত ব্যক্তি। ***ঠাকুর–*** দেবতা। **তিমির রাত্রি–** অন্ধকার রাত। ***তেরিয়া–*** উদ্ধতভাবে; উগ্রভাবে। **দ্বার–** দরজা; দুয়ার। ***পান্থ–*** পথিক। ***পুরুত–*** পুরোহিত; পূজার্চনা পরিচালনার মুখ্য ব্যক্তি। **পূজারী–** পূজাকারী; উপাসক; পুরোহিত। ***ফুকারি–*** চিৎকার করে। ***বর–*** আশীর্বাদ; কারো কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয়। **ভজনালয়–** উপাসনার গৃহ বা ঘর। **ভণ্ড–** কপট; ভানকারী। ***ভুখারি–*** ক্ষুধার্ত ব্যক্তি। ***মহীয়ান–*** অতি মহান। **মুসাফির–** সফরকারী; পথিক; আগন্তুক। **শিরনি–** মুসলমান বা হিন্দু কর্তৃক সত্যপীর বা অন্য পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য আটা, ময়দা, চিনি, কলা, পায়েস ইত্যাদির তৈরি ভোগ বিশেষ; ফিরনি। **শীর্ণ-গাত্র–** রোগা শরীর পাতলা দেহ। ***সাম্য–*** সমতা।

সারসংক্ষেপ :

মানব-সমাজে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের ভেদ আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হল: মানুষ হিসেবে সবাই সমান। ক্ষুধার্ত পথিক খাবার চেয়েছিল মন্দিরে। সাতদিনের উপবাসী এই পথিকই পরে গিয়েছিল মসজিদে। পর্যাপ্ত খাবার ছিল। কিন্তু মন্দিরের পূজারী আর মসজিদের মোল্লা খাবার দেয়নি। এটা ধর্মসম্মত নয়। স্বার্থের জন্য কেউ কেউ ধর্মের নীতি লঙ্ঘন করে। তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। মানুষের মর্যাদা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মানুষ' কবিতায় মুসাফির কতদিন অভুক্ত ছিল?
   ক. একদিন খ. তিনদিন
   গ. পাঁচদিন ঘ. সাতদিন

২. 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা' পঙ্‌ক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
   ক. সংশয় খ. উৎসাহ
   গ. বিরক্তি ঘ. আনন্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা কে দেয় থুথু ওই গায়ে,
হয়তো তোমায় স্তন দিয়েছে সীতাসম সতী মায়ে।'

৩. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় যেখানে সাদৃশ্য রয়েছে–
   ক. মানুষকে ঘৃণা না করা খ. ধর্মই সবার উপরে
   গ. সমাজের উন্নয়ন ঘ. পুরোহিতের ঈশ্বর ভক্তি

৪. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–
   i. মানবিকতা ii. সহযোগিতা iii. সহমর্মিতা

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কালা পাহাড়ের প্রকৃত নাম কী?
   i. রাজচন্দ্র ii. রাজকৃষ্ণ iii. রাজনারায়ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　　　খ. ii　　　　গ. iii　　　　ঘ. উপরের সব কয়টি

৬. ‘ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা?’ –বাক্যটিতে মোল্লার কোন বক্তব্য প্রকাশ পায়?

ক. অসহায়ত্ব　　　　খ. আবেদন　　　　গ. ঘৃণা　　　　ঘ. নিষ্ঠুরতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।’

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা হল–

ক. প্রাণ　　　　খ. অন্ধবধূ　　　　গ. সেইদিন এই মাঠ　　　　ঘ. মানুষ

৮. উদ্দীপক ও ‘মানুষ’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে–

i. মানুষের মনুষ্যত্ববোধ　　　　ii. পুরোহিতের ঈশ্বর ভক্তি　　　　iii. পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　　　খ. ii　　　　গ. iii　　　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাই নে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,তাহলেই হবে। দুঃখী মানুষের ছোট ছোট দুঃখ দূর করা, অসহায় মানুষের মনে আশা জাগানো, কিংবা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো ছোট ছোট উপকারে ব্রতী হওয়ার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে।

ক. ‘তেরিয়া’ অর্থ কী?

খ. ‘অভেদ ধর্মজাতি’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি ‘মানুষ’ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘মানুষ’ কবিতায় চেতনাগত দিক থেকে অভিন্নতা রয়েছে।” –বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. ‘তেরিয়া’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে উদ্ধত বা উগ্র।

খ. ‘অভেদ ধর্মজাতি’ বলতে এখানে কবি পৃথিবীর সকল মানুষের এক ও অভিন্ন ধর্মকে বুঝিয়েছেন।
‘মানুষ’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক ধর্মের। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে তিনি অস্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। তারা একই রক্ত-মাংসের তৈরি। মানুষের সব থেকে বড় পরিচয় সে মানুষ। আর মানুষের একটাই ধর্ম তা হচ্ছে মানব ধর্ম। বস্তুত কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘মানুষ’ কবিতায় ‘অভেদ ধর্মজাতি’ বলতে মানুষের এই অভিন্নতাকে বুঝিয়েছেন।

গ. মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ভাবনার দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে ‘মানুষ’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।
পৃথিবীতে মানুষ মানুষের জন্য। এখানে সকল মানুষের সমভাবে ভোগের ও বাঁচার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে সমদায়িত্বসম্পন্ন হতে হয়। কেউ যদি এখানে দায়িত্বে অবহেলা করে তবে সমাজে নেমে আসে বিষাদের কালোরাত্রি।
উদ্দীপকে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে বিপন্ন মানুষটিরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। আর এক্ষেত্রে সমাজে যারা সক্ষম তাদের উদার মানসিকতায় এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করে দাও। অসহায় মানুষটির প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। তাদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখ। বিপন্ন মানুষের মনে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়ে তোল। ‘মানুষ’ কবিতায়ও অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে প্রতিবাদের ভাষায় বলা হয়েছে, মন্দির-মসজিদ পুরোহিত ও মোল্লারা দখল করে বসে আছে। সেখানে নিরন্ন মানুষেরা খাবার পায় না। কবি বলেছেন, ঐ ভজনালয়ের বদ্ধ দ্বার হাতুড়ি-শাবল দিয়ে খুলে

ফেলতে। আর সেখান থেকে খাবার এনে দরিদ্র অসহায় মানুষের মুখে তুলে দিতে। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে নিরন্ন অসহায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। সুতরাং এদিক থেকে বলা যায় উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই অসহায় ও বিপন্ন। তাদের এ অসহায় অবস্থা দূর করার দায়িত্ব সমাজের সক্ষম ব্যক্তিদের। আর এ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।
উদ্দীপকে মানবতার প্রতি উদার আকুতি জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। এভাবে বিপন্ন মানুষের উপকার ও দুঃখী মানুষের ছোট ছোট দুঃখ দূর করায় মানবাত্মা জাগ্রত হয় এবং মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। কবি কাজী নজরুল ইসলামও 'মানুষ' কবিতায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে তার প্রতিপক্ষ ছিল নিষ্ঠুর ও স্বার্থবাদী মোল্লা শ্রেণি। তারা মসজিদ ও মন্দিরে দান হিসাবে পাওয়া গোশত-রুটি ও প্রসাদ-মিষ্টান্ন একাই দখল করে বসে আছে। তারা অন্নহীন ভুখা মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। মন্দির ও মসজিদে দুয়ার বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। কবি তার প্রতিবাদী ভাষায় এসব অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মসজিদ-মন্দিরের দুয়ার খুলে এসব নিরন্ন মানুষকে খাবার দিতে বলেছেন। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাতে বলেছেন। অবশ্য কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় প্রতিবাদের চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে।
উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতায় মানুষের মনুষ্যবোধের জাগরণ কামনা করা হয়েছে। কেননা মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। অতএব,উদ্দীপক এবং 'মানুষ' কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চেতনাগত দিক থেকে এ দুটোর মধ্যে অভিন্নতা রয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমরা সকল দেশের, সকল জাতির সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি-ধর্মের-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

ক. দুয়ারে কে দাঁড়িয়েছিল?
খ. 'ঐ মন্দির পূজারীর,হায় দেবতা, তোমার নয়।' –কেন?
গ. উদ্দীপকে 'মানুষ' কবিতার যে বিপরীত দিকগুলো ফুটে উঠেছে তা তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'মানুষ' কবিতা মানুষের জয়গানে মুখরিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

সেইদিন এই মাঠ

জীবনানন্দ দাশ

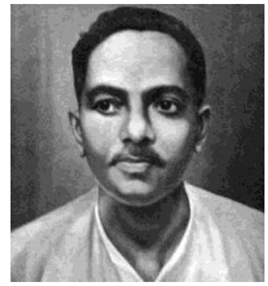

কবি পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ও মাতা কুসুমকুমারী দাশ। কুসুমকুমারী দাশও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'– এখনো জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য। জীবনানন্দ দাশ ১৯১৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স ও ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে বাংলা ভাষার 'শুদ্ধতম কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস ও ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছেন, যার একটিও জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *ঝরা পালক*, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, *বনলতা সেন*, *মহাপৃথিবী*, *সাতটি তারার তিমির*, *রূপসী বাংলা*।

উপন্যাস : *মাল্যবান*, *সুতীর্থ*।

প্রবন্ধ : *কবিতার কথা*।

ভূমিকা

'সেইদিন এই মাঠ' কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। সভ্যতার ধ্বংস ও বিনির্মাণে আপন মহিমা ও সৌন্দর্য নিয়ে মানবের সেবাদাত্রী প্রকৃতির অমরত্বের দিকটি এই কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে অমরত্ব লাভে কবি অনুপ্রাণিত করেছেন। পৃথিবীর বহমানতা মানুষের সাধারণ মৃত্যু ঠেকাতে না পারলেও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে অনন্তকাল– এ-কথাটাই কবি নান্দনিকতার সাথে কবিতাটিতে তুলে ধরেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- প্রকৃতির কিছু উপাদেয় উপাদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- মানব-অভিজ্ঞতার ক্ষণস্থায়ী আর চিরন্তন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন –
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে ?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে ?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে !

চারিদিকে শান্ত বাতি – ভিজে গন্ধ – মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল; –
এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আমি চলে যাব বলে ... লক্ষ্মীটির তরে– পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেক মানুষকেই এক সময় চলে যেতে হয়। কিন্তু শিশিরের জলে চালতা ফুল ভিজে যে রহস্যময় সৌন্দর্য ও আনন্দের বিস্তার করে চলে যুগ-যুগান্তে তার কোনো অবশেষ নেই। আর সেই শিশিরের জলে ভেজা চালতা ফুলের গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকবে অনন্তকালব্যাপী। কবির এই বোধের মধ্যে প্রকৃতির এক শাশ্বতরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেখানে লক্ষ্মীপেঁচাটির মমত্বের অনুভাবনাও ধরা দিয়েছে অসাধারণ এক তাৎপর্যে। **কলরব–** কোলাহল। ***এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে–*** মানুষের গড়া পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। এশিরীয় ও বেবিলনীয় সভ্যতা এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রকৃতি তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় হয়ে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আস্বাদ মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, তার অন্তর্গত অফুরন্ত সৌন্দর্য কখনই শেষ হয় না। আলোচ্য অংশে জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির এই চিরকালীন সৌন্দর্যকে বোধের এক বিস্ময়কর শক্তিতে উপস্থাপন করেছেন। **চর–** নদীতে পলি জমে গঠিত ভূভাগ। **নক্ষত্র–** তারা। **মৃদু–** কোমল; ক্ষীণ; অনুচ্চ। **স্তব্ধ–** নিশ্চল, নিস্পন্দ। ***সেইদিন এই মাঠ ... কবে আর ঝরে–*** জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্য তাঁর কবিতার মূলগত প্রেরণা। তিনি জানেন বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর রূপ-রস-গন্ধ কখনই হারিয়ে ফেলবে না। তিনি যখন থাকবেন না তখনও প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে মানুষের স্বপ্নসাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে যাবে। আলোচ্য অংশে কবি প্রকৃতির এই মাহাত্ম্যকে গভীর তৃপ্তি ও মমত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

সারসংক্ষেপ :

কবি যখন থাকবেন না, তখনো পৃথিবীতে স্বপ্ন রয়ে যাবে। খোলা আকাশের নিচে নদী তখনো স্বপ্ন দেখবে। কারণ, সুন্দর স্বপ্নের সাধ শেষ হওয়ার নয়। ব্যক্তির মৃত্যু হলেও রয়ে যাবে সুন্দর দৃশ্যগুলো। চালতাফুল শিশিরের জলে ভিজবে। লক্ষ্মীপেঁচা গান গাইবে। প্রকৃতির যেসব সুন্দর মানুষের জীবনকে মধুর করে তোলে, সেগুলো চিরকালীন। মানুষের তৈরি সভ্যতা কিন্তু সময়ের প্রবাহে ধ্বংস হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি জীবনানন্দ দাশের মায়ের নাম কী?

ক. কুসুমকুমারী দাশ খ. সবিতা ভট্টাচার্য
গ. নবনীতা দেবসেন ঘ. আশালতা দাশ

২. 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার মূলভাব হচ্ছে–
ক. মানব সভ্যতার পরিণতি
খ. প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরস্থায়ী
গ. প্রকৃতির সৌন্দর্য নশ্বর
ঘ. জীবাত্মা রহস্যময়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আবার আসিব আমি বাংলা নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

৩. উদ্দীপকের অনুভূতি নিচের কোন রচনায় প্রকাশিত হয়েছে?
ক. অন্ধবধূ
খ. আমার সন্তান
গ. সেইদিন এই মাঠ
ঘ. সোনার তরী

৪. উদ্দীপক ও আপনার পাঠ্য কবিতায় যে অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে–
i. স্মৃতিকাতরতা
ii. প্রকৃতিপ্রেম
iii. সমাজ সচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. লক্ষ্মীপেঁচা কার জন্য গান গাইবে?
ক. ডাহুক
খ. মাছরাঙা
গ. শ্যামপেঁচা
ঘ. লক্ষ্মী

৬. 'এই নদী নক্ষত্রের তলে' বলতে কবি যা বুঝিয়েছেন–
ক. সমগ্র পৃথিবীকে
খ. সমগ্র চন্দ্রকে
গ. সমগ্র মহাকাশকে
ঘ. সাত সাগর তের নদীকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পৃথিবীর নর-নারীর সুখ-দুঃখ-বিরহ যদি ঠিকভাবে তাঁর সৃষ্টিতে ঠাঁই পায়, তবেই তিনি অমর হবেন।

৭. উদ্দীপকের ভাবের সাথে মিল রয়েছে কোন বাক্যের?
i. সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি–
ii. পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল
iii. আমি চলে যাব বলে চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপক ও বাক্যটিতে সাদৃশ্যের কারণ যে বিষয়ে–
ক. ঐতিহ্য
খ. প্রকৃতি
গ. নিত্যতা
ঘ. ধ্বংস

সৃজনশীল প্রশ্ন :

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে
বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি–
চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের হিজলের অশ্বত্থের
করে আছে চুপ
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।

ক. কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ কী রকম?
খ. 'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল।' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধরুন।
ঘ. "উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেম 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায়ও অনুরণিত হয়েছে।" –মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি জীবনানন্দ দাশের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এক অনন্য রূপসী।

খ. পৃথিবীতে প্রকৃতি চিরকালীন। এখানে সুন্দরের সাধনা, নতুনের আরাধনা চিরকাল চলতে থাকে। পৃথিবীতে কখনো সুন্দরের অভিপ্রায় ও স্বপ্নের আবাহন শূন্য হয় না। সে তার আপন রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে। আলোচ্য চরণটিতে এটিই বলা হয়েছে।
প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সে কখনোই তার আপন রূপ-রস-গন্ধ হারিয়ে ফেলে না। সে সব সময়ই তার নিজ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে চিরকাল প্রাণময় থাকে। প্রকৃতির যে রহস্যময় সৌন্দর্য ও আনন্দের বিস্তার তার কোনো অবশেষ নেই। প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র গন্ধের আস্বাদ, মৃদুমন্দ কোলাহলের আনন্দ, কিংবা পুষ্পের সৌন্দর্য কখনোই শেষ হয় না। প্রকৃতির এইসব সৌন্দর্যই গল্প হয়ে পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

গ. প্রকৃতির যে অপরূপ রূপ লাবণ্য 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, তাই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।
প্রকৃতি চিরন্তন সৌন্দর্যের আধার। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সবকিছুই প্রকৃতির অংশ। গাছপালা, নদীনালা, আকাশ, বাতাস সবকিছুই প্রকৃতির অনুষঙ্গী। প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনো শেষ হয় না, কখনো শেষ হবে না। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের সুন্দরকে। প্রকৃতি নিজস্ব নিয়মে মানুষের স্বপ্ন-সাধ ও কল্পনাকে তৃপ্ত করে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা এবং উদ্দীপকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।
উদ্দীপকের কবির নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়েছে শাশ্বত রূপ নিয়ে। এখানে কবি খুব ভোরে জাগ্রত হন। চারিদিকে নিশ্চুপ। ভোরের পাখিরা তখনো ডেকে ওঠেনি। বড় একটা পাতার নিচে বসে আছে দোয়েল পাখি। তার উপস্থিতি কবির চিত্তে সৌন্দর্যের বান ডাকে। উপরন্তু গ্রামবাংলার পল্লবের স্তূপ কবির সত্তাকে উজ্জীবিত করে। 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কবিও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। শিশিরের জলে চালতা ফুলের ভিজে ওঠার দৃশ্য কবিকে আনমনা করে। লক্ষ্মীপেঁচা যখন তার প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে গান ধরে তখন কবি একজন মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে যান। কখনো বা চরের কাছে খুঁটিতে বাঁধা নৌকা কবিকে উদাসীন করে তোলে। এভাবে দেখা যায় প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার বিষয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. প্রকৃতির গতিময়তা এবং অবিনশ্বর সৌন্দর্য চেতনা 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতা এবং উদ্দীপকের মূল উপজীব্য।
পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আজও তা প্রবহমান। প্রকৃতিও নিজস্ব নিয়মে গতিমান। প্রকৃতির এই স্বভাবধর্মকে কেউ উপলব্ধি করে, আবার কেউ এদিকে নজর দেয়না। পৃথিবীতে প্রকৃতি অনবরত সৃষ্টি আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এভাবেই তার ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যেমন মানুষ এ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়। এতে প্রকৃতির ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।
উদ্দীপকের কবি সৌন্দর্যপিপাসু। তিনি ভোরে দোয়েল পাখি দেখেন। ডুমুরপাতার নিচে বসে থাকে দোয়েল। দোয়েলের মাথার উপর ডুমুর পাতাকে কবির ছাতা বলে মনে হয়। চারিদিকে তিনি পল্লবের স্তূপ দেখেন। আর দেখেন আম-জাম-বট-অশ্বত্থ গাছের সমাহার। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের ছায়া পড়েছে ফণীমনসার ঝোঁপে। অন্যদিকে 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতার কবিও প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন অনুপম রূপে। এখানে খেয়া নৌকাগুলো চরের খুব কাছে এসে থামে। চারিদিকে থাকে শান্ত বাতি। লক্ষ্মীপেঁচা তার প্রিয়ার জন্য গান গায় আর কবি তা আনমনে শোনেন। কখনো বা চালতা ফুল শিশিরের জলে ভিজে উঠলে এর গন্ধের ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে।
উদ্দীপক ও 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় আদি এবং অকৃত্রিমরূপে কেবল প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা এবং উদ্দীপকে আমরা প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোনো অনুষঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করি না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রকাশিত প্রকৃতিপ্রেম 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আরও অনেক গাছ পাতা-লতা
নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা
অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত
ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতো
শান্তি।

ক. জীবনানন্দ দাশ কোন জীবনচেতনার কবি হিসাবে পরিচিত?
খ. ‘এশিরিয়া ধুলো আজ – বেবিলন ছাই হয়ে আছে।’ কেন? বুঝিয়ে বলুন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সেই সব দিন এই মাঠ’ কবিতার সাদৃশ্যগুলো নিজের ভাষায় তুলে ধরুন।
ঘ. “প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘সেই সব দিন এই মাঠ’ কবিতার প্রকৃতি বর্ণনায় যেন একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে।” –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. খ ৮. গ

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

পল্লিজননী

জসীমউদ্‌দীন

কবি পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলবি আনসার উদ্দিন মোল্লা ও মা আমিনা খাতুন। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ ও এমএ পাশ করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত 'কবর' কবিতা এবং এই কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ-দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'পল্লিকবি'। তিনি গান, নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাখালী*, *নকসী কাঁথার মাঠ*, *বালুচর*, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, *এক পয়সার বাঁশী*;

উপন্যাস : *বোবাকাহিনী*;

গদ্যরচনা : *চলে মুসাফির*, *বাঙালির হাসির গল্প*, *জীবন কথা*, *হলদে পরির দেশে*।

ভূমিকা

পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'পল্লিজননী' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে পল্লির আর্থ-সামাজিক করুণ অবস্থার পাশাপাশি মায়ের স্নেহার্দ্রতার কথা বলা হয়েছে। এখানে সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা, মুমূর্ষু সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের আকুতি কবি তুলে ধরেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লিজননী' কবিতা পড়ে আপনি –

- গ্রাম-বাংলার দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে পারবেন;
- সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পল্লিবালকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের বিবরণ দিতে পারবেন;
- গ্রাম-বাংলার নিপুণ উপস্থাপনায় জসীমউদ্‌দীনের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রামের গরিব মায়ের মুমূর্ষু সন্তানের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সেবারত মায়ের উদ্বেগের ধরন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর–ঘোর–আন্ধার,
নিশ্বাস ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন ভন ভন জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান
এদো ডোবা হতে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু,
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয়, ‘মারে, কত রাত আছে, কখন সকাল হবে,
ভালো যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে।’
মা কয়, ‘বাছারে ! চুপটি করিয়া ঘুমোত একটি বার’,
ছেলে রেগে কয়, ‘ঘুম যে আসে না কি করিব আমি তার।’
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভালো করে দাও আল্লা রসুল ভালো করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন নীর !
বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো, রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারির বন হেলি।
চলে বুনো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
দুঃ ছাই ! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে,
বালাই বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আন্ধার– অন্ধকার। **কানাকুয়ো–** এক প্রকারের পাখি। **গণিছে–** গননা করছে। **নিঝুম–** সম্পূর্ণ নীরব। **পরান–** প্রাণ। **মশক–** মশা। **রুগ্ণ–** পীড়িত; অসুস্থ। **শঙ্কায়–** আশঙ্কায়; ভীতিতে। **শিয়রে–** শয়নকারীর মাথার দিকে। **সাড়া–** শব্দ। **হিয়া–** হৃদয়; মন।

সারসংক্ষেপ :

থমথমে নিঝুম আঁধার রাত। গাঁয়ের এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে মা রুগ্ণ সন্তানের সেবায় রাত জাগছেন। ছেলেটি ঘুমাতে পারছে না। ক্লান্তির রাত আর কাটছে চাইছে না। মাও জেগে আছেন গভীর উদ্বেগ নিয়ে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলের গায়ে। ছেলের রোগমুক্তির জন্য দরগায়-মসজিদে দানের নিয়ত করছেন। বাইরে শীতরাতের প্রতিকূল প্রকৃতি। কুয়াশাঢাকা জোনাকি, বাদুড়ের আওয়াজ, রাতজাগা পাখির ডাক। অজানা আশঙ্কায় মায়ের মন শিহরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'পল্লিজননী' কবিতায় কয়টি পাখির নাম পাওয়া যায়?
   ক. তিনটি   খ. দুইটি   গ. চারটি   ঘ. পাঁচটি

২. 'পল্লিজননী' কবিতায় মায়ের কোন ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে?
   ক. স্নেহের   খ. সেবার   গ. অর্থের   ঘ. শাসনের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'এই যে মায়ের কোল, ভয় কীরে বাপ
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জ্বরতাপ।'

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'পল্লিজননী'র চরণটি হল–
   i. বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারির বন হেলি।
   ii. করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা।
   iii. পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে হাত

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি হল–
   i. স্বজন হারানোর আশঙ্কা   ii. প্রিয়জনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা   iii. অপত্য স্নেহের অনিবার্য প্রকাশ

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. ii   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও ii

পাঠ–২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গরিব পল্লিবালকের স্বপ্ন ও আনন্দের বর্ণনা লিখতে পারবেন;
- দরিদ্র পল্লিজননীর মাতৃস্নেহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

ছেলে কয়, 'মাগো, পায়ে পড়ি বল ভালো যদি হই কাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে নাত তুমি গাল।
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া,
এখনি আমারে এত রোগ হতে করিতে পারেত খাড়া ?'
মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে,
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
'শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি সিকা ভরে।

খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে।
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।'
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকি আলোয় থম থম কাল রাত।
রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে,
কোন দিন সে যে মায়েরে না বলে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হয়ে গেল তবু আসে নাকো, আই চাই মার প্রাণ,
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে।
কত কথা আজ মনে পড়ে তার, গরীবের ঘর তার,
ছোটখাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা, মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম যে গেল ? আজিজ চলিল ? এমনি প্রশ্ন মালা,
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।
ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হায় হাঁকে মায়, দূর–দূর।
পচা ডোবা হতে বিরহিণী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি',
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্ণ ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আড়ঙের দিনে– আড়ঙ হলো হাট বা বাজার বা মেলা। আড়ঙের দিনে মানে হলো মেলার দিনে বা হাটের দিনে বা বাজারের দিনে। **চোঁয়া–** বিন্দু বা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া। **দূত–** সংবাদ বহনকারী; বার্তাবহ। ***নয়নের নীর–*** চোখের পানি। ***নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে–*** নামাজের ঘর হলো মসজিদ, মোমবাতি মানে অর্থ হলো মোমবাতি দেওয়ার মানত করা। কোনো অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে এ দেশের মানুষ তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অভিপ্রায়ে এক ধরনের মানত করে। 'নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে' অর্থ হলো মসজিদে মোমবাতি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা বা মানত করা। ***পচান–*** পচে গেছে এমন। **পথ্য–** রোগির জন্য উপযুক্ত আহার্য। **বায়না–** আবদার। **বিরহিণী–** বিরহে কাতর নারী। **মহাকাল–** ভাবীকাল; অনন্তকাল। **যতন–** যত্ন। ***রহিম চাচার ঝাড়া–*** আমাদের দেশে রোগ-বালাই থেকে মুক্তি লাভের জন্য পানি পড়া, ঝাড়-ফোকের প্রচলন আছে। নানা ধরনের অসুখে অনেকে পানি পড়ে তা রোগিকে খেতে দেয়, রোগ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে। 'রহিম চাচার ঝাড়া' মানে হলো রহিম চাচার সেই রকম একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যাতে 'রহিম চাচা' রোগি ছেলেটিকে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করে তুলবে। **লাটাই–** নাটাই; যাতে ঘুড়ির সুতা জড়ানো থাকে। **সমুখ–** সামনে। **হর্ষে–** আনন্দে।

সারসংক্ষেপ :

ভালো হয়ে পরদিনই খেলতে যাবে – মায়ের কাছে এ আবদার জানায় ছেলেটি। তার রোগে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা হয়নি। সে আশা করে, রহিম চাচার ঝাড়-ফুঁকে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। গ্রামের দুরন্ত কিশোর সে। হৈ-হুল্লোড়ে কাটত তার সারাদিন। অসুস্থ ছেলের সেই চঞ্চলতার সুযোগ নেই। পুত্রের শিয়রে বসে বিমর্ষ মা সেসব কথাই স্মরণ করেন। দারিদ্র্যের কারণে ছেলের অনেক চাওয়া তিনি পূরণ করতে পারেননি। আর এখন তো বিনা চিকিৎসায় সে মরতে বসেছে। রাতের প্রকৃতি মায়ের মনের শঙ্কা বাড়িয়ে দেয় শতগুণ। পাশে রাখা মাটির প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। নিরুপায় মাও যেন ছেলের মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৫. অকল্যাণের সুরে কে ডাকে?
ক. হুতোম খ. শালিক গ. জোনাকি ঘ. কাক

৬. ‘ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়েছিলি এমনি এ কালি সাঁঝে?’ এখানে ‘মুখপোড়া’ বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. মিত্রকে খ. হনুমানকে
গ. শত্রুকে ঘ. ছেলেকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কিশোর বুধা খেলার ছলে কাকতাড়ুয়া সাজে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তার বাড়ি ফেরার কোনো নাম থাকে না। এদিকে মা অধীর হয়ে পথ চেয়ে থাকেন। একসময় দেখা যায় বুধা তার বন্ধুর সঙ্গে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে নিম্নের যে চরণটির–
i. বালাই বালাই, ভালো হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ii. রাখিও ট্যাঁপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত-নরি সিকা ভরে।
iii. হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৮. উদ্দীপক ও ‘পল্লিজননী’ কবিতায় যে বিষয়টি অভিব্যক্ত হয়েছে–
ক. ছেলের বখাটেপনা খ. ছেলের দুরন্তপনা গ. ছেলের অবাধ্য হওয়া ঘ. ছেলের চালাকি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ‘কানাকুয়ো’ কোথায় থাকে?
ক. বটগাছে খ. বাঁশবনে গ. সুন্দরবনে ঘ. তালগাছে

১০. ‘সাত-নরি’ বলতে যা বোঝানো হয়েছে–
ক. মাটির ঘড়া খ. ঘড়া রাখার সিকা গ. মাটির হাঁড়ি ঘ. হাঁড়ি রাখার সিকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘তুই আমার ছেলে,তুই আমার মেয়ে,তুই আমার সব।’ বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

১১. উদ্দীপকে ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–
ক. অনুযোগ খ. অসহায়ত্ব গ. মাতৃস্নেহ ঘ. আকুতি

১২. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি নিচের যে চরণে বিদ্যমান–
i. পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত

ii. ভালো করে দাও আলা রাসুল ভালো করে দাও পীর

iii. শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

শমসের চৌধুরী দেশের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। কিন্তু তার মন ভালো নেই। তার একমাত্র ছেলে আবির দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। দেশের নামকরা ডাক্তার দিয়ে তিনি ছেলের চিকিৎসা করিয়েছেন। দেশ-বিদেশের অনেক ঘাটের পথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ছেলের জন্য তিনি নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেছেন, দরগায় করেছেন দান। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তিনি ছেলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। রসুলকে স্মরণ ও পিরের নিকট দোয়া কামনা করেছেন।

ক. জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে কোন ধারার কবি হিসেবে খ্যাত?

খ. মা রাত্রি জাগে কেন?

গ. উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? −আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিলের চেয়ে অমিলটিই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।" −উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

ক. 'হুড়োম' কী?

খ. 'রহিম চাচার ঝাড়া' বলতে কী বোঝায়?

গ. কোন দিক থেকে উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার সঙ্গে সদৃশ কিংবা বিসদৃশ? −আলোচনা করুন।

ঘ. "অকৃত্রিম মমত্ববোধই উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার বিষয়বস্তু।" −বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক. জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে 'পল্লিকবি' হিসাবে খ্যাত।

খ. সন্তানের অসুস্থতার কারণে মা তার শিয়রে বসে আছেন।
'পল্লিজননী' কবিতায় ছেলেটি দীর্ঘদিন ধরে রুগ্‌ণ। সন্তানের অসুস্থতায় মায়ের মন স্বাভাবিকভাবে ভালো থাকে না। তিনি মনোকষ্টে ভোগেন। ছেলের ঘুম আসছে না বলে তিনি ছেলেকে ঘুম পড়ানোর চেষ্টা করেন। ছেলের প্রতি মমত্ববোধের কারণে মা রাত জেগে রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে আছেন।

গ. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতা উভয়টিতেই সন্তান হারানোর আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে উদ্দীপকটির সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।
পিতা-মাতাই জগতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি মমত্ববোধ পোষণ করেন। তারা কখনোই সন্তানের জন্য অমঙ্গল কামনা করেন না। সন্তানের রোগ-শোক-দুঃখ-বেদনায় তারা সব সময় অস্থির থাকেন। সন্তানের জন্য অজানা আশঙ্কায় তাদের মন কেঁপে উঠে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতা এক চির কল্যাণের আশ্রয়।
'পল্লিজননী' কবিতায় কবি এক দরিদ্র জননীর জীবনের দৃশ্যপট তুলে ধরেছেন। এই মা দরিদ্র। কিন্তু ছেলের জন্য তার অফুরান ভালোবাসা। তিনি তার রুগ্‌ণ ছেলের শিয়রে বসে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলের গালে, মুখে। ছেলের জন্য দরগায় মানত করছেন। আবার অজানা আশঙ্কায় ছেলের জন্য মন গুমরে কেঁদে উঠছে। উদ্দীপকেও আমরা এরকম এক সন্তানবৎসল পিতার পরিচয় পাই। তিনি শমসের চৌধুরী। সন্তানের চিকিৎসার জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ওষুধপত্র সংগ্রহ করেছেন। সন্তানের সুস্থতা কামনায়

তাকে নামাজের ঘরে মোমবাতি এমনকি দরগায় পর্যন্ত দান করতে দেখা যায়। উপরন্তু তিনি নিয়ত আল্লাহর রসুলকে স্মরণ এবং পিরের নিকট দোয়া কামনা করেছেন। এভাবে দেখা যায় 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের আর্তি উদ্দীপকের শমসের চৌধুরীর বেদনারূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি দেখা যায়।

সন্তানের নিকট মায়ের স্নেহ অতুল সম্পদ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মন সব সময় ব্যাকুল থাকে। বিশেষ করে সন্তান অসুস্থ থাকলে মায়ের মন স্বাভাবিক থাকে না। সন্তানের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যেন মায়ের সুখ-দুঃখ মিশে থাকে। কেননা সন্তানের অনুভবের সঙ্গে মায়ের অনুভবের একটি নিবিড় যোগসূত্র থাকে। তাই সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা সবসময় চিন্তিত থাকেন।

উদ্দীপকে শমসের চৌধুরীর ছেলে হারানোর আশঙ্কা প্রকাশিত হযেছে। কিন্তু উদ্দীপকে পল্লি মায়ের মতো জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই। শমসের চৌধুরী একজন শিল্পপতি। দারিদ্র্যের কশাঘাত তার জীবনে নেই। ছেলের জন্য দেশ-বিদেশের চিকিৎসক তিনি অবলীলায় ডাকতে পেরেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলের জন্য ওষুধ-পত্র সংগ্রহ করেছেন। তিনি কখনো ছেলের শিয়রে বসে রাত জাগেননি। দারিদ্র্য কী জিনিস সে সম্পর্কে তার ছেলের কোনো ধারণা নেই। অবশ্য ছেলের জন্য তিনি দরগায় মানত করেছেন, রসুলের স্মরণ নিয়েছেন। পিরের দোয়াও প্রার্থনা করেছেন। অপরদিকে 'পল্লিজননী' কবিতায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক পল্লি মায়ের জীবনের বর্ণনা রয়েছে। তিনি রাত জেগে রোগাক্রান্ত সন্তানের শিয়রে বসে থাকেন। তার কুঁড়েঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বাতাস অবাধে প্রবেশ করে। রোগে তার ছেলের পথ্য জোটে না। শীতের দুরন্ত রাতে কানাকুয়ো পাখির ডাকে মায়ের শঙ্কা বেড়ে যায়।

উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিল রয়েছে মা ও শমসের চৌধুরীর ছেলে হারানোর আশঙ্কায়। সন্তানের প্রতি প্রবল মমত্ববোধের ক্ষেত্রে। কিন্তু জীবন পরিচর্যায় দুজনের বিস্তর ব্যবধান। এ ব্যবধান আর্থ-সামাজিক সকল বিষয়েই রয়েছে। তাই বলা যায়, 'উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় মিলের চেয়ে অমিলই বেশি প্রকাশিত হয়েছে।' –মন্তব্যটি যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক. 'হুড়োম' শব্দের অর্থ মুড়ি অথবা মুড়ির মত ভাজা চিড়া।

খ. 'রহিম চাচার ঝাড়া' একটি গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের দেশে গ্রামীণ সমাজে রোগ-বালাই থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পানি পড়া এবং ঝাড়-ফুঁকের প্রচলন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে যারা চিকিৎসা করেন তারা নানা ধরনের অসুখে রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য পানি পড়ে রোগিকে খেতে দেয়। কখনো কখনো রোগিকে ফুঁ-ও দিয়ে থাকে। 'রহিম চাচার ঝাড়া' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে রহিম চাচার সেই রকম একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যার সাহায্যে তিনি রোগি ছেলেটিকে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করে তুলবেন।

গ. 'পল্লিজননী' কবিতায় বর্ণিত প্লটটি পার্থিব জীবনের, বাস্তব জীবনের রক্ত-মাংসের মানুষ এর কুশীলব। উদ্দীপকের চরিত্রের একটি অংশ অপার্থিব, এর প্রধান চরিত্রটি ঐশ্বরিক। এখানেই উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিজননী' কবিতার বিসদৃশ ভাব হয়েছে।

সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহে বাঙালি জননী তুলনারহিত। মা নিজ জীবনের চেয়ে তার সন্তানকে বেশি ভালোবাসেন। সন্তানের সুন্দর জীবনই তার জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষিত। সন্তানের বিপদ-আপদে তার মন অস্থির হয়ে উঠে। মা সন্তানের মাথার উপর পরম মমতাময় ছায়া। যুগ যুগ ধরে আমাদের সংস্কৃতিতে মায়ের এই স্নেহময় রূপটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। 'পল্লিজননী' কবিতায় এক স্নেহময়ী মায়ের জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি রাত জেগে পুত্রের শিয়রে বসে থাকেন। ছোট কুঁড়েঘরে শীতের শীতল বায়ু থেকে পুত্রকে আগলে রাখেন। পুত্রের সুস্থতা কামনায় নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন, দরগায় দান-খয়রাত করেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। উদ্দীপকেও আমরা দেখি পাটুনীর সন্তানের জন্য অপত্য স্নেহের প্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকে দেবী পাটুনীকে বর দিতে চাইলেও সে নিজের জন্য কিছু চায় না। তার জীবনের চাওয়া হলো সন্তানের একটি প্রশান্তিময় সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় 'পল্লিজননী' কবিতার মায়ের চাওয়া বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আর উদ্দীপকে রয়েছে অলৌকিকের ব্যঞ্জনা। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতার প্রেক্ষণ বিন্দুতে বিসদৃশ ভাব রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও 'পল্লিজননী' কবিতায় অপার মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়েছে।

সন্তানের মঙ্গল কামনা বাঙালি জননীর চির চাওয়া। তার জীবন আবর্তিত হয় সন্তানকে ঘিরে। সন্তানের সুখের জন্য মা তার নিজের সুখকে বিসর্জন দেন। জীবনের সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে মা তার সন্তানকে আগলে রাখেন। বস্তুত মা সন্তানের সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেন। বাঙালি নারীর এ চিরকালীন রূপটিই চির প্রবহমান।

'পল্লিজননী' কবিতায় আমরা সন্তানের জন্য প্রবল মাতৃত্ববোধ ফুটে উঠতে দেখি। একজন মা অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে তার সেবা করছে। তিনি বসে বসে তার শৈশবের কথা স্মরণ করছেন। ছেলের তুচ্ছ আবদারগুলো পূরণ করতে না পারার ব্যর্থতা তাকে কাতর তুলেছে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইছে। তিনি ছেলের সুস্থতা কামনায় নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেছেন, আর দরগায় করেছেন দান। এত কিছুর পরও সন্তানের অকল্যাণ আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়েছেন। উদ্দীপকেও দেখি সন্তানের মঙ্গল কামনায় একটি স্বর্গীয় বাতাবরণ। দেবী পাটুনীকে বর চাইতে বললে সে নিজের জন্য কিছুই চায় না। সে চেয়েছে তার সন্তানের জন্য প্রশান্তিময় জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। উদ্দীপকের পাটুনী চরিত্রটি সন্তান স্নেহের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

আমাদের সমাজ জীবনে মা হিসেবে একজন নারীর অকৃত্রিম স্নেহ ও পরম মমত্ববোধ প্রকাশিত হয় তার সন্তানকে আবর্তন করে। বলা যায়, 'পল্লিজননী' কবিতা ও উদ্দীপক উভয়টিতে বিষয়টি অনুরণিত হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনিন্দ্য জীবনে আজ প্রথম ভাত রাঁধতে গেল। সে না পারল মাড় গালতে, না পারল ভালো করে ভাত বাড়তে। মা একবার নিজে উঠবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মাথা সোজা করতে পারলেন না, বিছানায় গড়িয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে মাতা-পুত্রের একরকম ভাত খাওয়া হল। মা পুত্রকে রান্নার নিয়ম শেখাতে গিয়ে থেমে গেলেন। পুত্রের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে কেবল অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে লাগল।

ক. 'পল্লিজননী' কবিতায় ঘরের চালে কোন পাখি ডাকে?

খ. 'আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি' –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'পল্লিজননী' কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং'পল্লিজননী' কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই অপত্য মাতৃস্নেহ প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ ৯. খ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

বৃষ্টি

ফররুখ আহমদ

কবি পরিচিতি

ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ও মা রওশন আখতার। ১৯৩৭ সালে তিনি খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। তিনি কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এবং সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের স্টাফ রাইটার ছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কবিতায় বাংলার অধঃপতিত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা প্রকাশ পেয়েছে। এজন্য তাঁকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়। ইসলামের আদর্শ তাঁর কাব্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা। কাব্যচর্চার বৈচিত্র্য ও কবি-ভাবনার মৌলিকত্বে কবি ফররুখ আহমদ সমধিক খ্যাত। তিনি তাঁর কাব্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

সাত সাগরের মাঝি, *সিরাজাম্ মুনীরা*, *নৌফেল ও হাতেম*, *মুহূর্তের কবিতা*, *পাখির বাসা*, *হাতেমতায়ী*, *নতুন লেখা*, *হরফের ছড়া*, *ছড়ার আসর*।

ভূমিকা

ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টি সম্পর্কে মনের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। বৃষ্টিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা এবং মানবমনে তার প্রভাব সম্পর্কে কবি এই কবিতায় ধারণা দিয়েছেন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোমল রূপ ফিরিয়ে এনে বর্ষা কীভাবে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। মানুষের অতীত ও বর্তমানের নানা টানাপড়নে বর্ষামুখর দিনের গুরুত্ব কবি তুলে ধরেছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রীষ্মের রুক্ষতা আর বর্ষার প্রাণময় সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের মনে মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বৃষ্টি এলো ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! – পদ্মা মেঘনার
দুপাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরি মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।
দিকদিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার
বর্ষণমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।

রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের মতন
রুক্ষ মাঠ অসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর,
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর ॥

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আবাদি– চাষযোগ্য। **কেয়া–** কেতকী ফুল বা তারগাছ। **তৃষিত–** পিপাসাযুক্ত। **প্রান্তর–** মাঠ; জনবসতি প্রভৃতি নেই এমন বিস্তৃত ভূমি। ***তৃষ্ণাতপ্ত***– পিপাসায় কাতর। **প্রতীক্ষিত–** প্রতীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে এমন। **বন্ধুর–** অসমতল; উঁচু-নিচু। ***বিদ্যুৎ রূপসী পরি***– বিদ্যুৎ চমকানোকে লোকজ ধারণা অনুযায়ী সুন্দরী পরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে মেঘে মেঘে ঘুরে বেড়ায়। ***বিষণ্ন মেদুর***– বৃষ্টিবিহীন প্রকৃতির রুক্ষতা বৃষ্টির আগমনে দূরীভূত হয়েছে। প্রকৃতি এখন স্নিগ্ধকোমল হয়ে চারিদিক করে তুলেছে প্রাণোচ্ছ্বল। **বিদগ্ধ–** পক্ব; রসজ্ঞানসম্পন্ন; নিপুণ। ***রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর ... তৃষ্ণাতপ্ত মন***– দীর্ঘ বর্ষণহীন দিনে মাঠঘাট শুকিয়ে যে রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছে কবি তাকে রুগ্ণ বৃদ্ধ ভিখারীর রগ-ওঠা হাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখন বর্ষণের শুরুতে তৃষ্ণাকাতর মাঠ-ঘাট ও বনে দেখা দিয়েছে প্রাণের জোয়ার। **শিহরা–** শিউরে ওঠা; কম্পিত হওয়া। ***সওয়ার***– আরোহী।

সারসংক্ষেপ :

গ্রীষ্মকালে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির হয়ে যায়। হয়ে ওঠে বৃদ্ধ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতো। এরপর আসে বহু-প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আকাশে কালো মেঘ জমে। বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টির পানির পরশে তৃষ্ণার্ত গাছগুলো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে। প্রকৃতিতে দেখা দেয় প্রাণের জোয়ার। মানুষের মনও মেঘ-বৃষ্টির প্রভাব এড়াতে পারে না। নিবিড় বর্ষার দিনে মানুষ স্মৃতিকাতর হয়। মন ছুটে যায় স্মৃতির নির্জনে; বর্ষার মেঘের মতো দূরদেশে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় কোন কোন নদীর উল্লেখ আছে?
   ক. পদ্মা-মেঘনা খ. মেঘনা-যমুনা গ. ব্রহ্মপুত্র-বানার ঘ. পদ্মা-যমুনা

২. ‘বিষণ্ন মেদুর’ শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–
   ক. হতাশা খ. স্নিগ্ধ কোমল গ. তৃষ্ণার্ত মন ঘ. অবসাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

৩. 'তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন' –এ বক্তব্যের সদৃশ ভাব রয়েছে কোন বাক্যটিতে?

i. নিশি রাইত বাঁশ বাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী। ii. যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গ নির্জন।
iii. দু-পাশে আবাদি গ্রামে, বৃষ্টি এলো পুবের হাওয়ায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপক ও 'বৃষ্টি' কবিতার আলোকে বলা যায় বর্ষার আগমনে মানুষের মন–

ক. বিষণ্ন হয় খ. বিরহ কাতর হয় গ. স্মৃতিকাতর হয় ঘ. বিরক্ত হয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'কেয়া' কোথায় থাকে?

ক. অরণ্যে খ. বিলে গ. মাঠে ঘ. খালে

৬. 'বৃষ্টি' কবিতায় বৃষ্টিকে বলা হয়েছে–

i. কাজল ছায় ii. রূপসী পরি iii. বহু প্রতীক্ষিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্পলতা।'

৭. উদ্দীপকের বক্তব্যের বিপরীত ভাব রয়েছে যে বাক্যে–

i. রৌদ্র-দগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়
ii. নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার
iii. রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৮. এরূপ বৈপরীত্যের কারণ হচ্ছে–

ক. বৃষ্টির প্রত্যাশা খ. জলের প্রত্যাশা গ. বন্যার আগমন ঘ. সিডরের তাণ্ডব

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজলী থেকে থেকে চমকায়
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।

ক. 'সওয়ার' অর্থ কী?
খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে 'বৃষ্টি' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'বৃষ্টি' কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে নয়।" –আপনার মতামত কী?

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'সওয়ার' শব্দের অর্থ আরোহী।

খ. 'বিদগ্ধ আকাশ' বলতে এখানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ আকাশকে বোঝানো হয়েছে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে যেন আগুন ধরে যায়। সূর্যের প্রচণ্ড শাসনে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ হয়। এ সময় প্রখর তাপে আকাশ তৃষ্ণায় কাঁপে। রোদের সুতীব্র তাপে আকাশটা গলে যেতে চায়। উত্তপ্ত সূর্যটা যেন ওই আকাশটাকে ঝলসাতে থাকে।

গ. ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বৃষ্টির দিনে সংবেদনশীল মানুষের মন রসসিক্ত হয়ে ওঠার বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

বর্ষার দিনে প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সে সময়ে প্রকৃতিতে নেমে আসে প্রাণের জোয়ার। বনের ফুলগুলো বর্ষায় ভিজে নিমিষেই চারপাশ মোহিত করে। বৃষ্টির জলে গাছ-পালা, লতা-পাতা অপার আনন্দে শিহরিত হয়। বৃষ্টির অবিরল জলধারায় প্রকৃতিতে যেন ছন্দ ও সুর বেজে ওঠে।

‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ষা প্রকৃতিতে প্রাণের জাগরণ ঘটায়। আর বৃষ্টিই বর্ষার প্রাণ। বৃষ্টিতে বনের কেয়া ফুল শিহরিত হয়। রুক্ষ মাটি যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ-কোমল ও সজীব হয়ে ওঠে। এ সময়ে মানুষের মন সংবেদনশীল হয়ে আবেগতাড়িত হয়। তার মনে পড়ে সুখময় অতীত, পুরনো স্মৃতি আর ভালোলাগার আল্পনা আঁকে মনে মনে। বৃষ্টি কখনো মনকে বিষণ্ন করে, আবার কখনো জীবনে বাড়ায় বিরহ। মন কাছের মানুষকে পেতে চায়। উদ্দীপকেও কবির মন বৃষ্টির ছোঁয়ায় আকুল হয়ে ওঠে। বিজলী থেকে থেকে চমকায়। সে মন আজ প্রিয়জনকে যেন কিছু বলতে চায়। ঘনঘোর বর্ষায় কবির মন আবেগতাড়িত হয়, রসসিক্ত হয়। ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বর্ষণমুখর দিনে মানুষের চেতনায় সুখময় অতীত ও বিরহ-বেদনার দিকটি নাড়া দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় এ দিনে কাউকে যেন কাছে পেয়ে মন কিছু বলতে চায়। তাই বলা যায়, ‘বৃষ্টি’ কবিতার বর্ষার দিনে মানব মনের স্মৃতিকাতরতা আর বিরহ বিষণ্নতার বিষয়টিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে, সমগ্রতাকে তুলে ধরেনি।

প্রকৃতি জগতে বৃষ্টি আসে প্রাণের জোয়ার নিয়ে। বৃষ্টির ফলে নদীর দুধারে প্লাবন দেখা দেয়। বৃষ্টির জলে বনের ফুলগুলো অপার আনন্দে শিহরিত হয়। তৃষিত মাঠ প্রাণের স্পন্দনে নেচে ওঠে। প্রকৃতি সজীব হয়। গাছ-পালা, তরুলতা সজীব হয়ে ওঠে। আর বাংলার প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়।

‘বৃষ্টি’ কবিতায় কবির বর্ণনা অনুযায়ী বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ রূপসী পরি মেঘে মেঘে সওয়ার হয়। দিক-দিগন্তে প্রকৃতির অপরূপ শোভা বিকশিত হয়। দিগন্তজোড়া পৃথিবী, বন, ধানক্ষেত, নদী নতুন প্রাণ পায়। মানুষের মনেও জাগে বিচিত্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। কখনো সুখময় অতীত, কখনো স্মৃতিকাতরতা কিংবা কখনো বিরহ বিষণ্নতা। সব মিলিয়ে ‘বৃষ্টি’ কবিতাটিতে বৃষ্টির সামগ্রিক একটি রূপ পরিস্ফূটনের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকটিতে শুধু মানুষের অবসর মুহূর্তের একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বৃষ্টির দিনে মন ব্যাকুল হয়। প্রিয়জনকে মনের কথা বলতে ইচ্ছা করে। বর্ষণমুখর দিনে মানুষের বিরহকাতরতা বেড়ে যায়। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকটি মানুষের মনের একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। উদ্দীপকটি যে কোনো দিক থেকে হোক একটিমাত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। এটি পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশে সক্ষম নয়। আর ‘বৃষ্টি’ কবিতায় বৃষ্টির একটি সামগ্রিক দিক ফুটে উঠেছে। কেবল স্মৃতিকাতরতা আর বিরহকাতরতার অনুভূতির জন্য উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার একটা ভাবকে প্রকাশ করেছে মাত্র, সমগ্র ভাবকে নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘বৃষ্টি’ কবিতার সামগ্রিক দিক নয়, একটি বিশেষ ভাবকে ধারণ করেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে,
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর ভর।

ক. কবি বিদ্যুৎ চমকানোকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. ‘বিদ্যুৎ রূপসী পরি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক ও ‘বৃষ্টি’ কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘বৃষ্টি’ উভয় কবিতায়ই বাংলাদেশের বর্ষার অন্তরলোকের রূপটি ফুটে উঠেছে।” –আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. ক	৬. খ	৭. খ	৮. ক

আমি কোনো আগন্তুক নই

আহসান হাবীব

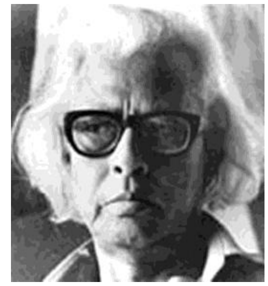

কবি পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থাভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা দান করেছে। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আর্ত মানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাত্রিশেষ*, *ছায়া হরিণ*, *সারা দুপুর*, *আশায় বসতি*, *দু'হাতে দুই আদিম পাথর*;

উপন্যাস : *আরণ্য নীলিমা*, *রাণী খালের সাঁকো*;

শিশু-সাহিত্য : *জোছনা রাতের গল্প*, *ছুটির দিন দুপুরে*, *রেলগাড়ি ঝমাঝম*, *বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর*।

ভূমিকা

'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। মানুষের সাথে তার জন্মভূমির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা তিনি এ কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি এখানে বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক ও দেশপ্রেমের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি জন্মভূমির আপন পরিবেশের সাথে নিজেকে একীভূতভাবে দেখেছেন। দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আর এটাই তাঁর অস্তিত্ব। কেননা মানবজীবন ও জন্মভূমি পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রাম-বাংলার জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সাথে কবির নিবিড় সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পুবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থির দৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশি পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।
আমি কোনো আগন্তুক নই, আমি
ছিলাম এখানে, আমি স্বাপ্নিক নিয়মে
এখানেই থাকি আর
এখানে থাকার নাম সর্বত্রই থাকা –
সারা দেশে।

আমি কোনো আগন্তুক নই। এই
খর রৌদ্র জলজ বাতাস মেঘ ক্লান্ত বিকেলের
পাখিরা আমাকে চেনে
তারা জানে আমি কোনো আত্মীয় নই।
কার্তিকের ধানের মঞ্জরী সাক্ষী
সাক্ষী তার চিরোল পাতার
টলমল শিশির – সাক্ষী জ্যোৎস্নার চাদরে ঢাকা
নিশিন্দার ছায়া
অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলী
তার ক্লান্ত চোখের আঁধার –
আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন। আমি
জমিলার মা'র
শূন্য খা খা রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি
সে আমাকে চেনে।

হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো
আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো
মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে
লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।
আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।
দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধু ধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবোধ– অবুঝ; নির্বোধ। ***অভ্যাগত–*** গৃহে এসেছে এমন ব্যক্তি; আগন্তুক; নিমন্ত্রিত অতিথি। **আগন্তুক–** অতিথি; অপরিচিত নবাগত ব্যক্তি। ***আসমান–*** আকাশ। **চিরোল–** মাঝখানে চেরা; চিরযুক্ত। ***জমিন–*** ভূমি। ***জমিলার মা'র ... সব চিনি–*** গরীব, অভাবী শ্রেণির প্রতিনিধি জমিলার মা। তাদের রান্নাঘর শূন্যই থাকে সাধারণত। কারণ রান্না করার খাদ্য উপাদান তাদের নেই। যেহেতু রান্না করা হয় না, খাবারও খাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই থালা-বাসনও শুকনো থাকে। কবিও সেই অবস্থার কথা জানেন। ***দু' পাশে ধানের ক্ষেত ... আমার অস্তিত্বে গাঁথা–*** কবি গ্রামীণ জীবনেই বেড়ে উঠেছেন। গ্রামের মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তরের মতো ক্ষেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত হয়ে আছে। এরা সবাই কবির খুবই চেনা-জানা। ***ধানের মঞ্জরী–*** মঞ্জরী হলো মুকুল বা শিষ, ধানের মঞ্জরী হলো ধানের শিষ বা মুকুল। ***নিশিরাইত–*** 'নিশীথ রাত্রি'র গ্রামীণ কথ্যরূপ (গভীর রাত বোঝাতে)। ***নিশিন্দা–*** এক ধরনের গাছ। **বিস্তর–** প্রচুর; ঢের। **ভিনদেশি–** অন্য দেশের; বিদেশি। **পুবের–** পূর্ব দিকের। ***সাক্ষী–*** কোনো কিছু নিজচোখে দেখেছেন এমন কেউ। ***স্নিগ্ধ মাটির সুবাস–*** মায়াবী ও আকর্ষণীয় গ্রামবাংলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

কবি গ্রাম-বাংলারই সন্তান। তিনি এখানে নতুন আসা কোনো অতিথি নন। বাংলার জীবন ও প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই তিনি এখানকার প্রকৃতিকে চেনেন। মানুষকে চেনেন। খুব সূক্ষ্মভাবে, গভীরভাবে চেনেন। তিনি নিজেও তাদের অতি পরিচিত একজন। নিজের বসতিকে ভালোভাবে চেনেন বলেই পুরো দেশকে আপন করে পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না। এদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যে, মানুষের পেশাগত কাজকর্মে, নদীর উদাত্ত প্রবাহে কবি খুঁজে পান নিজের অস্তিত্ব। তাঁর স্বপ্নও আবর্তিত হয় এসবকে ঘিরেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

ক. সারা দুপুর খ. রাত্রিশেষ গ. ছায়াহরিণ ঘ. আরণ্য নীলিমা

২. 'পাখিরা আমাকে চেনে' চরণটির তাৎপর্য হচ্ছে–

ক. কবি পাখিদের চিরচেনা স্বজন খ. কবি পাখিদের অতিথি

গ. কবি অপরিচিত কেউ নন ঘ. কবি পাখিদের আত্মার আত্মীয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় যেন,
মিলে-মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।

৩. উদ্দীপকটি নিচের কোন কবিতাকে প্রতিফলিত করে–

ক. আমার পরিচয় খ. আমি আগন্তুক নই গ. মানুষ ঘ. বৃষ্টি

৪. উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ হল–

i. অন্তরঙ্গতা ii. গাঁয়ের প্রকৃতি iii. স্বজন ভাবনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'এখানেই' কবি কোন নিয়মে থাকেন?

ক. নাগরিকত্বসূত্রে খ. জন্মগতভাবে গ. স্বাপ্নিক নিয়মে ঘ. প্রকৃতিগতভাবে

৬. ‘তারা জানে আমি কোন আত্মীয় নই’ কথাটির মানে হচ্ছে–

ক. কবি পাখিদের চিরচেনা খ. কবি পাখিদের আত্মীয় গ. কবি পাখিদের প্রতিবেশী ঘ. কবি পাখিদের বন্ধু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

৭. উদ্দীপকটির সাদৃশ্য রয়েছে যে কবিতার সঙ্গে–

ক. প্রাণ খ. পল্লিজননী গ. আমি কোনো আগন্তুক নই ঘ. মানুষ

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

ক. ভাষা ও চিত্রকল্পে খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গ. জীবনবোধে ঘ. ছন্দ বিন্যাসে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি বাংলায় গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই।
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন
আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে
হেঁটেছি এতটা দূর
বাংলা আমার জীবনানন্দ
বাংলা প্রাণের সুর
আমি একবার দেখি,
বারবার দেখি
দেখি বাংলার মুখ।

ক. কবি আহসান হাবীব কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?

খ. ‘আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।’ –কবি কেন একথা বলেছেন ?

গ. উদ্দীপকে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতার কবি জন্মভূমিকে আপন সত্তায় অনুভব করতে চেয়েছেন।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি আহসান হাবীব অধুনালুপ্ত ‘দৈনিক বাংলা’ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন।

খ. বাংলার প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট, প্রান্তরের সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। তিনি অবোধ বালকের মতো বাংলার প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছেন।

কবি আহসান হাবীব কৈশোরে বাংলাদেশের গ্রামীণ আবহে বেড়ে উঠেছেন। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তরের মতো খেতের সরু পথ, তার পাশে ধানের সমারোহ এবং একটু এগিয়ে গেলে বিশাল নদীর কিনার কবির মনের ভেতর, অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। বাংলার প্রকৃতি কবিকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে, তিনি এখানকার মানুষ ও প্রকৃতিকে যেমন ভালোভাবে চেনেন, তেমনি তিনিও তাদের চিরচেনা স্বজন। তাই কবি বলেছেন, আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

গ. উদ্দীপকটিতে ‘আমি কোনো আগন্তুক নই’ কবিতায় প্রকাশিত কবির স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক। জন্মভূমিতে শিকড় গেড়ে মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। এর সবকিছুই তার কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই অনুভূতি তুলনাহীন।

উদ্দীপকে একজন কবির আপন সত্তা প্রকাশিত হয়েছে। এই কবি বাংলায় গান করেন এবং বাংলাতেই নিজেকে খুঁজে পান। এই বাংলাতেই বাস করে তিনি নিজের জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়ে থাকেন। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় কবি আহসান হাবীবও তাঁর অস্তিত্ব নিজের জন্মভূমি বাংলায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তিনি এখানে কোনো আগন্তুক নন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন ঠিক তেমনি তারাও তাকে চেনে। কবি বলেছেন, গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে তাঁর জীবন বাঁধা। এটিই হচ্ছে তার অস্তিত্ব। এভাবে বলা যায়, 'আমি কোনো আগন্তুক নই'-এর কবির নিজ দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. দেশপ্রেম মানে হচ্ছে তাকে আপন সত্তায় নিজের অনুভূতিতে অনুভব করা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আজীবনের সম্পর্ক। এর প্রতি ভালোবাসা চিরন্তন। এই মাটিতে শিকড় গেড়েই মানুষ সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। জন্মভূমির সবকিছুই তার নিকট মনে হয় কত চেনা, কত জানা। জন্মভূমির প্রকৃতি ও রূপে সে মুগ্ধ হয়। এর মাটি, তার গন্ধ, তার নিকট অতি আপন। তার শরীরে লেগে থাকে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই ভালোবাসার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও অনুভূতির জগতে তা অভিন্ন রূপ ধারণ করে।

উদ্দীপকের কবি নিজেকে বাংলার মাটিতে খুঁজে পান। এর মায়াভরা পথ দিয়ে তিনি অনেক হেঁটেছেন। কবি বলেছেন, তিনি বাংলাকে চিরদিন চেনেন। বাংলায় স্বপ্ন দেখা তার চিরকালীন কামনা। বাংলা তার নিকট জীবনানন্দ। তিনি বাংলার মুখ একবার নয়, বার বার দেখতে চেয়েছেন। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায়ও কবি তার চিরচেনা পরিবেশ অর্থাৎ এই বাংলার জনপদে নিজের শিকড় সন্ধান করেছেন। কবি বলেছেন– পাখি, কার্তিকের ধান কিংবা শুধু শিশির নয়, তিনি এই জনপদের মানুষকেও ভালোভাবে চেনেন। তিনি যেমন ওই আসমান, জমিনের ফুল, জোনাকি, পুকুর, মাছরাঙাকে চেনেন, তেমনি তারাও তাকে চেনে। এই গ্রামীণ জনপদের সঙ্গেই কবির জীবন বাঁধা।

জন্মভূমির সঙ্গে মানুষ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এর সবকিছুই তার অতি আপনজন। জন্মভূমির অস্তিত্ব তার অস্থি-মজ্জায়। এভাবেই সে সমগ্র দেশকে আপন করে পায়। নিজের সত্তা দিয়ে অনুভব করে। 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় এই অনুভবই কবি আহসান হাবীব গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের কবিও বাংলার সবকিছুকে নিজের সত্তায় অনুভব করেন। আর অনুভব করেন বলেই বাংলার প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবি এবং 'আমি কোনো আগন্তুক নই'-এর কবি জন্মভূমিকে একান্তভাবে আপন সত্তায় অনুভব করেছেন।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,
অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষাণ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান!

ক. কবির অস্তিত্বে গাঁথা রয়েছে কোনটি?

খ. 'আমি কোন আগন্তুক নই।' –বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক এবং 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতার দেশপ্রেম অভিন্ন।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ   ২. ক   ৩. খ   ৪. ঘ   ৫. খ   ৬. ক   ৭. গ   ৮. খ

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

শামসুর রাহমান

কবি পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা শহরে তাঁর নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তাঁর পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা খাতুন। শামসুর রাহমান ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েও চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে পাসকোর্সে বিএ পাশ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। আঠারো বছর বয়সে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা', 'সফেদ পাঞ্জাবি', 'আসাদের শার্ট' প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও ভবিষ্যত। বিষয়ে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ :

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, আমি অনাহারী, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, গৃহযুদ্ধের আগে, হরিণের হাড়, মানব হৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই।

ভূমিকা

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতাটি 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। কবিতাটি কবির 'বন্দী শিবির থেকে' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা অর্জনে বাঙালির সংগ্রামী চেতনা এবং তাঁদের মহান আত্মত্যাগের মহিমা কবি সুন্দরভাবে এই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এখানে কবি স্বাধীনতার জন্য এদেশের সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগ, পাক-হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, মুক্তিকামী মানুষের প্রতীক্ষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। কবি স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস থেকে স্বাধীনতাকে রক্ষা ও অর্থবহ করে তুলতে সকলকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- স্বাধীনতার জন্য বিচিত্র মানুষের আত্মত্যাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটাল যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুড়ে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন – তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।

তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকা চালায় উদ্দাম ঝড়ে,
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজি তরুণ যার পদভারে

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে –
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অধীর– অস্থির; ব্যাকুল। **অপরাহ্ণ–** বিকাল। **আর্তনাদ–** কাতর চিৎকার। **খাণ্ডবদাহন–** ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। **জোয়ান–** যুবক; প্রাপ্তবয়স্ক লোক। ***তুমি আসবে বলে ... ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো–*** স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালিদের ওপর বীভৎস ও ভয়ংকর আক্রমণ চালায়; তারা গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে দেয়; তাদের সেই আক্রমণ থেকে ছাত্রদের ছাত্রাবাস, গরীব মানুষের থাকার জায়গা, বস্তিও রক্ষা পায়নি; পাকিস্তানি সেনারা ছাত্রাবাস ও বস্তিতেও আক্রমণ করে, এবং সেখানকার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ***থুত্থুড়ে এক বুড়ো–*** বয়সের ভারে বিধ্বস্ত লোক, যার বয়স অনেক হয়েছে এবং চলাচল করতে যার কষ্ট হয়। **দাওয়া–** বারান্দা, উঠান। **দামামা–** ঢাকজাতীয় রণবাদ্য। **দিগ্বিদিক–** সর্বদিক। **নিশান–** পতাকা; কেতন। **প্রতীক্ষা–** অপেক্ষা। **বাস্তুভিটা–** বহুকালের বসতভূমি পুরুষানুক্রমে যে বাড়িতে বাস করা হয়। **বিধ্বস্ত–** বিলুপ্ত, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। **ভগ্নস্তূপ–** স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। ***যত্রতত্র–*** যেখানে সেখানে; সব জায়গায়। ***রুস্তম শেখ ... এখন পোকার দখলে–*** রুস্তম শেখ নামের এক রিক্‌শাওয়ালা যিনি যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন; মৃত অবস্থা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে 'যার সুখদুখ এখন পোকার দখলে'। ***সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর–*** হরিদাসী বিধবা হলো। সনাতন ধর্মের মেয়েদের বিয়ের পর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্বামী মারা গেলে সেই সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের দেশের এমন অনেক হরিদাসীর স্বামী মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। হরিদাসীর স্বামীও শহিদ হয়েছেন– এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

স্বাধীনতা মানুষের পরম চাওয়া। মানুষ বিচিত্র অবস্থার মধ্যে থাকে। বিচিত্র শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ তাদের। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তাদের মধ্যে ভেদ নেই। যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতার জন্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে শহর ও গ্রামের লোকালয়। কিন্তু সবকিছু হারিয়েও বাংলার মানুষ আশা ছাড়েনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের একদিকে ছিল বিসর্জন, অন্যদিকে সম্মুখ-যুদ্ধের সাহস আর বীরত্ব। বহু বিচিত্র মানুষের নানামুখী অংশগ্রহণে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল কার?

ক. সকিনা বিবির　　খ. হরিদাসির
গ. আমিনা বিবির　　ঘ. নির্মলা দাসির

২. সনাতন ধর্মে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলা হয় যে কারণে–

ক. স্বামী সমুদ্র পাড়ি দিলে　　খ. স্বামী বিদেশ গেলে
গ. স্বামী যুদ্ধে গেলে　　ঘ. স্বামী মারা গেলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অলভ্য জয়ের লোভে জ্বালায় শহর, গ্রামে গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙ্গে ভগ্ন স্তূপে দূরের উল্লুক।

৩. উদ্দীপকটি কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সাহসী জননী
খ. প্রাণ
গ. তোমাকে পাওয়ার জন্য ,হে স্বাধীনতা
ঘ. জীবনসঙ্গীত

৪. উদ্দীপকের চরণদ্বয় নিচের কোন পঙ্‌ক্তিটির উপজীব্য?

i. তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা
ii. তুমি আসবে বলে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম
iii. হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোর শূন্য থালা হাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতাটি শামসুর রাহমানের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

ক. রৌদ্র করোটিতে
খ.বন্দী শিবির থেকে
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে
ঘ. হরিণের হাড়

৬. ‘তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতা-মাতার লাশের উপর।’ চরণটিতে রয়েছে–

ক. অবোধ শিশুর আনন্দ
খ. গণআন্দোলনের রূপ
গ. শিশুর বিদ্রোহ
ঘ. স্বাধীনতার স্বপ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতার–

i. শ্রমিক শ্রেণির
ii. স্বাধীনতা বিরোধীদের
iii. আপামর জনসাধারণের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

৮. উদ্দীপক ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কবিতাটির সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে–

ক. দেশাত্মবোধ
খ. সাহসিকতা
গ. নিপীড়ন
ঘ. ধ্বংসযজ্ঞ

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ,
তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে
যার আলোয় এখন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সাহসী বদ্বীপ,
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ
তুমি ফিরে এসেছ তোমার অনাহারী শিশুটির কাছে
ফিরে এসেছ তোমার প্লাবনের কোমল পলিমাটিতে
যার মুঠোর ভেতরে এখন একটি ধানের বীজ;

ক. ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা’ কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
খ. ‘আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়।’ –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা' কবিতার মূলভাবটি প্রকাশিত হয়েছে কি? –উত্তরের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' নামক কবিতাটি 'শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ. বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীর বুকে অনেকবার রক্ত দিতে হয়েছে।
স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার অর্জনের জন্য এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে ছাত্রাবাসগুলোতে আক্রমণ করে। নির্মমভাবে গণহত্যা চালায়। পুড়িয়ে দেয় দেশের শহর ও গ্রামের লোকালয়। সম্ভ্রম হারায় অনেক নারী। যুদ্ধে আত্মত্যাগ করে অনেক নারী ও পুরুষ। রক্তের গন্ধ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবুও মাথা নত করেনি বাঙালি। বার বার এদেশ অত্যাচারীর অত্যাচারে রক্তগঙ্গায় ভেসেছে। এ কারণেই কবি বলেছেন– 'আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?'

গ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার শেষ অংশ যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা রয়েছে সে অংশের সঙ্গে উদ্দীপকের মিল রয়েছে।
বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এর জন্য বাঙালিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে নয় মাস। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এদেশের লাখো মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। নির্যাতিত ও বিধবা হতে হয়েছে অসংখ্য নারীকে। ধ্বংস হয়েছে অজস্র জনপদ। উজাড় হয়েছে অনেক বস্তি ও ছাত্রাবাস। আর এর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার রক্তলাল পতাকা।
উদ্দীপকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। কবি এখানে নতুন বাংলাদেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। কবি বলেছেন,'তুমি ফিরে এসেছ তোমার লাল সূর্য আঁকা পতাকার ভেতরে, ফিরে এসেছ তোমার অনাহারী শিশুটির কাছে, ফিরে এসেছ তোমার প্লাবনের কোমল পলিমাটিতে।' বস্তুত ফিরে আসা বলতে মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসাকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে কবিতায় দেখতে পাই যুদ্ধের সময় অনেক রক্তগঙ্গা বইয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। পিতা-মাতার লাশের উপর হামাগুড়ি দিয়েছে অনেক অবুঝ শিশু। সম্ভ্রম হারিয়েছে অনেক নারী। নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে উদ্দীপকের পতাকার মতো লাল পতাকা উড়িয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বলা যায়, এভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিতে উদ্দীপকের সঙ্গে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে,হে স্বাধীনতা' কবিতার মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার মূল ভাবটি প্রকাশিত হয়নি।
স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার অনুভবেরও বটে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতির এ অধিকার হরণ করেছিল। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপামর বাঙালি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী এদেশে গণহত্যা চালায়। পুড়িয়ে দেয় গ্রাম ও শহরের অজস্র লোকালয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং রক্তগঙ্গার বিনিময়ে অবশেষে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বাংলার আকাশে ওঠে স্বাধীনতার লাল সূর্য।
উদ্দীপকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। উদ্দীপকের কবি এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আবেগকে সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবির স্বপ্নের স্বাধীনতা ফিরে এসেছে বাংলার কোমল পলিমাটিতে, অনাহারী শিশুটির কাছে। উদ্দীপকটিতে যুদ্ধের কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না উদ্দীপকে। অন্যদিকে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আবহকে তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ বিস্তৃত পরিসরে ফুটে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাঙালির রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয় পাকসেনারা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন, অনেক নবজাতক হারিয়েছে মা-বাবাকে। আর্তনাদ করেছে কুকুরও। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার শ্রমিক, কৃষক, জেলে প্রমুখ সাধারণ

মানুষও আত্মত্যাগ করে। এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রায়ন রয়েছে কবিতাটিতে।

উদ্দীপকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা বলা হয়েছে। সেখানে নতুন স্বাধীন বাংলাদেশকে অভিবাদন জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় নি। আর 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটিতে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর প্রসঙ্গসহ মুক্তিযুদ্ধের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতাটির মূল ভাব উদ্দীপকে ফুটে ওঠেনি। আংশিক চিত্রকে ধারণ করেছে মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল অংশ:

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা,অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–

ক. শাহবাজপুরের কৃষকের নাম কী?

খ. 'তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপক ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।

ঘ. 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় রয়েছে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. গ ৮. ক

অডিও/ভিডিও

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।

শিক্ষার্থীবন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাঁকোটা দুলছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি পরিচিতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মাদারিপুর জেলার মাইঝপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক, মাতা মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' নামক কবিতা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তরুণ প্রজন্মের কবিদের দৃষ্টি কাড়েন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক ও নিবন্ধকার। তবে পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন সাংবাদিক। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একইসঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক কবি। কবিতা ও কথাসাহিত্যে যে ভুবন তিনি রচনা করেছেন সেখানে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবীয় প্রেমের এক অসামান্য জগৎ তৈরি হয়েছে। তিনি 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক' ও 'নীল উপাধ্যায়' প্রভৃতি ছদ্মনামে লিখেছেন। সবমিলিয়ে তিনি দুইশ'র বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর কলকাতায় নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ:

- **কাব্যগ্রন্থ** : *এক এবং কয়েকজন*, *আমার স্বপ্ন*, *জাগরণ হেমবর্ণ*, *দাঁড়াও সুন্দর*, *মন ভালো নেই*, *স্বর্গনগরীর চাবি*, *স্মৃতির শহর*, *হঠাৎ নীরার জন্য*, *রাত্রির রঁদেভূ*;
- **উপন্যাস** : *অরণ্যের দিনরাত্রি*, *আত্মপ্রকাশ*, *প্রতিদ্বন্দ্বী*, *সেই সময়*, *পূর্ব-পশ্চিম*, *প্রথম আলো*;
- **শিশুসাহিত্য** : *কাকাবাবু-সন্তু*।

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাত্রির রঁদেভু' কাব্যগ্রন্থের 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতাটি 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থ থেকে সম্পাদনা করে সংকলন করা হয়েছে। মানুষের জীবনে শৈশবের মধুর স্মৃতি ও বন্ধুত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েই লেখক তাঁর এই কবিতাটি রচনা করেছেন। দেশ বিভাগে লেখক তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাঁর মনে যে এ দেশের প্রতি এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাই তিনি এ কবিতাটিতে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- গ্রাম-বাংলার মনোরম পরিবেশের বিবরণ দিতে পারবেন;
- হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দেশভাগের কারণে বিচ্ছিন্ন মানুষের বেদনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে স্নিগ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় ক'টি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিনদেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দু'চোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে
এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি–কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধু ধু
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

ইঙ্গিত– ইশারা; সঙ্কেত। ***কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি–*** সম্পর্কের অবস্থা বোঝানো হয়েছে; নিকটজনের সাথে নানা ধরনের মনোমালিন্য হয়ে থাকে; কথা বলতে বলতে হয়তো দু'একটি কথায় একে অপরের মাঝে মনমালিন্য হয়, অভিমান করে কথা বন্ধ রাখে, আবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়– এ অবস্থা বোঝানো হয়েছে। **কুসুম–** ফুল। ***খুনসুটি–*** কৃত্রিম বিবাদ; কপট রাগ; রাগের ছল বা অভিমান। **পেরোলেও–** পার হলেও। ***ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি–*** নদীর দু'পাড়ের মানুষ যাদের চেনে না তেমন কারো নৌকা নিয়ে যাতায়াত করতে দেখছে। দেখছে তাদেরই নদী দিয়ে অন্য কোনো এলাকার বা ভিনদেশি কোনো মানুষ তার ভরা নৌকায় মনের আনন্দে গান গেয়ে চলে যাচ্ছে। ***মনস্কাম–*** মনের আশা; আন্তরিক কামনা; বাসনা। **মৃদু–** ক্ষীণ; অনুজ্জ্বল। **সহাস্য–** হাস্যরত। **সাঁকো–** সেতু; পুল।

সারসংক্ষেপ :

নদীর দুই পারে স্নিগ্ধ সুন্দর দুটি গ্রাম। মাঝে বাঁশের সাঁকো। এ গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস। আর ওদিকের গ্রামে মুসলমানের। দুই গ্রামের দুটি ছেলেতে বেজায় বন্ধুত্ব। ঝগড়া-বিবাদ হয়। আবার মিটেও যায়। সারাদিন দুজনে মিলেমিশে থাকে। এক গাছের ফল ভাগ করে খায়। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে আনন্দময় দিন কাটায়। দেশভাগ দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ নিয়ে আসে। এ ঘটনা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কেও ফাটল ধরায়। কিন্তু দূরে গেলেই মনের টান শেষ হয়ে যায় না। স্মৃতির সাঁকোটা মুছে যাওয়ার নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির বন্ধুর নাম কী?
ক. কামাল খ. আনোয়ার গ. খবিরউদ্দিন ঘ. আসলাম

২. 'কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি' বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. সম্পর্কের উষ্ণতা খ. সম্পর্কহীনতা গ. সম্পর্ক ছেড়ে দেওয়া ঘ. সম্পর্ক জুড়ে নেওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

'বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ করবার পারো নাই।'

৩. উদ্দীপকটি 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধুধু ii. আমাদের ছুটি মন বদলের খেলা
iii. এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii I iii

৪. উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–
ক. স্মৃতি খ. দেশভাগ গ. বন্ধুত্ব ঘ. সংস্কৃতি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির বন্ধু কীসের রাজা?
ক. স্বর্গের রাজা খ. মর্ত্যের রাজা গ. দুনিয়াদারীর রাজা ঘ. পাতালের রাজা

৬. বন্ধুত্ব হারালে দুনিয়াটা যেমন হয়–
ক. আনন্দে ভরে ওঠে খ. বিষাদে ভরে ওঠে গ. খাঁ খাঁ করে ওঠে ঘ. কোলাহলে ভরে ওঠে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

টোকা দিলে ঝরে পড়বে পুরনো ধুলো
চোখের কোণায় জমা একফোঁটা জল।

৭. উদ্দীপকে 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?
ক. বিরহ খ. আত্মনিবেদন গ. স্মৃতি ঘ. বিস্মৃতি

৮. উদ্দীপকের অনুভব 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার যে চরণে প্রকাশ পেয়েছে–
ক. আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি। খ. আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা
গ. খেলার বয়স পেরোলেও একা ঘরে ঘ. এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার

সৃজনশীল প্রশ্ন :

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে। অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নাম কী?
খ. 'খুনসুটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক।" –উদ্দীপক ও 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক. কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নাম হচ্ছে 'কৃত্তিবাস'।

খ. 'খুনসুটি' বলতে বোঝানো হয়েছে কপট রাগ বা অভিমানকে।
মানুষের জীবনক্রমের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে শৈশব। শৈশবে খেলার অনেক সঙ্গী-সাথী থাকে। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির ছেলেবেলার বন্ধু আনোয়ার। কবির সঙ্গেই তার বোঝাপড়া। কবি যেখানে বড় হয়েছেন সেখানে বাড়ির পাশেই ধনুকের মতো বাঁকা একটি নদী আছে। সেখানে কবি ও তার বন্ধু আনোয়ার সারাদিন খেলা করতেন। নদীর জলে উরু ডুবিয়ে তাদের আনন্দ হত। এরই মধ্যে তাদের ঝগড়া হত। তারা কৃত্রিম বিবাদে লিপ্ত হতেন। ক্ষণিক সময়ের ব্যবধানে তাদের আবার মিল হয়ে যেত। বন্ধুত্বের মধ্যে কপট রাগ বা রাগের ছলনাকে কবি 'খুনসুটি' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বিষয়টিতে উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সে একাকী বাস করতে পারে না। তাই তার বন্ধুত্বের প্রয়োজন হয়।বন্ধুত্বের বন্ধন হৃদয়ের প্রাণ প্রবাহ। হৃদয়ের টান, মমত্ববোধ, ব্যক্ত-অব্যক্ত ভাব প্রকাশের একটা বলয় হচ্ছে বন্ধুত্বের বন্ধন। বন্ধুত্ব অনুভবের ও উপলব্ধির বিষয়। বন্ধুরা একসঙ্গে মিলিত হয় প্রাণের টানে, প্রাণের প্রয়োজনে।
উদ্দীপকে দেখি মৃত্যুঞ্জয়ের এক বন্ধু উদ্দীপকের কথক তার অসুস্থতার খবর পেয়ে খোঁজ নিতে আসে। উদ্দীপকের কথক এসে দেখে তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীর আশ্রয়ে রয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় হচ্ছে কায়স্থ ঘরের সন্তান আর বিলাসী নিচু ঘরের মেয়ে। সামাজিক কারণে বিলাসী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হতে পারে না। ফলে উদ্দীপকের কথককে সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে আসতে হয়। গল্পকথক বন্ধুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। সামাজিক কোনো বাধা বা ধর্মীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে পারেনি। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবি'র দিন কাটে বন্ধু আনোয়ারের সঙ্গে। বন্ধুর সঙ্গে কবি'র এই আড়ি আবার এই ভাব। দুজনেই প্রশ্রয় পায় মায়ের কাছে। এভাবেই হয়তো দিন কেটে যেতে পারতো। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে দু'বন্ধু দুজনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কবি সহজে ভুলতে পারেননি তার বন্ধু আনোয়ারকে। বড় হয়ে তাই বন্ধু আনোয়ারের কথা মনে পড়ে। উদ্দীপকের কথক সমাজের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে রাতের আঁধারে বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে এসেছে। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায়ও বন্ধু বন্ধুর জন্য দুঃসহ ও মর্মান্তিক পীড়নে ভুগেছে। উভয়ক্ষেত্রেই বন্ধুর

জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বন্ধুর জন্য ভালোবাসা প্রকাশের বিষয়টিতে উদ্দীপক ও 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক এবং 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার মৌলিক দিকটিই ফুটে উঠেছে।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক বড়ই মধুর। এ সম্পর্কে হৃদয়ের অনাবিলতা থাকে। অন্তরের টান থাকে দুর্বার। বন্ধু সহমর্মী ও হৃদয়স্পর্শী। এ সম্পর্কে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও জাতীয়তার কোনো বালাই থাকে না। কোনো বাধার দেয়ালই বন্ধুতেত্ব দিলটাকে ভাগ করতে পারে না। বন্ধুদের মধ্যে কখনো আড়ি হয়। আবার চলে মন বদলের খেলা। কখনো দেখা যায় আনন্দের প্রাণপ্রবাহ, আবার কখনো কান্নার ভেলা। বিশেষ করে শৈশবের বন্ধুত্ব বড় স্মৃতিময়। শৈশবের বন্ধুদের কথা কখনো ভোলা যায় না। এককথায় বলা যায় মানুষের জীবনে বন্ধুতেত্ব সম্পর্ক রূপ-রস ও আনন্দে ভরপুর।

উদ্দীপকে গল্পকথক তার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের কথা বলেছে। সে ছোটবেলায় মৃত্যুঞ্জয়ের মিষ্টির সদ্ব্যবহার করেছে। বন্ধুর প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে। সমাজের নির্মমতার কারণে সে প্রকাশ্যে বন্ধুকে দেখতে যেতে পারেনি। তবে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিকই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এক্ষেত্রে সমাজ কিংবা ধর্ম তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অন্যদিকে 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় আরও মর্মস্পর্শী রূপে বন্ধুত্বের বিরহ বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবি এবং তার বন্ধু আনোয়ার বন্ধুবৃত্তের মধ্যে বসবাস করেই আনন্দের শৈশব কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু গোল বাঁধায় ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ। দু'বন্ধু দুজনের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বড় দুঃসহ এ স্মৃতি, বড় মর্মান্তিক। বড় হয়ে তাই কবির মনে পড়ে তার বন্ধুর কথা। মনে পড়ে বাড়ির পাশের নদীর উপর সেতুটির কথা। কবি বলেন,'এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।' তাঁর কাছে মনে হয়েছে সাঁকোটি যেন এখনো কবি ও তার বন্ধু আনোয়ারের বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আজও দুলছে। এভাবেই কবির ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে তার বন্ধুর প্রতি। উদ্দীপকে যদিও প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন তথাপি সেখানেও মৃতুঞ্জয়ের প্রতি গল্পকথকের অগাধ ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুত্বের বন্ধন চিরন্তন। কোনো বাধাই বন্ধুত্বের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে না। 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় 'সাঁকো'টি এমন এক বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে আছে। কবির কাছে মনে হয় সেই সাঁকোটি যেন এখনো দুলছে। এই সাঁকোটিই যেন মিলিয়ে দিতে চাইছে শৈশবের দুই বন্ধুকে। যদিও বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। উদ্দীপকেও দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধু অন্তরের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। বন্ধুর বিপদের সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সমাজ, ধর্ম কিংবা নীতিবোধ বন্ধুত্বের মানবিক সম্পর্কে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উদ্দীপকে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও তাই 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায় 'বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক' মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

অনেক দিন পরে করাচিতে শহিদ সোহরাওয়ার্দি যখন রোগ শয্যায় শায়িত তখন দিলীপ কুমারের একটি চিঠি তিনি পেয়েছিলেন। তার অনুরোধে চিঠিটা খুলে আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। দিলীপ কুমার সেই চিঠিতে শহিদের অসুস্থতার সংবাদে ব্যাথিত হয়েছিলেন। সে কথা লিখেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি তার জন্য কিছু করতে পারেন কি না। চিঠির পাঠ শেষ হলে আমি লক্ষ করলাম যে শহিদ সোহরাওয়ার্দির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

ক 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবি ও তার বন্ধু কোন গাছে উঠতেন?

খ. 'বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।' –বুঝিয়ে লিখুন।

গ. উদ্দীপক ও 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করুন।

ঘ "সাঁকোটা দুলছে' কবিতার বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।" –বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন– আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: meherin2010@bou.ac.bd

উপন্যাস

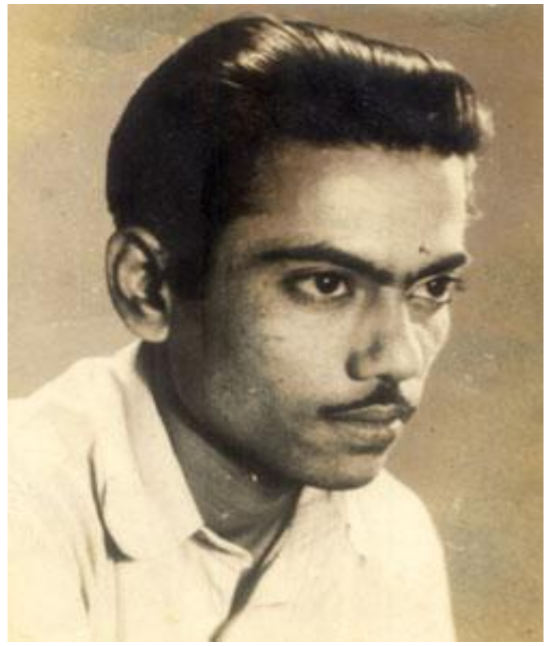

হাজার বছর ধরে

জহির রায়হান

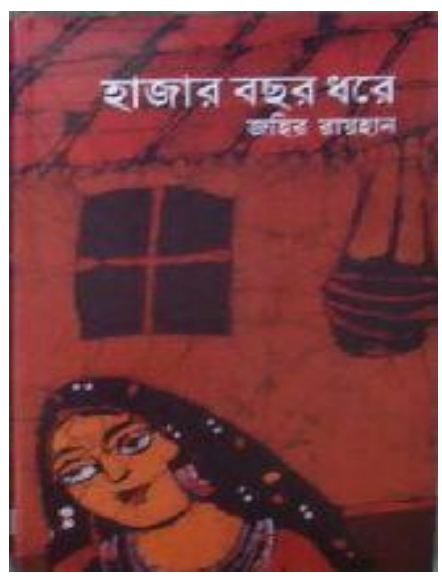

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র : SSC-1651

মানবণ্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন **(কাঠামোবদ্ধ)**	: ৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	: ৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
	সর্বমোট	**= ১০০**

১. সৃজনশীল প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

গদ্য, কবিতা ও সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) অংশের প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টিসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০ নম্বর।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।
প্রশ্ন ৪টির নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগদক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে গদ্য থেকে ১৫টি, কবিতা থেকে ১৫টি এবং সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) থেকে ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে।

হাজার বছর ধরে

জহির রায়হান

ঔপন্যাসিক পরিচিতি

একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বোপরি চলচ্চিত্রকার হিসেবে জহির রায়হান আমাদের নিকট পরিচিত। ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনি জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক। মা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন রক্ষণশীল ও প্রভাবশালী তালুকদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার জননী সুফিয়া খাতুন সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। জহির রায়হান কলকাতায় মিত্র ইনস্টিটিউটে ও পরে আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। দেশভাগের পর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আইএসসি পাস করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫২ সালে জহির রায়হান ভাষা-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতা চলে যান এবং সেখান থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি 'স্টপ জেনোসাইড' পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। সেসময় তিনি আর্থিক সঙ্কটে পড়লেও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করেন।

অল্প বয়সেই জহির রায়হান সেসময়ের নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। গোপন পার্টিতে তাঁর নাম রাখা হয় 'রায়হান'। ১৯৫০ সালে তিনি 'যুগের আলো' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং পরে 'খাপছাড়া', 'যান্ত্রিক', 'সিনেমা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি 'প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে 'জাগো হুয়া সাবেরা' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। তিনি 'যে নদী মরুপথে' ও 'এ দেশ তোমার আমার' ছবিতে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'কখনো আসেনি' মুক্তি পায়। এরপরে তাঁর নির্মিত ছবি কাজল, কাঁচের দেয়াল, বেহুলা, জীবন থেকে নেয়া, আনোয়ারা, সঙ্গম, বাহানা মুক্তি পায়। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। পঞ্চাশের দশকে ছাত্র অবস্থায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) 'সূর্যগ্রহণ' প্রকাশিত হয়। 'হাজার বছর ধরে' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ-উপন্যাসের জন্য তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। আবহমান বাংলার জীবন, জনপদ ও আচরণ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তিনি বাংলা একাডেমি ও স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালে জহির রায়হানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা তাঁর বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে যায়। জহির রায়হান খবর পান যে, তাঁর বড় ভাইকে ঢাকার মিরপুরে রাখা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি বড় ভাইকে উদ্ধারের জন্য মিরপুরে যান এবং আর ফিরে আসেননি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : *শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯), বরফ গলা নদী (১৯৬৯), আর কতদিন (১৯৭০), কয়েকটি মৃত্যু।*

প্রবন্ধ : *পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৭১)।*

এছাড়া তিনি অনেক গল্প রচনা করেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি পড়া শেষে আপনি–

- উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উপন্যাসের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসের বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কাহিনি-সংক্ষেপ লিখতে পারবেন;
- টুনি ও মন্তুসহ প্রধান চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- উপন্যাস হিসেবে 'হাজার বছর ধরে'র সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উপন্যাসের সংজ্ঞা ও পরিচয় বলতে পারবেন;
- উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সাহিত্য জীবনের কথা বলে, সাহিত্য সমাজের কথা বলে। সাহিত্য আমাদের মুখোমুখী করে জীবন-সত্যের ও সমাজ-সত্যের; আমরা উপলব্ধি করি জীবনের তাৎপর্য এবং সামাজিক বাস্তবতা। সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা প্রবেশ করি এমন এক নির্মল আনন্দলোকে, যে আনন্দলোক সৃষ্টি হয় সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের দ্বারা।

সাহিত্যের প্রধান শাখা পাঁচটি : কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। প্রকাশরীতির পার্থক্যের কারণে এক শ্রেণির সাহিত্য অন্য শ্রেণির সাহিত্য থেকে আলাদা। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যের শুরুতেই পাওয়া গেছে কবিতা। এজন্য কবিতাকে বলা চলে সাহিত্য-শিল্পের আদি মাধ্যম। নাটকের বয়স কবিতার মতো অত নয়; কিন্তু নাটকও বেশ পুরনো। যিশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ বছর আগে গ্রিসে রচিত হয়েছিল অপূর্ব সব নাটক। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত নাটকের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে।

প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ছোটগল্প –সাহিত্যের এ-সকল মাধ্যম তুলনামূলকভাবে নবীন। যে ধরনের রচনাকে আমরা উপন্যাস বলে চিনি, তার উদ্ভবের বয়স তিন-চারশ বছরের বেশি নয়। আর ছোটগল্পের বয়স তো আরো কম। তবে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে উপন্যাসের স্থান সবার ওপরে। আগেই বলেছি, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের (Form) মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যের মূল উপজীব্য মানব-জীবন ও মানব-সমাজ। মানব-জীবন ও মানব-সমাজ কখনো কবিতায়, কখনো নাটকে, কখনো উপন্যাসে, কখনো প্রবন্ধে, কখনো বা ছোটগল্পে ধরা পড়ে। সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিকেরই রয়েছে একান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নীতি ও রীতি, যার কারণে এক প্রকার মাধ্যম অন্য মাধ্যম থেকে আলাদা। উপন্যাসেরও রয়েছে তেমন কিছু স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলে উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের পক্ষে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সহজ হবে।

উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ

শুধু কতকগুলো শব্দের সাহায্যে কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মকে সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। কারণ তাতে ঐ বিশেষ শিল্পকর্মের সকল বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। এ-কারণে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সৃষ্টিশীল বিষয়ের কোনো সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করাও দুরূহ। উপন্যাসের সকলের কাছে সমানভাবে গৃহীত কোনো সংজ্ঞার্থ নেই। সাধারণভাবে বলা যায়– গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তবসম্মত কাহিনিকে অবলম্বন করে যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয়, তাকে উপন্যাস বলে। উপন্যাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Novel. শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে ইতালীয় শব্দ novella থেকে; আর এর অর্থ হচ্ছে 'tale, piece fo news'। উপন্যাসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে J. A. Cuddon তাঁর 'Dictionary of Literary Terms'-এ লিখেছেন 'It is a form of story or prose-narrative containing characters, action and incidents and perhaps a plot'. অন্যভাবে বলা যায়, 'Novel is a fictitious prose-narrative or tale presenting a picture of the man and women portrayed'.

'উপন্যাস' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় উপ+নি+অস্; অর্থাৎ 'উপ' পূর্বক, 'নি' পূর্বক 'অস্' ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যোগে 'উপন্যাস' শব্দটি গঠিত।

মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত রূপ। জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালবাসা-ঘৃণা –এ-সকল বিপরীতমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হাত ধরাধরি করে চলে। সুখের উল্টো পিঠেই যেন থাকে দুঃখ, আনন্দের পাশেই থাকে বেদনা। একজন ঔপন্যাসিক মানুষের সমগ্র জীবনকে যেহেতু তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ করতে চান, ফলে তাঁকে অর্জন করতে হয় জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা। কিন্তু জীবন বড় জটিল এবং সূক্ষ্ম, আর তার চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও বিচিত্র মানুষের মন। সুতরাং ঔপন্যাসিককে মানুষের জীবনের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয়। কারণ তিনি মানব-মনের গহিনে ভ্রমণ করেন।

পদ্যভাষায়ও উপন্যাস লেখা চলে; তবে সাধারণভাবে গদ্যই উপন্যাসের মাধ্যম। সাহিত্যমাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের সবচেয়ে শক্তির দিক এই যে, মানবজীবনের বৈচিত্র্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে এ মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। মানুষের সংলাপ ও উচ্চারণের বৈচিত্র্য, ব্যক্তি-মানুষের ভিন্নতা, আচার-আচরণ ও রীতি-রেওয়াজের নানা রূপ উপন্যাসের শরীরে সহজেই আঁটানো যায়।

উপন্যাসের উপাদান ও গঠনরীতি

উপন্যাসের প্রধান উপাদান ৫টি:

১. কাহিনি বা প্লট (Plot),
২. চরিত্র (Character),
৩. সংলাপ (Dialogue),
৪. ভাষা (Diction),
৫. ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন (Author's philosophy or thought)।

একটি উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে তাতে একটি কাহিনি থাকতে হবে এবং সেই কাহিনি খুব ছোট হবে না। কাহিনিটি কতকগুলো চরিত্রকে অবলম্বন করে বিকশিত, পল্লবিত এবং পরিণামমুখী হয়ে উঠবে। চরিত্রগুলোর বিকাশের প্রয়োজনে লেখক সংলাপের সাহায্য গ্রহণ করেন, উপযোগী ভাষাভঙ্গি নির্বাচন করেন এবং উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনকে পাঠকের সামনে ক্রমশ উন্মোচন করেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, সকল শিল্পেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের সার্বিক সত্যকে প্রকাশ করা। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মানুষ। কিন্তু সে মানুষ আমাদের চারপাশের টুকরো টুকরো মানুষ নয়; অখণ্ড, অবিভাজিত মানুষ। একজন মানুষ তাঁর জীবনের নানা কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন, তিনি হয়তো বেঁচেও থাকেন দীর্ঘদিন। ঔপন্যাসিক যখন তার জীবনের নির্বাচিত অংশ উপন্যাসে অঙ্কন করেন, তখন কিন্তু তাকে খণ্ডিত করা হয় না। আমরা প্রতিদিন যে সকল কর্মসম্পাদন করি, তার সবকিছুই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মূল্যবান নয়, এমন কি

প্রতিদিনের জন্যও মূল্যবান নয়। সে কারণে ঔপন্যাসিক জীবনের সেই অংশগুলোকেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নির্বাচন করেন, যা চরিত্রের সমগ্র সত্তাকে প্রতিবিম্বিত করে। ঘটনা নির্বাচনের কৃতিত্বের ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করে উপন্যাসের সাফল্য বা ব্যর্থতা।

একই সঙ্গে ঔপন্যাসিককে স্থান-কালের নির্বাচনের ব্যাপারেও হতে হয় সতর্ক। কোন্ সময়ের বা কোন্ সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা বিকশিত হচ্ছে তাকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়। কার্যকারণ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে উপন্যাসের চরিত্র এবং স্থান-কালের ব্যবহারে যে ঔপন্যাসিক যত সতর্ক তাঁর উপন্যাস তত সার্থক।

জহির রায়হান রচিত 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে আমরা দেখবো, এ-উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র মন্তু আর টুনি। এখানে ঔপন্যাসিক তাদের জীবনের সেই সময় এবং কর্মকে শব্দে রূপ দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঐ দুটি মানব-মানবীর চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিকে পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাদের জীবনের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট স্থান-কালের নির্বাচিত ঘটনা অবলম্বন করেই পাঠককে একটি সামগ্রিক (Total) ধারণা প্রদানে সমর্থ হয়েছে। আর ঐ প্রধান চরিত্র দুটোকে বিকশিত এবং বিশ্বাস্য করে উপস্থাপনের জন্য লেখক একটি সামাজিক পরিমণ্ডল এবং সামাজিক সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগ

আগেই বলেছি, সৃষ্টিশীল বিষয়ের ব্যাপারে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো মত নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ। উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগের বেলাতে সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের মধ্যে সে কারণেই রয়েছে মতভেদ। অধিকাংশের মতে ঘটনা-প্রধান উপন্যাসকে প্রধানত চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। সেগুলো হল :

১. সামাজিক উপন্যাস
২. ঐতিহাসিক উপন্যাস
৩. পৌরাণিক উপন্যাস
৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

১. সামাজিক উপন্যাস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই তাঁর অবস্থান এবং সমাজকে কেন্দ্র করেই তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। যে উপন্যাসে সমাজ-জীবনের বাস্তব ঘটনা বা কাহিনিই প্রধান অবলম্বন, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়াবলি যেমন পরিবার, রাজনীতি, দেশ, ধর্ম, দর্শন স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নেয় সামাজিক উপন্যাসে। সমাজের সম্ভাবনা, তার সবলতা-দুর্বলতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ঔপন্যাসিক কখনো সহমর্মিতায় কখনো বা সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামাজিক উপন্যাসে উপস্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' ও 'চোখের বালি'; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ', 'দেনা পাওনা' ও 'গৃহদাহ'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন', 'গণদেবতা', 'ধাত্রীদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতি, 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি'; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' এবং শওকত ওসমানের 'জননী' প্রভৃতিকে সামাজিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইতিহাসের বিশাল জগৎ থেকে কোনো চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে যে উপন্যাস রচিত হয় তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত না করে ঔপন্যাসিক নতুন করে তার মধ্যে একটি তাৎপর্য আবিষ্কারের বাসনা থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তবে সবসময় লেখকের পক্ষে ইতিহাসের উপাদানকে অবিকলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লেখক তাতে কল্পনার রঙ মিশিয়ে দেন। এতে ইতিহাস বিকৃত হয় না, বরং নতুন তাৎপর্য লাভ করে; পাঠকের সামনে প্রচলিত ইতিহাসকে নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ' ও 'চন্দ্রশেখর'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি', 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

৩. পৌরাণিক উপন্যাস

পুরাণ বা মিথ অবলম্বনে যে-সকল উপন্যাস রচিত হয়, তাকে বলা যায় পৌরাণিক উপন্যাস। আদিকালের মানব-সমাজের লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের সংস্কারকে আমরা পুরাণ বলে জানি। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা ইলিয়াড, অডিসিতে সেকালের মানুষের যে কর্মকাণ্ড বা আচার-আচরণের পরিচয় পাই তাকে আমরা পৌরাণিক জগতের বিষয় বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিককালের অনেক লেখকই পুরাণের জগতের কাহিনি অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনির প্রেরণায় রচিত জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসটি সমগ্র পৃথিবীর উপন্যাস-সম্পর্কিত ধারণাকে এক সময় প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় সত্যেন সেন 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' নামে দুটি অসাধারণ পৌরাণিক উপন্যাস রচনা করেছেন। সেলিনা হোসেনের 'কালকেতু ও ফুল্লরা'কেও এক অর্থে পৌরাণিক উপন্যাস বলা যায়।

৪. আঞ্চলিক উপন্যাস

কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের হাসি-কান্না এমনকি তাদের আচরণ ও উচ্চারণ অবিকৃত ভঙ্গিতে যে-সকল উপন্যাসে স্থান পায় সেগুলোকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। একই দেশের মধ্যে হলেও, প্রতিটি অঞ্চলেরই থাকে কিছু স্বাতন্ত্র্য। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যেও বেশ লক্ষযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। একজন ঔপন্যাসিক যখন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের এই সাংস্কৃতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলে কোনো উপন্যাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন, তখনই আঞ্চলিক উপন্যাস সার্থকতা লাভ করে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'; সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'; দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'; আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী'; অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

এছাড়াও গঠনকৌশল, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পচেতনার পার্থক্যের দিক থেকে উপন্যাসকে আরও অনেকভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়। যেমন, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ভ্রমণ-উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, গোয়েন্দা উপন্যাস, প্রতীকী উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস প্রভৃতি।

ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। দানিয়েল ডিফো তাঁর 'রবিন্সন ক্রুশো' (১৭১৯) রচনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষকে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু করে তুললেন এবং বিশ্বসাহিত্যের কাছে পৌঁছে দিলেন এই বার্তা যে, গোষ্ঠী-জীবনের যে সাহিত্য সমগ্র মধ্যযুগে চর্চার প্রধান বিষয় ছিল, তার কাল ফুরিয়েছে। এই নতুন ধরনের সাহিত্যমাধ্যম সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ডিকেন্স ও জর্জ এলিয়ট, বালজাক ও জোলা, দস্তয়ভস্কি ও টলস্টয় তাঁদের অসাধারণ রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের কালে উপন্যাসকে মহত্তম শিল্পমাধ্যমে পরিণত করেছে।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব

এ-কথা প্রায় আমরা সবাই মেনে নিয়েছি যে, বাংলা উপন্যাস ইংরেজি সাহিত্যের সরাসরি প্রভাবে উদ্ভূত এবং সমৃদ্ধ। তবে অনেক প্রাচীন সাহিত্যেই উপন্যাসের নানা লক্ষণ ও ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায় উপন্যাসের বেশ কিছু পূর্ব-লক্ষণ। বাংলা ভাষায় রচিত লৌকিক ধর্ম-সাহিত্য, যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী-কীর্তনের পাশাপাশি সমকালীন মানুষ, তাদের জীবনের নানা জটিলতা ও সম্ভাবনা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়াও চৈতন্য-বিষয়ক সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, বাংলা রোমান্সমূলক কাব্যগুলোতে পাওয়া যায় উপন্যাসের নানাবিধ লক্ষণ ও চিহ্ন। পুরনো সাহিত্যে উপন্যাসের যে লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তা একটি কথা প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষায় উপন্যাস একেবারে 'নিরবচ্ছিন্ন বিস্ময় বা অজ্ঞাত প্রহেলিকার মতো' হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসের ছদ্মবেশী উপস্থিতি এবং সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল, ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শ তার রূপ, রীতি ও প্রকৃতি গঠনে সহায়তা করেছে।

উপন্যাস সৃষ্টির জন্য গদ্যের যে সাবলীলতা প্রয়োজন তার আয়োজন চলে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে। তখন বাংলা অঞ্চলে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর গদ্যই হচ্ছে সংবাদপত্রের বাহন। ১৮১৮ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের পর থেকে সামাজিক-ধর্মীয় বা সমাজসংস্কারমূলক সকল কর্মকাণ্ডের প্রচারক্ষেত্র হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায় তাঁর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলকাতার তৎকালীন সমাজ-জীবনে যে বিক্ষোভ ও তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতই ধরা পড়ল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। শুধু তর্ক-বিতর্কই নয়, দেশের বাস্তব

জীবনের ছবিও ক্রমে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উঠে আসতে লাগল। এজন্য বলা হয়, 'উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হয়েছে'। সংবাদপত্রের এই সামাজিক প্রভাব বাংলা গদ্যের চেহারাকে একদিকে যেমন বদলে দিল, পাশাপাশি দেশ জুড়ে তৈরি করলো সংবাদভুক পাঠক-শ্রেণি। নব-উদ্ভূত এই পাঠক-শ্রেণির চাহিদাও বাংলা ভাষায় উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-কে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতাকেন্দ্রিক সামাজিক জীবনের বাস্তব বর্ণনায়, চরিত্র-চিত্রণে ও মননশীলতায় 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে সজীব ও প্রাণবন্ত।

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে গণ্য। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। কাহিনি নির্মাণে, চরিত্র চিত্রণে ও ভাষার ব্যবহারে এ উপন্যাসে তিনি যে রূপ ও রীতি নির্ধারণ করেন, বহুদিন পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস তার বাইরে যেতে পারেনি। 'দুর্গেশনন্দিনী' ছাড়াও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের নানামুখী উপন্যাসপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বঙ্কিমের সমকালে উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর রচিত 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাধিক। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাস ও সমাজচেতনার যে ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে অবিকল সে ছবি আঁকলেন না। প্রাথমিক অবস্থায় ইতিহাস অবলম্বনে দু'-একটি উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসই সমাজ, মনস্তত্ত্ব ও রাজনীতি-নির্ভর। 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'গোরা' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ উপন্যাস। প্রকৃতপক্ষে এ সকল উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাস উপনীত হয় আন্তর্জাতিক মানে।

বাংলা উপন্যাসকে সাধারণ পাঠকের কাছে জনপ্রিয় ও সমাদৃত করে তোলার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকার কোনো তুলনা নেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী এই ঔপন্যাসিক বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা অসামান্য ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে দীর্ঘকালের অবহেলিত নারী-সমাজের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি ও দরদ। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষার নিপুণ তুলিতে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। তা ছাড়া হিন্দু সমাজের নানা আচরণ এবং সংস্কারের চিত্রও শরৎচন্দ্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রচিত 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (চার খণ্ড, ১৯১৭-৩৩), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'গৃহদাহ ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩), 'পথের দাবী' (১৯২৬) প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে নানারূপ বৈচিত্র্য। জীবন-চিত্রণের ক্ষেত্রে, উপন্যাসের গঠন-কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে, জীবনোপলব্ধিতে ও তার প্রকাশে এ-সময়ের উপন্যাস বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য অর্জন করেছে। অনেক শক্তিমান ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাস সমৃদ্ধ থেকে ক্রমশ সমৃদ্ধতর হয়েছে। যাঁদের রচনার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস অর্জন করেছে এই সিদ্ধি তাঁদের মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-৮৩), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-৬৫), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-৮০), কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-৭৯), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-৮৬), বনফুল (১৮৯৬-১৯৭৯), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার পরও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের তুলনায় বাংলাদেশের উপন্যাস চরিত্র ও চিত্রে স্বতন্ত্র। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতা, কৃষিনির্ভর

জীবন, জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বোধ এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের একটি অনিবার্য পার্থক্য তৈরি করেছে। সাতচল্লিশের দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ যে স্বতন্ত্র জীবনধারা অর্জন করেছে মূলত তার ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের উপন্যাস। সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও বাস্তব জীবন উপন্যাসে যতটা প্রতিফলিত হয় অন্য কোনো সাহিত্য-মাধ্যমে ততটা হয় না। সে কারণেই বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের কয়েক দশকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলাদেশের উপন্যাসে ধরা পড়েছে তার নিখুঁত ছবি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক প্রভাবশালী ঘটনা। ভাষার প্রশ্নে এবং শহিদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হল তা বাঙালি জীবনকে নিয়ে গেছে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের দিকে। সে পরিবর্তনের জোয়ার তীব্রতর হয়েছে আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনেও। এর পরিণাম হিসেবে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। এ সকল ঘটনা বাংলাদেশের সমাজ ও জনজীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বাঙালির চেতনায় যে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের উপন্যাসে। তার একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লিজীবন অপরদিকে আধুনিক দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন; একদিকে বাংলাদেশের ঐশ্বর্যময় বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা, অপরদিকে আধুনিক মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, অপরদিকে রোমান্টিক কল্পনার বিলাস; একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্থিরতা, অপরদিকে হৃদয়ের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ –সবই বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানে উপন্যাস কোনো পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতায় রচিত হয়নি। ফলে নানা বিষয়ে নানা ধরনের উপন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। নানা বিষয় ও ভঙ্গিতে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসগুলোকে পরিচিতির সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১. গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু', 'কাঁদো নদী কাঁদো', আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী', সরদার জয়েনউদ্দীনের 'আদিগন্ত', জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে', আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', কাজী আফসার উদ্দিনের 'চর ভাঙা চর', শওকত ওসমানের 'জননী', আবুল মনসুর আহমদের 'আবেহায়াত' এ ধারার রচনা।

২. নগরজীবনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

আবুল ফজলের 'জীবন পথের যাত্রী', রশিদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' ও 'প্রসন্ন পাষাণ', আবু রুশদের 'সামনে নতুন দিন', 'ডোবা হল দীঘি' ও 'নোঙর', দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা', আমজাদ হোসেনের 'অসামাজিক কাহিনী', নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে', আহসান হাবীবের 'অরণ্য নীলিমা', আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'নাম না জানা ভোর' এ ধারার উদাহরণ।

৩. নগর ও গ্রামের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা', শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', সরদার জয়েনউদ্দিনের 'অনেক সূর্যের আশা', আবুল মনসুর আহমদের 'জীবনক্ষুধা', আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত', আনোয়ার পাশার 'নীড় সন্ধানী' ইত্যাদি।

৪. আঞ্চলিক জীবনচিত্র প্রধান উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী', তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে', শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ', শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' ও 'কাঞ্চনমালা', সরদার জয়েনউদ্দিনের 'পান্নামতি' ইত্যাদি।

৫. মনস্তত্ত্ব ও দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস

আলাউদ্দিন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ও 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন', রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' ও 'অনুকল্প', সৈয়দ শামসুল হকের 'দেয়ালের দেশ', 'এক মহিলার ছবি', 'অনুপম দিন' ও 'সীমানা ছাড়িয়ে', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা', শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' ইত্যাদি।

৬. ঐতিহাসিক চেতনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস

শামসুদ্দিন আবুল কালামের 'আলম নগরের উপকথা', সরদার জয়েনউদ্দিনের 'নীল রঙ', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' ইত্যাদি উপন্যাস ঐতিহাসিক ধারার রচনা।

হাজার বছর ধরে : উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) ছিলেন নানামুখী প্রতিভার অধিকারী। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, চিত্রপরিচালক এবং চিত্রপ্রযোজক হিসেবে সমকালে এবং আজও জহির রায়হানের সুখ্যাতি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র থাকাকালেই তিনি লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুরুতে কিছুদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত থাকলেও মূলত তিনি আমৃত্যু চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জহির রায়হান যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা সুলভ নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও মানবতার যে অবমাননার কথা তিনি সেলুলয়েডে বন্দী করে রেখেছেন, তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক নির্ভরযোগ্য ও অসামান্য দলিল। সাহিত্য রচনার শুরুতে তিনি গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হলেও উপন্যাস রচনাতেই তাঁর সাফল্য সর্বাধিক। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই জহির রায়হানের অধিকাংশ উপন্যাসে চলচ্চিত্রের কাহিনি-নির্মাণ ও সংলাপ-পদ্ধতি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এর ফলে তাঁর উপন্যাসগুলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ নতুন শিল্পভঙ্গিতে নির্মিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে লক্ষ করা যায় সমাজ, রাজনীতি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন সম্পর্কে কতকগুলো মৌলিক প্রশ্ন। সে প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো লেখক প্রদান করেননি, কিন্তু পাঠকের মনকে নতুন চিন্তার সূত্র প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। এর আগে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'সূর্যগ্রহণ' (১৯৬৫) এবং একটি উপন্যাস 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০) প্রকাশিত হয়েছিল। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটিতে লেখক বস্তুত হাজার বছরের নিস্তরঙ্গ কিন্তু প্রবহমান গ্রাম-বাংলাকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উপস্থাপন করলেন। উপন্যাসটির নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতার চরণ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় (হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি)। টুনি, মন্তু, আম্বিয়া, বুড়ো মকবুল –এরা কেবল এক-একটি চরিত্রই নয়, এক বিশাল ব্যাপ্ত সময়ের প্রতিনিধি।

'হাজার বছর ধরে' জহির রায়হানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতার দীর্ঘ পরিসরকে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনার পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যে গ্রামীণ জীবন 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের পটভূমি, সেখানে প্রবল কোনো চলমানতা নেই। প্রথাবদ্ধ, নিস্তরঙ্গ, উন্নয়নবিহীন গ্রামীণ বাস্তবতা এবং গ্রামের সহজ সরল প্রায় নিরক্ষর মানুষের জীবনসত্য উঠে এসেছে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে। কিন্তু লেখক পশ্চাৎপদ সমাজ-ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির মধ্যেও খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছেন চিরকালের মানবিক আবেগ ও তার প্রাণময় স্পন্দন। এ উপন্যাসে লেখক কোনো শক্তিশালী চরিত্র সৃষ্টি কিংবা চরিত্রের উত্থান-পতন না দেখিয়ে সন্ধান করেছেন জীবনের অখণ্ডরূপ। আর সে অখণ্ড রূপের এক একটি উপকরণ হিসেবে বুড়ো মকবুল, সুরত আলী, ছমির শেখ, গনু মোল্লা, রশীদ, আবদুল, মন্তু, টুনি, আম্বিয়া, হালিমা, হীরন, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা প্রভৃতি চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামের ঐ সকল মানুষের জীবনে ঘটনার তেমন কোনো বৈচিত্র্য নেই। অতি সাধারণ তাদের চাওয়া-পাওয়া। তাদের জীবনের দিগন্ত প্রসারিত নয়, তাদের জীবনের চিরসঙ্গী দারিদ্র্য, ঈর্ষা, কলহ আর অবুঝ ভালোবাসা। জহির রায়হান জীবনের চিরন্তনতার বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন এই উপন্যাসে। সামন্ত সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, নারীর প্রতি পুরুষের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কনে জহির রায়হান সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। বুড়ো মকবুল যখন জোড়া বউকে ঢেঁকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে, তখন পাশের বাড়ির আম্বিয়ার যে গান ভেসে আসে, তার মধ্য দিয়েই যেন সমাজের মুক্তিহীন কারাগারে বন্দি নারীজীবনের শূন্যতা, অচরিতার্থতা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণা প্রকাশিত হয় : 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুদের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে।' উপন্যাসে শোষণমূলক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীকে ভারবাহী পশুতে রূপান্তরিত করেছে। এ যেন সুস্থ জীবনের বিপরীতে মানবতার এক করুণ পরাজয়।

গ্রামীণ জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার ছবি অঙ্কনের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে জীবনের আবহমান ও চিরকালীন রূপটিও সন্ধান করেছেন। নিস্তরঙ্গ, ঘটনাবিহীন একঘেঁয়ে জীবনের মধ্যে মন্তু, টুনি, আম্বিয়া বা বুড়ো মকবুল চরিত্রের গতিশীলতা উপন্যাসটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

জহির রায়হানের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে : 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮), 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) ও 'আর কতদিন' (১৯৭০) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদিরূপ কোনটি?

ক. কবিতা খ. উপন্যাস

গ. মহাকাব্য ঘ. গীতিকাব্য

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে সমাজের সংস্কার ফুটে উঠেছে–

ক. বৌদ্ধ খ. হিন্দু

গ. জৈন ঘ. বাহাই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মানব জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহার। এ জীবনে আছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, ভালবাসা-ঘৃণা। মানব জীবনের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো বর্ণনাত্মক রীতিতে গদ্য ভাষায় সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখায় উপস্থাপিত হয়।

৩. উদ্দীপকের বক্তব্যটি সাহিত্যের কোন শাখাকে নির্দেশ করে?

ক. উপন্যাস খ. নাটক

গ. মহাকাব্য ঘ. গীতিকবিতা

৪. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত অংশটির মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

ক. জীবন রূপায়ণে খ. জীবনের অভিজ্ঞতায়

গ. জীবনে প্রতিষ্ঠায় ঘ. জীবনে অধঃপতনে

হাজার বছর ধরে

জহির রায়হান

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- উপন্যাসটির পটভূমি বলতে পারবেন;
- প্রধান দুটো চরিত্রের প্রাথমিক পরিচয় বলতে পারবেন;
- সাধারণ মানুষের জীবনে লোক-বিশ্বাসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গ্রামের নারী-সমাজের কর্মক্লিষ্ট জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

মস্ত বড় অজগরের মতো সড়কটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিস্তীর্ণ ধান খেতের মাঝখান দিয়ে।
মোঘলাই সড়ক।
লোকে বলে, মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে শাহ সুজা যখন আরাকান পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন যাবার পথে কয়েক হাজার মজুর খাটিয়ে তৈরি করে গিয়েছিলো এই সড়ক।
দুপাশে তার অসংখ্য বটগাছ। অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দীর্ঘকাল ধরে। ওরা এই সড়কের চিরন্তন প্রহরী।
কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা।
মাঝে মাঝে ধান খেত সরে গেছে দূরে। দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি। অথই পানি। শেওলা আর বাদাবনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুলিয়ে নাচে অগণিত শাপলার ফুল।
ভোর হতে আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োরা ছুটে আসে এখানে। এক বুক পানিতে নেমে শাপলা তোলে ওরা। হৈ-হুল্লোড় আর মারামারি করে, গালাগাল দেয় একে অন্যকে। বাজারে দর আছে শাপলার। এক আঁটি চার পয়সা করে।
কিন্তু এমনো অনেকে এখানে শাপলা তুলতে আসে, বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করা যাদের ইচ্ছে নয়।
মন্তু আর টুনি ওদেরই দলে।
ওরা আসে ধল-পহরের আগে, যখন পূর্ব আকাশের শুকতারা ওঠে। তার ঈষৎ আলোয় পথ চিনে নিয়ে চুপি চুপি আসে ওরা। রাতে শিশিরে ভেজা ঘাসের বিছানা মাড়িয়ে ওরা আসে ধীরে ধীরে। টুনি ডাঙায় দাঁড়িয়ে থাকে।
মন্তু নেমে যায় পানিতে।
তারপর, অনেকগুলো শাপলা তুলে নিয়ে, অন্য সবাই এসে পড়ার অনেক আগে সেখান থেকে সরে পড়ে ওরা।
পরির দীঘির পাড়ে দুজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। শাপলার গায়ে লেগে থাকা আঁশগুলো বেছে পরিষ্কার করে।
মন্তু বলে, বুড়ো যদি জানে তোমারে আমারে মাইরা ফালাইবো।
টুনি বলে, ইস্, বুড়ার নাক কাইটা দিমু না।
নাক কাইটলে বুড়ো যদি মইরা যায়?
মইরলে তো বাঁচি। বলে ফিক করে হেসে দেয় টুনি, বলে, পাখির মতো উইড়া আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।
বলে আবার হাসে, সে হাসি আশ্চর্য এক সুর তুলে পরির দীঘির চার পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এ দীঘি এককালে এখানে ছিলো না।

আশেপাশের গাঁয়ের ছেলে-বুড়োদের প্রশ্ন করলে তারা মুখে মুখে বলে দেয় এ দীঘির ইতিহাস। কেউ চোখে দেখেনি, সবাই শুনেছে। কেউ শুনেছে তার বাবার কাছ থেকে। তার বাবা জেনেছে তার দাদার কাছ থেকে। আর তার দাদা শুনেছে তারও দাদার কাছ থেকে।

সে অনেক বছর আগে।

তখন সড়ক ছিলো না। কিছুই ছিলো না এখানে। শুধু মাঠ, মাঠ আর মাঠ। সীমাহীন প্রান্তর। বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে পরিরা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে । ওরা নাচতো, গাইতো, খেলতো।

লাল পরি, নীল পরি আর সবুজ পরি। পরিদের অনেকের নামও জানা আছে এ গাঁয়ের লোকের। পুঁথিতে লেখা আছে সব। একদিন হঠাৎ পরিদের খেয়াল হল, একটা দীঘি কাটবে। যার পানিতে মনের আনন্দে সাঁতার কাটতে পারবে ওরা। ডুব দিয়ে পানি ছিটিয়ে, ইচ্ছেমতো হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।

আকাশ থেকে খন্তা কোদাল আর মটি ফেলবার ঝুড়ি নিয়ে এলো ওরা।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।

রূপোলি জোছনার স্নিগ্ধ আলোয় ভরেছিলো এই সীমাহীন প্রান্তর। দক্ষিণের মৃদু বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিলো পরিদের হাসির শব্দ।

কথায় গানে আর কাজে।

রাত ভোর হবার আগে দীঘি কাটা হয়ে গেলো।

পাতাল থেকে কলকল শব্দে পানি উঠে ভরে গেলো দীঘি।

সেই দীঘি।

তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম। এক নয়, অনেক।

গভীর রাতে ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম করে গ্রামগুলো।

জোড়া বউকে ঢেঁকির ওপরে তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল। পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান। আরো জোরে চাপ দাও না, হুঁ। এমনভাবে গর্জে ওঠে মকবুল, যেন খেতে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে। হুঁ, হট হট। হুঁ, আরো জোরে। আরো জোরে। ধমক খেয়ে ঢেঁকিতে আরো জোরে চাপ দেয় ওরা। টুনি আর আমেনা। পাশের বাড়ি থেকে আম্বিয়ার গান শোনা যায়। 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার, স্বপ্নে গেলো চইলারে। দুধের মতো সুন্দর কুমার কিছু না গেলো বইলারে'।

ঢেঁকিতে চড়লেই গান গাওয়ার সখ চাপে আম্বিয়ার। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট-হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি তীক্ষ্ণ। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। এত দ্রুত তালে ধান ভানতে থাকে, মনে হয় ঢেঁকিটাই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ধান ভানা শেষ হলে গায়ে দর দর ঘাম নামে ওর। একটা চাটাইয়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নেয় আম্বিয়া।

ঢেঁকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বারবার আম্বিয়ার কথা মনে পড়ছিলো বুড়ো মকবুলের। দাঁত মুখ খিঁচে বউদের আবার ধমক মারল ও শুনছনি, আম্বিয়া কেমন ধপাস ধপাস কইরা ধান বাইনতাছে। আর তোরা, কিছু না, বলে বার কয়েক মাটিতে থুতু ফেললো মকবুল। বাঁ হাতে কপালের ঘামগুলো মুছে নিলো সে।

দাওয়ার ওপাশে পিদিম হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো ফকিরের মা। সেখান থেকে বললো, আহা মকবুল! বউগুলোর বুঝি এই রাতেরবেলাও আর শান্তি দিবি না তুই। সারাদিন তো খাঁটাইছস, এহন এই দুপুর রাইতেও–, বলে টুনি আর আমেনার জন্য আফসোস করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেলো ও।

এ বাড়িতে মোট আট ঘর লোকের বাস।

সামনে নুয়ে পড়া ছোট ছোট ঘরগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। বাঁশের তৈরি বেড়ার ভাঙা অংশগুলো তালপাতা দিয়ে মোড়ান। চালার স্থানে স্থানে খড়কুটো উঠে ফুটো হয়ে গেছে। দিনের সূর্য আর রাতের চাঁদ এসে একবার করে সে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে যায় ঘরের ভেতরে। আম কাঁঠাল পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ। মাঝে মাঝে ছোট বড়

অনেকগুলো সুপুরি আর নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে অনেক আগে। দুএকটা খেজুর গাছও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। ছোট পুকুর। পুকুরে সিঙ্গ কই আর মাগুর মাছের কমতি নেই। দিনরাত শব্দ করে ঘাই দেয় ওরা। পানিটাকে সারাক্ষণ ঘোলাটে করে রাখে। সামনে মাঝারি উঠোন। শীত কিংবা গ্রীষ্মে শুকিয়ে একরাশ ধুলো জমে। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা। কাদার ওপর ছোট ছোট ব্যাঙ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। হাঁস কি মোরগে দেখলেই তাড়া করে ওদের। ধরে ধরে মারে। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে ওর অবস্থাটা কিছু ভালো।

মকবুল তিন বিয়ে করেছে। তিন বউই বেঁচে আছে ওর।

বড় বউ আমেনা। কালো মোটা আর বেঁটে। বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছেছে এবার। খুব ঘন ঘন কথা বলে। কথা বলার সময় পোকায় খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ছিটিয়ে সামনের লোকগুলোকে ভিজিয়ে দেয়। পারিবারিক কলহ বাধলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি দেখায়।

মেজ ফাতেমা। দেখতে রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। বছরের তিন মাস পেটের অসুখে ভোগে। ছমাস বাপের বাড়িতে কাঁটায়। বয়সের হিসেবটা সে নিজেও জানে না। কেউ পনেরো বললেও সায় দেয়। পঁচিশ বললেও মেনে নেয়।

সবার ছোট টুনি। গায়ের রং কালো। ছিপছিপে দেহ। আয়ত চোখ। বয়স তার তের-চৌদ্দর মাঝামাঝি। সংসার কাকে বলে সে বোঝে না। সমবয়সী কারো সঙ্গে দেখা হলে সব কিছু ভুলে মনের সুখে গল্প জুড়ে দেয়। আর হাসে। হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

বুড়ো মকবুলের পরিবারে আরো একজন আছে।

নাম তার হীরন। ও তার বড়মেয়ে। বড় বউ-এর সন্তান। এবার দশ ছেড়ে এগারোয় পড়লো সে। এখন থেকে মকবুল ওর বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। দুএক জায়গায় এর মধ্যে সম্বন্ধও পাঠিয়েছে সে। বড়, মেজ আর ছোট এই তিন বউ নিয়ে মকবুলের সংসার। তিন বউকে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো জমিজমা নেই ওর। আসলে বউদের আয় দিয়ে চলে ও। বড় দুই বউ দিব্যি আয় করে। বাজার থেকে পাতা কিনে এনে দিয়েই খালাস মকবুল। দুই বউ মিলে একদিনে তিন চারটে চাটাই বুনে শেষ করে। মাঝে মাঝে টুনিও বসে পড়ে ওদের সঙ্গে, কাজ করে। চাটাইগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভের অংশ দিয়ে পেঁয়াজ, লঙ্কা আর পান-সুপুরি কেনে মকবুল।

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোট জমিটা তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল। নিজেও সঙ্গে থাকে। মাটি কুপিয়ে কুমড়ো আর শিমের গাছ লাগায়। দুবেলা জল ঢেলে গাছগুলোকে তাজা রাখে। সুখ আছে আবার সুখ নেইও মকবুলের জীবনে। তিন বউ যখন ঝগড়া বাধিয়ে চুল ছেঁড়ার লড়াই শুরু করে তখন বড় বিষাদ লাগে ওর। হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে তিন জনকে সমানে মারে সে। কাউকে ছাড়াছাড়ি নেই।

মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মার।
তার পাশেরটা আবুলের।
তার পাশে থাকে রশিদ।
পাশাপাশি তিনটে ঘর।

সবার দক্ষিণে যে ঘরটা সবার চেয়ে ছোট, ওটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। বাবা মা ভাইবোন কেউ নেই। বাবাকে হারিয়েছে ও জন্মের মাসখানেক আগে। মাকে, দশ বছর বয়সে। লোকে বলে, মন্তু নাকি বড় একগুঁয়ে আর বদমেজাজি। স্বভাবটা ঠিক জানোয়ারের মতো।

টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ নাকি এ জন্মে আর দেখেনি সে।

আহা অমনটি আর হয় না।

ওপাশে আর কোনো ঘর নেই।

পশ্চিমের সারে, দক্ষিণের ঘরটা মনুর।

তার পাশে থাকে সুরত আলী।

তার পাশে গনু মোল্লা।

গনু মোল্লা নির্ভেজাল মানুষ। কারো সাতেও থাকে না। পাঁচেও না। জমিজমা নেই। চাষবাসের প্রশ্ন ওঠে না। সারাদিন খোদার এবাদত করে। যেখানে যায় তসবির ছড়াটা হাতে থাকে তার। আপন মনে তসবিহ পড়ে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব : ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৬ সালে। সম্রাট বাবর ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের পর আকবর ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান সিংহাসনে বসেন। কিন্তু শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই গোলযোগের মধ্যে আওরঙ্গজেব তার অন্যান্য ভাই যেমন দারা, সুজা প্রমুখকে যুদ্ধে বা কূটকৌশলে হারিয়ে দিয়ে মোঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আওরঙ্গজেবের জন্ম ১৬১৮ সালে এবং তিনি ১৬৫৮ সালে সর্বশেষ শক্তিমান মোঘল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আরাকান– বর্তমানে মায়ানমারের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। **আয়ত চোখ**– টানাটানা চোখ। **ঘাই**– আঘাত। **চাঁটাই**– হোগলার পাতা বা বাঁশের চটা দিয়ে বানানো আসন বিশেষ। **চিরন্তন**– চিরকালীন; চিরকালব্যাপী। **শাহসুজা**– আওরঙ্গজেবের ভাই এবং সম্রাট শাহজাহানের পুত্র। **বাদাবন**– চাষ না হওয়া জঙ্গলযুক্ত জায়গা। **বিষাদ**– স্বাদ নেই এমন। **শুকতারা**– সূর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে যে নক্ষত্র দেখা যায়। **পুঁথি**– হাতে লেখা পুরনো দিনের গ্রন্থ। **পিদিম**– প্রদীপ শব্দটির আঞ্চলিক রূপ। **পুবের সারে**– পূর্ব দিকের সারিতে। **তল্পিতল্পা**– বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসের গাঁট; পোঁটলা-পুঁটলি। **নির্ভেজাল**– ভেজালহীন। **ধলপহর**– ভোর হওয়ার আগে যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে একটু একটু করে আলো ফুটতে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

কথিত আছে, কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কটি তৈরি করেছিলেন শাহ সুজা। সড়কের পাশের জলাভূমিতে ফুটে থাকে অসংখ্য শাপলা ফুল। ভোর না হতেই আশপাশের গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো অনেকেই আসে শাপলা তুলতে। মন্তু আর টুনি শাপলা তুলতে আসে আনন্দ পাবার জন্য। মন্তু টুনিকে ভয় দেখায় তাদের এই লুকিয়ে শাপলা তোলার ব্যাপারটি যদি বুড়ো মকবুল জানতে পারে তবে বিপদ হবে। যে পরির দীঘির পাড়ে বসে টুনি আর মন্তু বিশ্রাম নেয় আশপাশের গ্রামের লোকেদের ধারণা, কোনো এক বৈশাখি পূর্ণিমারাতে আকাশ থেকে পরিরা নেমে এসে এক রাতের মধ্যে কেটেছিলো সে দীঘি। উদ্দেশ্য ছিলো, দীঘির পানিতে নেমে আনন্দ করা। এই পরির দীঘিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে অনেকগুলো গ্রাম। মোট আটঘর লোকের বাস মকবুলদের বাড়িতে। ছোট ছোট ঘর, বাঁশ আর তালপাতার তৈরি – একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো। পুবের সারে উত্তরের ঘরটা মকবুলের। বাড়ির অন্য সবার চেয়ে তার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালো। তাই বিয়েও করেছে তিন তিনটা। বড় বউ আমেনা– কালো, মোটা আর বেঁটে; বয়স ত্রিশের কোঠায়। মেজ বউ ফাতেমা – রোগা, হ্যাংলা আর লম্বা। সবার ছোট টুনি– গায়ের রং কালো, ছিপছিপে দেহ। বয়স তের-চৌদ্দর কাছাকাছি। তিন বউ আর বড় বউ আমেনার মেয়ে হীরনকে নিয়ে মকবুলের সংসার। বউদের দিয়ে সে চাটাই বোনায়, ধান মাড়াই করায়, জমি চাষ করায়, খেতের দেখাশুনা করায়। মকবুলের পাশের ঘরটা ফকিরের মায়ের; তার পাশেরটা আবুলের; তার পাশে রশিদের ঘর। সবার দক্ষিণের ছোট ঘরটায় থাকে মন্তু। একা মানুষ। লোকে বলে মন্তু খুব একগুয়ে আর বদমেজাজি; কিন্তু টুনি বলে, অমন মাটির মানুষ আর হয় না। পশ্চিমের সারে দক্ষিণের ঘরটা মনুর; তার পাশে সুরত আলী আর সবার শেষে নির্ভেজাল মানুষ গনু মোল্লার ঘর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পুঁথি কী?

ক. মেশিনে ছাপা পুরনো দিনের পুস্তক   খ. হাতে লেখা আধুনিক কালের পুস্তক
গ. হাতে লেখা পুরনো দিনের পুস্তক   ঘ. মেশিনে ছাপা আধুনিক কালের পুস্তক

৬. 'স্বপ্নে আইলো রাজার কুমার' স্বপ্নে গেল চইলারে দুধের মতো সুন্দর কুমার, কিছু না গেল বইলারে।' আম্বিয়ার গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. আশা   খ. হতাশা   গ. আনন্দ   ঘ. অনুশোচনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যারা দুর্জয়ে করে জয়
তাহাদের পরিচয়
লিখে রাখে মহাকাল।

৭. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন পথের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. গ্রান্ড ট্রাংক রোড খ. আরাকান সড়ক গ. ময়নামতি সড়ক ঘ. মোঘলাই সড়ক

৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হচ্ছে–

i. সাংস্কৃতিক পরিচয় ii. অতীত ঐতিহ্য iii. দার্শনিক পটভূমি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- শিকদার বাড়ি পত্তনের ইতিহাস লিখতে পারবেন;
- বউদের দিয়ে লাঙল টানানোর জন্য মকবুলের পরিকল্পনা বলতে পারবেন;
- টুনি আর মন্তুর লুকিয়ে মাছ ধরার কাহিনি লিখতে পারবেন;
- নারী নির্যাতনের একটি অমানবিক ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

দীঘিকে কেন্দ্র করে এই গ্রাম।

কখন কোন যুগে পত্তন ঘটেছিলো এ গ্রামের কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু, এ বাড়ির পত্তন বেশি দিন আগে নয়। আশি কি খুব জোর নব্বই বছর হবে।

সেই তেরশ' সনের বন্যা।

অমন বন্যা দুচার জন্মে কেউ দেখেনি।

মাঠ ভাসলো, ঘাট ভাসলো, ভাসলো বাড়ির উঠান। ঘর ভাসলো, বাড়ি ভাসলো, ভাসলো কাজির কুশান।

কিছু বাদ নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু সব। এমন কি মানুষও ভাসলো। জ্যান্ত মানুষ। মরা মানুষ।

তাল গাছের ডগায় ঝোলান বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিলো পুঁটি মাছের ঝাঁক।

রহমতগঞ্জ কুলাউড়া নিজামপুর ভেসে সব একাকার হল।

বুড়ো কাসেম শিকদার ছিলো কুলাউড়ার বাসিন্দা।

বুড়ো আর বুড়ি। ছেলেপিলে ছিলো না ওদের। মাটির নিচে পুঁতে রাখা টাকা ভরা কলসিটা বুকে জড়িয়ে ধরে বানের জলে ভাসান দিলো বুড়ো আর বুড়ি।

কলা গাছের ভেলায় চারদিন চার রাত। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। একেবারে উপোস। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ভেলা ভাসছে আর ভাসছে।

অবশেষে এসে ঠেকল এই দীঘির পাড়ে।

লাল পরি নীল পরি আর সবুজ পরির দীঘি। ছোটখাট একটা পাহাড়ের মতো উঁচু যার পাড়।

গ্রামটা পছন্দ হয়ে গেলো কাশেম শিকদারের।

কলসি থেকে টাকা বের করে দুচার বিঘে জমি কিনে ফেললো সে। গোড়াপত্তন হল এ বাড়ির।

বাড়ির চারপাশে আম কাঁঠাল সুপুরি আর নারকেলের গাছ লাগালো কাশেম শিকদার। পুকুর কাটলো। ভিটে বাঁধলো। পছন্দ এত ঘর তুললো বড় করে। কিন্তু মনে কোন শান্তি পেল না সে। ছেলেপুলে নেই। মারা গেলে কে দেখবে এত বড় বাড়ি।

মাঝে মাঝে চিন্তায় এত বিভোর হয়ে যেতো যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকতো না তার। বুড়ি ছমিরন বিবি লক্ষ করতেন সব। বুঝতেন কেন স্বামীর মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। মনে মনে তিনিও দুঃখ পেতেন।

তারপর, একদিন জলভরা চোখে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন ছমিরন বিবি। আস্তে করে বললেন, তুমি আর একডা নিকা কর। বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। দুগণ্ড বেয়ে অবিরাম পানি গড়িয়ে পড়ছিলো।

তবু স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে দিলেন ছমিরন বিবি। হাতে মেহেদি দিলেন। মাথায় পাগড়ি পরালেন। ঘরটা লেপে মুছে নিয়ে নিজ হাতে বিছানা পাতলেন স্বামী আর তার নতুন বিয়ে করা বউ-এর জন্য। আদর করে হাত ধরে এনে শোয়ালেন তাদের। নতুন বউ-এর দিকে তাকাতে সাহস পেলেন না ছমিরন বিবি। ছুটে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে কে যেন তখন কলজেটা কুটিকুটি করে কাটছিলো তাঁর। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি। পুকুর পাড়ে ধুতরা ফুলের সমারোহ। গুনে গুনে চারটে ফুল হাতে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলো মুখে পুরে দিয়ে নীরবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দীঘির পাড়ে উঁচু ঢিপির মতো তার কবরটা আজো চোখে পড়ে সবার আগে।

ধপাস ধপাস ঢেঁকির শব্দে গমগম শিকদার বাড়ি।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বউ দুটোর গা বেয়ে দরদর ঘাম নামে। এতক্ষণে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। আঁচলটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে, সামনে হাত রাখার বাঁশের ওপরে গুটিয়ে রেখেছে দুইজনে। মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে বুক আর গলার ঘাম মুছে নিচ্ছে। ঘামে কাপড়টা চপ চপ করছে ওদের।

সেদিকে খেয়াল নেই মকবুলের। ও ভাবছে অন্য কথা।

বাড়ির ওপরের জমিটাতে লাঙল না দিলে নয়। অথচ হাল যে একটা ধার পাবে সে সম্ভাবনা নেই। লাঙল অবশ্য যা হোক একটা আছে ওর। অভাব হল গরুর। গরু না হলে লাঙল টানবে কিসে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়। মকবুল ভাবল, বউ দুটোকে লাঙলে জুড়ে দিয়ে, দূর এটা ঠিক হবে না। লোকে গালাগাল দেবে ওকে। বলবে, দেহ বউ দুইডা দিয়া লাঙল টানায়। তার চেয়ে এক কাজ করলে কি ভালো হয় না? না। বউদের দিয়েই লাঙল টানাবে সে। দিনে নয়, রাতে। বাইরের কোনো লোকে দেখবার কোনো ভয় থাকবে না তখন। বউরা অবশ্য আপত্তি করতে পারে। কিন্তু ওসব পরোয়া করে না মকবুল। মুফত বিয়ে করেনি সে। পুরো চার চারটে টাকা মোহরানা দিয়ে এক একটা বিয়ে করেছে। হুঁ।

ভাবছিলো আর সোনারঙ ধানগুলো ঢেঁকির নিচে ঠেলে দিচ্ছিল মকবুল। হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ করে হাতটা চেপে ধরলো সে। অসতর্ক মুহূর্তে ঢেঁকিটা হাতের ওপর এসে পড়েছে ওর। আল্লারে বলে মুখ বিকৃত করলো মকবুল।

টুনি আর আমেনা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঢেঁকির ওপর। ঘোর কাটতে ছুটে নেমে এলো ওরা। ওদের কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের গায়ের ওপরে থুতু ছিটিয়ে দিলো মকবুল, দূর-হ দূর-হ আমার কাছ থাইকা। বলতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চাপালো মকবুল।

আমেনা বললো, দেহ কারবার, নিজের দোষে নিজে দুঃখ পাইল আর এহন আমাগোরে গালি দেয়। আমরা কি করছি।

তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছস। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো মকবুল। তোরা দুই সতীনে ইচ্ছা কইরা আমার হাতে ঢেঁকি ফালাইছস। তোরা আমার দুশমন।

হ্যাঁ দুশমনই তো। দুশমন ছাড়া আর কি। কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো আমেনা। টুনি এগিয়ে গেলো ওর ফুলা হাতে একটা ভিজে ন্যাকড়া বেঁধে দেয়ার জন্যে। লাফিয়ে তিন হাত পিছিয়ে গেলো মকবুল। দরকার নাই, দরকার নাই। অত সোহাগের দরকার নাই। বলে একখানা সরু কাঠের টুকরো নিয়ে ওর দিক ছুঁড়ে মারলো মকবুল।

বিষ উঠছে নাহি বুড়ার? এমন করতাছে ক্যান। চাপা রোষে গজগজ করতে করতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা বাতাসে দেহটা জুড়িয়ে গেলো ওর। হঠাৎ মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। উঠোন থেকে মন্তুর ঘরের দিকে তাকালো ও। একটা পিদিম জ্বলছে সেখানে। একবার চারপাশে দেখে নিয়ে মন্তুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো টুনি।

মাচাঙের ওপর থেকে কাঁথা বালিশটা নামিয়ে নিয়ে শোবার আয়োজন করছিলো মন্তু।

টুনি দোরগোড়া থেকে বলে, বাহ, বারে!

মন্তু মুখ তুলে তাকায় ওর দিকে। বলে ক্যান কী অইছে?

টুনি ফিসফিসিয়ে বলে, আজ যাইবা না?

মন্তু অবাক হয়, কই যামু?

টুনি মুখ কালো করে চুপ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, ক্যান ভুইলা গেছ বুঝি?

মন্তুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান মাছ ধরার জালটার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, অ–মাছ ধরতে?
যাইবা না? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে টুনি।
মন্তু হেসে বলে, যামু যামু। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে, বুড়ো যদি টের পায় তাইলে কিন্তুক জানে মাইরা ফালাইবো।
হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয় টুনি। মাইররে ডরাও নাকি?
মন্তু সে কথার জবাব না দিলে টুনি বলে, ভাত খাইছ?
না! তুমি খাইছ?
হুঁ। তুমি গিয়া খাইয়া আস যাও। জলদি কইরা আইসো। বিছানাটা আবার গুটিয়ে রেখে বেড়ার সঙ্গে ঝোলান জালটা মাটিতে নামিয়ে নেয় মন্তু।
ও ঘর থেকে আমেনার ডাক শোনা যায়, টুনি বিবি কই গেলা, খাইতে আহ!
আহি, বলে সেখান থেকে চলে যায় টুনি।

আজকাল রাতের বেলা আমেনার ঘরে শোয় মকবুল। টুনি থাকে পাশের ঘরে। আগে, ফাতেমা আর ওরা দুজনে একসঙ্গে থাকতো। মাসখানেক হল ফাতেমা বাপের বাড়ি গেছে। এখন টুনি একা। রাতেরবেলা ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ালেও ধরবার উপায় নেই। রাত জেগে মাছ ধরাটা ইদানিং একটা নেশা হয়ে গেছে ওদের। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে গ্রামের এ পুকুর থেকে অন্য পুকুরে জাল মেরে বেড়ায় ওরা। হাতে একটা টুকরি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে টুনি। জালে ওঠা মাছগুলো ওর মধ্যে ভরে রাখে।
পর পুকুরের মাছ ধরতে গিয়ে সমস্ত সময় সজাগ থাকতে হয় ওদের। চারপাশে দৃষ্টি রাখতে হয়। একদিন প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো দুজনে। জমির মুন্সির বড় পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলো সেদিন। আকাশে চাঁদ ছিলো কিন্তু চাঁদনী ছিলো না। কালো মেঘে ছেয়ে ছিলো পুরো আকাশটা।
এক হাঁটু পানিতে নেমে জালটাকে সন্তর্পণে ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে। পুকুরের মাঝখানটাতে। শব্দ হয়নি মোটেও। কিন্তু পুকুর পাড় থেকে জোর গলায় আওয়াজ শোনা গেলো, কে কে জাল মারে পুকুরে?
এক হাঁটু পানি থেকে নীরবে এক গলা পানিতে নেবে গেলো মন্তু। টুনি ততক্ষণে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।
জমির মুন্সির হাতের টর্চটা বিদ্যুৎদ্বেগে ছুটে গেলো পুকুরের এপার থেকে ওপারে। মনে মনে বার বার খোদাকে ডাকছিলো মন্তু, খোদা তুমিই সব।
একটু পরে পাড়ের ওপার থেকে টুনির চাপা গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, এই উইঠা আহ। মুন্সি চইলা গেছে। বলে খিলখিল শব্দে হেসে ওঠে সে। ওর হাসির শব্দে রাগে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠেছে মন্তুর। এমন সময়ে মানুষ হাসতে পারে?
তারপর থেকে, আরো সাবধান হয়ে গেছে মন্তু। গনু মোল্লার কাছ থেকে তিন আনা পয়সা খরচ করে একটা জোরদার তাবিজ নিয়েছে সে। রাতে বিরাতে গাঁয়ের পুকুরে মাছ ধরে বেড়ানো, বিপদ আপদ কখন কী ঘটে কিছুতো বলা যায় না। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া ভালো। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে, বাজুর ওপরে বাঁধা তাবিজটাকে আজ একবার ভালো করে দেখে নিলো মন্তু। তারপর বুনো লতার ঝোপটাকে দুহাতে সরিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেলো সে। টুনি পেছন থেকে বললো, বারে অত জোরে হাঁটলে আমি চলি কী কইরা? মন্তু জালটাকে গুছিয়ে নিতে নিতে বললো, আস্তে আহ, তাড়া কিয়ের? টুনি বলে, বারে, আমার বুঝি ডর ভয় কিছুই নাই। যদি সাপে কামড়ায়? সাপের কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা আঁধি সাপ ফোঁস করে উঠে সরে যায় সামনে থেকে। আঁতকে উঠে দুহাত পিছিয়ে আসে মন্তু। ভয় কেটে গেলে থুতু করে বুকের মধ্যে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দেয় সে। পেছনে টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, বুকে থুক দাও তাইলে কিচ্ছু অইবো না। কোনো রকম বিতর্কে না এসে নীরবে ওর কথা মেনে নেয় টুনি। কপালটা আজ মন্দ ওদের। অনেক পুকুর ঘুরেও কিছু চিংড়িগুড়ো ছাড়া আর কিছু জুটলো না। মাছগুলো কেমন যেন সেয়ানা হয়ে গেছে। পুকুরের ধারে কাছে থাকে না। থাকে গিয়ে একেবারে মাঝখানটিতে, এত দূর জাল উড়িয়ে নেয়া যায় না। টুনি বলে থাক, আইজ থাউক, চলো বাড়ি ফিইরা যাই। জালটাকে ধুয়ে নিয়ে মন্তু আস্তে আস্তে বলে, চলো।
সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলো হাতটা কোলে নিয়ে বসে বসে আবুল আর হালিমার ঝগড়া দেখছিলো মকবুল।
অনেকক্ষণ কী একটা বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে ওদের মধ্যে। দাওয়ায় বসে বসে যা মুখে আসছে ওকে বলে যাচ্ছে আবুল। হালিমাও একেবারে চুপ করে নেই। উঠোনে একটা লাউয়ের মাচা বাঁধতে বাঁধতে দুএকটা জবাবও দিচ্ছে সে মাঝে মাঝে।
মকবুল হাতের ব্যথায় মৃদু কাতরাচ্ছিল আর পিটপিট চোখে তাকাচ্ছিল ওদের দিকে।

হঠাৎ দাওয়া থেকে ছুটে এসে মুহূর্তে হালিমার চুলের গোছাটা চেপে ধরলো আবুল। তারপর কোনো চিন্তা না করে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিলো ওর তলপেটে। উঃ মাগো, বলে পেটটা দুহাতে চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়লো হালিমা। রাগে তখন ফোঁপাচ্ছে আবুল, আমার ঘরের ভাত ধ্বংস কইরা রাস্তার মানষের লগে পিরিত। জানে খতম কইরা দিমু না তোরে। কাইটা রাস্তায় ভাসায় দিমু না। বলে আবার ওর চুলের গোছাতে হাত দিতে যাচ্ছিল আবুল, বুড়ো মকবুল চিৎকার করে উঠলো, খবরদার আবুইল্যা, তুই যদি বউয়ের গায়ে আরেকবার হাত তুলছস তাইলে ভালো অইবো না কিন্তুক।

আমার ঘরনীর গায়ে আমি হাত তুলি কি যা ইচ্ছা করি, তুমি কইবার কে অ্যাঁ? পরক্ষণে আবুল জবাব দিলো, তুমি যহন তোমার ঘরনীরে তুলাপেডা কর তহন কি আমরা বাধা দিই।

অমন কোনঠাসা উত্তরের পর আর কিছু বলার থাকে না মকবুলের। শুধু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক নজর ওর দিকে তাকালো মকবুল। আবুল তখন ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে চলেছে হালিমাকে। ভিতরে নিয়ে গিয়ে মনের সুখে মারবে। ওর ইচ্ছেটা হয়ত বুঝতে পেরেছিলো হালিমা তাই মাটি আঁকড়ে ধরে গোঙাতে লাগলো সে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আর মাইরো না, মইরা যামু।

চুপ, চুপ তীব্র গলায় ওকে শাসিয়ে ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেয় আবুল। হেঁচকা টানে ওর পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা খুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। তালি দেয়া পুরান ব্লাউজটা আঁটসাঁট করে বাঁধা ছিলো, টেনে সেটাও খুলে ফেলে আবুল। তারপর দুপায়ে ওর নগ্ন দেহটাকে প্রচণ্ডভাবে মাড়াতে থাকে সে। বেড়ার সঙ্গে পুরান একটা ছড়ি ঝোলানো ছিলো। সেটা এনে হালিমার নরম তুলতুলে কপালে কয়েকটা আঁচড় টেনে দেয় আবুল। এইবার পিরিত কর। আরো পিরিত কর রাস্তার মানষের লগে। আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইন্যা, দরজা খোল, মারিস না আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দুহাতে ঝাঁপিটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকালো সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুললো না।

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

প্রথম বউটা ছিলো এ গাঁয়েরই মেয়ে। আয়েশা। একটু বেঁটে, একটু মোটা আর রঙের দিক থেকে শ্যামলা। অপূর্ব সংযম ছিলো মেয়েটির। আশ্চর্য শান্ত স্বভাব। কত মেরেছে ওকে আবুল। কোনোদিন একটু শব্দও করেনি। পিঠটা বিছিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতো। কিল, চাপড়, ঘুসি ইচ্ছেমতো মারতো আবুল।

একটা সামান্য প্রতিবাদ নেই। প্রতিরোধ নেই।

শুধু আড়ালে নীরবে চোখের পানি ফেলত মেয়েটা।

তারপর একদিন ভীষণভাবে রক্তবমি শুরু হল ওর। জমাট বাঁধা কালো রক্ত। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা গেলো আয়েশা।

আয়েশা টিকেছিলো বছর তিনেক। তার পরেরটা কিন্তু ওর চাইতেও কম। মাত্র দুবছর।

অবশ্য জমিলার মাত্র দুবছর টিকে থাকার পেছনে একটা কারণও আছে। ও মেয়েটা ছিলো একটু বাচাল গোছের আর একটু রুক্ষ মেজাজের। সহজে আবুলের কিল চাপড়গুলো গ্রহণ করতে রাজি হতো না সে। মারতে এলে কোমরে আঁচল বেঁধে রুখে দাঁড়াতো।

হাজার হোক মেয়েতো। পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন? বাধা দিতে গিয়ে পরিণামে আরো বেশি মার খেতো জমিলা। ও যখন মারা গেলো আর ওর মৃতদেহটা যখন গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিলো সবাই তখন ওর সাদা ধবধবে পিঠের ওপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা ফুলে ওঠা রেখাগুলো দেখে শিউরে উঠেছিলো অনেকেই। ওরে পাষাইন্যারে এমন দুধের মতো মাইয়াডারে শেষ করলি তুই। আয়েশা মারা যাবার পর অবশ্য ভীষণ কেঁদেছিলো আবুল। গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলো সারা উঠোনে। পাড়াপড়শিদের বলেছিলো, আহা বড় ভালো বউ আছিলো আয়েশা। আমি পাষাইন্যা তার কদর বুঝলাম না। আহারে এমন বউ আর পামু না জীবনে।

আয়েশার শোকে তিনদিন এক ফোঁটা দানাপানিও মুখে পোরেনি আবুল। তিন রাত কাটিয়েছে ওর কবরের পাশে বসে আর শুয়ে। পাড়াপড়শিরা ভেবেছিলো ওর চরিত্রে বুঝি পরিবর্তন এলো এবার। এবার ভালো দেখে একটা বিয়ে শাদি করিয়ে দিলে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে আবুল।

কিন্তু জমিলার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করেছে আবুল। একই পরিণাম ঘটেছে জমিলার জীবনেও।

দ্বিতীয় বউয়ের মৃত্যুতে আবুলের গড়াগড়ি দিয়ে কান্নার কোনো মূল্য দেয়নি পড়শিরা। মুখে বিরক্তি এনে বলেছে, আর অত ঢঙ করিস না আবুইল্যা। তোর ঢঙ দেইখলে গা জ্বালা করে।

আমার বউয়ের দুঃখে আমি কাঁদি, তোমাগো গা জ্বালা করে ক্যান? ওদের কথা শুনে ক্ষেপে ওঠে আবুল।

কপালে এক মুঠো ধুলো ছুঁয়ে সহসা একটা প্রতিজ্ঞা করে বসে সে, এই তওবা করলাম বিয়া শাদি আর করমু না। খোদা, আমারে আর বিয়ার মুখ দেখাইও না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে আবুল।

পড়শিরা গালে হাত দিয়ে বলেছে, ইয়া আল্লা, এই কেমনতর কথা। বউ মারলি তুই, সেই কথা বইলা কি শত্রুতামি করলাম নাকি আমরা? সাচা কথা কইলেই তো মানুষ শত্রু হয়। ঠিক কইছ বইচির মা, সাচা কথা কইলেই এমন হয়। তা, আমাগো কইবারও বা দরকার কী। ওর বউরে মারুক কি কাটুক, কি নদীতে ভাসায় দিক, আমাগো কী আছে তাতে?

সেদিন থেকে আবুলের সাতে পাঁচে আর কেউ নেই ওরা।

আজকাল হালিমাকে যখন প্রহর অন্তর একবার করে মারে আবুল তখন কেউ কিছু বলে না। চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে বুড়ো মকবুল এক-আধটু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আবুইল্যা, তোর কি মানুষের পরাণ না, এমন কইরা যে মারছ বউডারে তোর মনে একটুও চোট লাগে না আবুইল্যা? বউদের অবশ্য মকবুলও মারে। তাই বলে আবুলের মতো অত নির্দয় হওয়াটা মোটেই পছন্দ করে না সে। মারবি তো মার। একটুখানি সইয়া মার। অপরাধের গুরুত্ব দেইখা সেই পরিমাণ মার। এ হল মকবুলের নিজস্ব অভিমত।

অপরাধ, এমন কোনো সাংঘাতিক করেনি হালিমা। পাশের বাড়ির নুরুর সঙ্গে কী একটা কথা বলতে গিয়ে হেসেছিলো জোরে। দূর থেকে সেটা দেখে গা জ্বালা করে উঠেছে আবুলের। একটা গভীর সন্দেহে ভরে উঠেছে মন।

এমন মন খোলা হাসি তো আবুলের সঙ্গে কোনোদিন হাসেনি হালিমা।

বেহুঁশ হালিমাকে ভেতরে ফেলে রেখে আবুল যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত নেমেছে ওর। পরনের লুঙ্গি দিয়ে গায়ের ঘামটা মুছে নিয়ে দাওয়ার ওপর দম ধরে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলো আবুল। মাটির হুঁকোটাকে নেড়েচেড়ে কী যেন দেখলো, তারপর কলকেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

রশীদের বউ সালেহা উঠোনে বসে চাটাই বুনছিলো। আবুলকে এদিকে আসতে দেখে মুখ টিপে হেসে বললো, বউ-এর পিরিত বুঝি আর সইলো না মিয়ার। আর সইবো, বহুত সইছি। মুখ বিকৃত করে পুরনো কথাটাই আবার বলে গেলো আবুল, আমার ঘরের ভাত খাইয়া রাস্তার মানষের সঙ্গে পিরিত। তুমি কও ভাবী, এইডা কি সহ্য করন যায়?

হ্যাঁ তাতো খাঁটি কথাই কইছ। সালেহা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ঘরনী যদি মনের মতো না হয় তাইলে কি তারে নিয়ে আর সুখে ঘর করন যায়?

আর ভাবী, দুনিয়াদারী আর ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে দুই চোখ যেই দিকে যায় চইলা যাই। বলে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে আবুল। তারপর কলকেটা সালেহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চুলায় আগুন আছে? একটুহানি আগুন দাও।

এই দিই, বলে কলকেটা হাতে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেলো সালেহা। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো সে। ও কাছে আসতে গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে এনে আবুল বললো, আইজ আর ছাড়ি নাই ভাবী। যতক্ষণ পারছি মারছি। তুমি একটু তেল গরম কইরা মালিশ কইরা দিও ওর গায়ে। হাড্ডি না দুই একখানা ভাইঙ্গা গেছে কে জানে। তাইলে তো বড় বিপদ অইবো। কাম কাজ কত পইর‍্যা রইছে। সব কিছু বন্ধ অইয়া যাইবো।

সেই কথা আগে খেয়াল আছিলো না মিয়ার? সালেহা মুখ বাঁকালো। কাম কাজের যখন ক্ষতি অইবো জান, তহন না মারলেই পাইরতা। মারলা ক্যান।

উঁহু, আবুল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, মারছি ঠিক করছি, না মারলে আস্কারা পাইয়া যাইতো।

আর আস্কারা কি এমনে কম পাইছে? চারদিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে সালেহা বললো, নুরুর সঙ্গে কি আজকা কথা কইছে? ওতো রোজ রোজ কথা কয়।

কী? চোখ জোড়া আবার ধপ করে জ্বলে উঠলো আবুলের, আমারে এতদিন কও নাই ক্যান?

সালেহা বললো, কী দরকার বাবু আমাগো মিছামিছি শত্রু বইনা। কইতাম গেলে তো অনেক কথাই কইতে অয়। তাকি আর একদিনে শেষ করা যায়।

কী কথা কও ভাবী। খোদার কসম ঠিক কইরা কও। তামাক খাওয়াটা একেবারে ভুলে গেলো আবুল।

সালেহা আস্তে করে বললো, যাই কও বাবু কারো বদনাম করার অভ্যাসই আমার নাই। কিন্তুক কই কী এই বউডা তোমার বড় ভালো অয় নাই। আমরা তো আয়শাকেও দেখছি, জমিলারেও দেখছি। ওরা তো আমাগো হাতের ওপর দিয়েই গেছে। ওগো তুলনা আছিলো না। কিন্তু হালিমার স্বভাব চরিত্র বাবু আমার বড় ভালো লাগে না। বলতে গিয়ে বার কয়েক কাশলো সালেহা। কাশটা গিলে নিয়ে আবার সে বললো, ইয়ে মানে, বাইরের মানুষের সঙ্গে হাসাহাসি আর ঢলাঢলি। একটুখানি লজ্জা শরমও তো থাকা চাই। কথা শেষে আবুলের রক্তলাল চোখ জোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো

সালেহা। একটু ধমকের সুরে বললো, দেইখো বাপু, তুমি আবার মাইয়াডারে মারতে শুরু কইরো না। এমনিতেই বহুত মারছ। এতে যদি শিক্ষা না হয় তাইলে আর এ জন্মেও হইবো না। সালেহার কথাটা শেষ হবার আগে সেখান থেকে চলে গেছে আবুল। কল্‌কেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে সে। একটু পরে আবার হালিমার কান্নার শব্দ শোনা গেলো ঘর থেকে। আবুল আবার মারছে তাকে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিরাম– থামে না এমন। **আস্কারা**– প্রশ্রয় দেয়া; লাই দেয়া। **পত্তন**– প্রতিষ্ঠা; আরম্ভ; সূত্রপাত। **কুশান**– 'কুশাসন' শব্দটির আঞ্চলিক রূপ; কুশ বা তৃণ দিয়ে তৈরি আসন। **জানে খতম কইরা দিমু**– প্রাণে মেরে ফেলবো। **তেষ্টা**– পিপাসা। **বিভোর**– আত্মহারা। **দুগণ্ড**– দুইগাল। **মুফত**– মাগনা; বিনামূল্যে। **তীব্র আর্তনাদ**– উচ্চ স্বরে চিৎকার। স্তব্ধ– নিশ্চল। **ন্যাকড়া**– ছেঁড়া কাপড়। **রোষ**– ক্রোধ; রাগ। **চাঁদনি**– জোছনা। **বিদ্যুৎবেগে**– দ্রুতগতিতে। **বাজুর ওপরে**– বাহুর ওপরে। **সেয়ান**– চালাক; চতুর। **দাওয়া**– বারান্দা। **মৃদু**– সামান্য। **ঝাঁপি**– বাঁশ দিয়ে বানানো বেড়া বিশেষ। **বাচাল**– যে অতিরিক্ত কথা বলে। **রুক্ষ**– কঠোর; রস-কষহীন। **উঠোন**– প্রাঙ্গণ; আঙিনা। **পাষাইন্যা**– পাষাণ শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **ঢঙ**– ছলাকলা; ছলনা; ভান। **সাচা কথা**– সত্য কথা। **প্রহর-অন্তর**– প্রত্যেক প্রহরে। **গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে**– কণ্ঠস্বরটা একেবারে নিচু করে বা আস্তে করে। **বানের জলে ভাসান দিল**– বন্যার পানিতে ভেসে চলল। **পৈশাচিক**– পিশাচের মতো অমানবিক। **লাউয়ের মাচা**– লাউ গাছের জন্য বাঁশ কঞ্চি ইত্যাদি দিয়ে বানানো উঁচু জায়গা। **শত্রু বইনা**– শত্রু হয়ে। **শত্রুতামি**– শত্রুতা শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **সন্তর্পণে**– সতর্কতার সঙ্গে; খুব সাবধনে।

সারসংক্ষেপ :

দীঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ-গ্রাম। গ্রামের পত্তন নিয়ে নানা গল্প চালু আছে। মকবুলের দুই বউ আমেনা আর টুনি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল আর মকবুল ঠেলে দিচ্ছিল ধান। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় ঢেঁকি এসে পড়ে তার হাতে। মকবুল ভাবে, তার দুই বউ শত্রুতা করে এ-কাজ করেছে। রাতের বেলায় মন্তু আর টুনি বের হয় জাল নিয়ে — উদ্দেশ্য পুকুরে পুকুরে লুকিয়ে জাল ফেলে মাছ ধরে আনা। ইদানিং রাতে লুকিয়ে মাছ ধরাটা ওদের দুজনের কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। হালিমা আর আবুল সকাল থেকেই ঝগড়া বাঁধিয়েছে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আবুল রেগে গিয়ে হালিমার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে দেয়। তারপর লাউয়ের মাচার নিচ থেকে ঘরে এনে ঘরের ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়ে মারতে থাকে। বউ পিটিয়ে আবুল যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ পায়। এর আগেও দু-দুটো বউকে আবুল পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. বুড়ো কাশেম শিকদার কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন?

ক. কুশিয়ারা খ. কুলাউড়া গ. কসবা ঘ. কাঠিগ্রাম

১০. বউকে নির্যাতন করে আবুল যে ধরনের আনন্দ পায়–

ক. পৈশাচিক আনন্দ খ. গভীর আনন্দ গ. অমানবিক আনন্দ ঘ. হালকা আনন্দ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসায় তাবিজ বিক্রি করা। এ নিয়ে বিলাসীর সঙ্গে মাঝে মাঝে তর্ক হত। বিলাসী বলত, আমাদের তো খাবারের অভাব নেই। আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাতে যাই?

১১. উদ্দীপকের বিলাসী 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে কার কথা তুলে ধরে?

ক. মন্তু মিয়া খ. গনু মোল্লা গ. করিম শেখ ঘ. ইদন আলী

১২. উদ্দীপকের বিলাসী ও উপন্যাসের চরিত্রটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে–

i. অধিকার আদায়ে ii. মানসিক চেতনায় iii. দায়িত্ববোধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মন্তুর অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পুঁথি পাঠের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- 'কমলার পুঁথি'র কাহিনি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভূতে-ধরা সংক্রান্ত একটি লোকবিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলো টুনি।

এত শিগ্রী উঠত না সে, বুড়ো মকবুলের ধমক খেয়ে শুয়ে থাকাটা নিরাপদ মনে করলো না। মনে মনে বুড়োকে এক হাজার একশো অভিশাপ দিলো। চোখজোড়া জ্বালা করছে তার। মাথাটা ঘুরছে। ঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা থেকে একটা পোড়া কাঠের কয়লা তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে দাঁত মাজতে পুকুরের দিকে চলে গেলো। এক গলা পানিতে নেমে মন্তু গোসল করছে পুকুরে।

ঘোলাটে পানি আরো ঘোলা হয়ে গেছে।

কতগুলো হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে সাঁতার কাটছে এপার থেকে ওপারে। আর মাঝে মাঝে মুখটা পানিতে ডুবিয়ে চ্যাপটা ঠোঁট দিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ঘাটের এক কোণে এসে নীরবে বসলো টুনি। পা জোড়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে এক মনে দাঁতন করতে করতে হঠাৎ তার নজরে এলো মন্তুর পিঠের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। মনে হল কিছুক্ষণ আগেই বুঝি কিছুর সঙ্গে লেগে চিরে গেছে পিঠটা। ওমা, বলে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলো টুনি, এই এই শোন। মন্তু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, এইখানটা চিরলো কেমন কইরা, অ্যাঁ?

মন্তু হেসে দিয়ে বললো, গতকাল রাতে সগন শেখের পুকুর পাড়ে একটা বুনো লতার কাঁটা লাগছিলো পিঠে।

টুনির চোখজোড়া মুহূর্তে করুণ হয়ে এলো। দরদ ভরা কণ্ঠে সে আস্তে করে বললো, চলো কচু পাতার ক্ষির লাগাইয়া বাইন্দা দি, নইলে পাইকা যাইবো, শেষে কষ্ট পাইবা।

মন্তু আবার একগলা পানিতে নেমে যেতে যেতে বললো, দূর কিছু অইবো না আমার।

টুনি কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ মকবুলের উঁচু গলার ডাক ওর কথায় ছেদ পড়লো।

কই টুনি বিবি, বলি বিবিজানের মুখ ধোয়ন কি এহনো অইলো না নাকি? রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে বুড়ো মকবুল। কাল রাতে যে ধানগুলো ভানা হয়নি সেগুলো ভানতে হবে এখন। হাত ভেঙে ফুলে গেলেও সহজে বসে থাকার পাত্র নয় মকবুল। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বুড়োর মৃত্যু কামনা করতে করতে ঘাট থেকে উঠে গেলো টুনি।

মন্তুর কোনো জমিজমা নেই।

পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। লাঙ্গল চষে। ধান বোনে। আবার সে ধান পাকলে পরে কেটে এনে মালিকের গোলা ভর্তি করে। তারপর ধানের মরশুম শেষ হয়ে গেলে কলাই, মুগ, তিল, সরিষার খেতে কাজ করে মন্তু। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার চুক্তি নেয়। পাঁচ মণ এক টাকা। কোনো কোনো দিন আট নয় মণ লাকড়িও কেটে ফেলে সে। মাঝে কিছুকাল মাঝি-বাড়ির মন্তু শেখের ছেলে করিম শেখের সঙ্গে নৌকা বেয়েছিলো মন্তু। নৌকায় পাল তুলে অনেক দূরের গঞ্জে চলে যেতো ওরা। ওখান থেকে যাত্রী কিংবা মাল নিয়ে ফিরতো। ক্ষেতের রোজগারের চেয়ে নৌকায় রোজগার অনেক বেশি। মাচাঙের উপর থেকে আধ ময়লা ফতুয়াটা নামিয়ে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে মন্তু ভাবলো, আজ একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করবে গিয়ে। তখন সন্ধ্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গ্রামের বুকে। মিয়া-বাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে তসবিহ হাতে নামাজ পড়তে চলছেন গনু মোল্লা। মোরগ হাঁসগুলো সারাদিন এখানে

সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এখন উঠোনের এককোণে এসে জটলা বেঁধেছে। একটু পরে যার যার খোয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ওরা।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো মন্তু। মাঝি-বাড়িটা বেশি দূরে নয়।
সগন সেখের পুকুরটা বাঁদিকে রেখে ডান দিকে মিয়াদের খেজুর বাগানটা পেরিয়ে গেলে দুটো ক্ষেত পরে মাঝি-বাড়ি। বাড়ির সামনে দিয়ে দাঁড়াতে মন্তু শেখের গরু ঘরের পেছন থেকে একটা লোম উঠা হাড় বের করা কালো কুকুর দৌড়ে এসে বিকট চিৎকার জুড়ে দিলো। হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলো সে।
দেউড়ির সামনে বাঁশের উপর ঝুলিয়ে রাখা সুপুরি পাতার ঝালরের আড়াল থেকে একটা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো আম্বিয়া।
আরে মন্তু ভাই দেখি। কী খবর?
মন্তু বললো, করিম আছে নাহি?
মাথার চুলগুলো খোপার মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আম্বিয়া বললো, আছে।
আইজ কয়দিন থাইকা জ্বর অইছে ভাইজানের।
কী জ্বর? কহন অইছে? মন্তুর চোখে উৎকণ্ঠা।
আম্বিয়া আস্তে করে বললো, পরশু রাইত থাইকা অইছে। কী জ্বর তা কইবার পারলাম না।
মন্তু কী যেন চিন্তা করলো। তারপর ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে আম্বিয়া পেছন থেকে ডাকলো, চইলা যাও ক্যান? দেখা কইরা যাইবা না? আম্বিয়ার পিছু পিছু হোগলার বেড়া দেয়া ঘরটায় এসে ঢুকলো মন্তু। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে ম্লান হেসে করিম বললো, মন্তু মিয়া যে, তোমারে তো আইজ-কাল দেখাই যায় না। বাঁইচা আছি না মইরা গেছি তাও তো খোঁজ-খবর নাও না মিয়া।
মন্তু প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, তারপর বললো, দেখা না অইলে কি অইবো মিয়া খোঁজ-খবর ঠিকই নিই।
কল্‌কেতে তামাক সাজিয়ে এনে হুঁকোটা মন্তুর দিকে বাড়িয়ে দিলো আম্বিয়া। তারপর জিজ্ঞেস করলো পান খাইবা? মন্তু হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে বললো, না থাউক। আপন মনে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো সে। তারপর আসল কথাটা আলোচনা করলো ওর সঙ্গে। করিম শেখের সঙ্গে আবার কিছুদিনের জন্য নৌকায় কাজ করতে চায় মন্তু।
শুনে খুশি হল করিম। বললো, নাওটারে একটু মেরামত করন লাগবো।
কাল পরশু একবার আইসো।
আবার আসবে বলে উঠতে যাচ্ছিল মন্তু।
করিম সঙ্গে সঙ্গে বললো, আহা যাও কই, বহ না।
না। রাইত অইছে যাই এইবার।
আম্বিয়া বললো, বহ মন্তু ভাই, চাইরডা ভাত খাইয়া যাও।
এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা পাল্টে একটা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে এসেছে আম্বিয়া।
মুখখানা গামছা দিয়ে মুছে এসেছে সে।
কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন, আট হাত শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। ওকে অমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত বোধ করলো আম্বিয়া, দাঁড়াইয়া রইলা ক্যান, বহ না।
মন্তু বললো, না আইজ না। আর একদিন খামু। বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মন্তু।
পিদিম হাতে দেউড়ি পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেলো আম্বিয়া। মন্তু শুধালো তোমার আব্বা কই গেছে?
আম্বিয়া বললো, যেই কাজ কইরা বেড়ায় সেই কাজ করতে গেছে। যাইবো আবার কই। ওর গলায় ক্ষোভ।
ওর মুখের দিকে এক নজর তাকালো মন্তু। ওর ক্ষোভের কারণটা সহজে বুঝতে পারলো। সাত গ্রামের মরা মানুষকে কবর দিয়ে বেড়ায় নন্তু শেখ। আশেপাশের গ্রামে গত ত্রিশ বছর ধরে যত লোক মরছে সবার কবর খুঁড়েছে নন্তু শেখ। এ তার পেশা নয় নেশা।
আম্বিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে এলো মন্তু তখন সে অনুভব করলো বেশ রাত হয়েছে।
চারপাশে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু-একটা পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে।
বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মন্তুর। কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙ্গিলো।

কইন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে একটা পিদিমের আলোতে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে।

বুড়ো মকবুল গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুঁথি পড়ার। বড় সুন্দর পুঁথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুঁথি পড়ুয়া সে।

আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোনো সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুঁথি পড়ে সুরত আলী। গাজি কালুর পুঁথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি।

শুন শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন॥
কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ॥
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরি॥

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবায়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা করে সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিলো কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সঙ্গে।

বড় সুখে দিন কাটছিলো ওদের।

এক বছর পরে একটা দুধের মতো মেয়ে জন্ম নিলো ওদের।

আট বেহারার পালকি চড়ে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে লাল পরি নীল পরি আর সবুজ পরির দীঘির পাড় দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল কমলা। দীঘি দেখে পালকি থেকে নামলো সে। চৈত্র-মাসের খর রোদে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো ওর। দীঘির স্বচ্ছ পানি দেখে বড় লোভ হল কমলার। পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে আঁজল ভরে পানি খেলো সে। তারপর যখন উঠতে যাবে, দেখলো, চুলের মতো সরু কি যেন একটা কড়ে আঙুলের গোড়ায় আটকে রয়েছে। হাত দিয়ে ছাড়াতে গেলো। পারলো না কমলা। যত টানে তত লম্বা হয় সে চুল। তার এক প্রান্ত পানির ভেতরে, অন্য প্রান্ত কড়ে আঙুলের সঙ্গে গিঁট আঁটা। ছাড়াতেও পারে না কমলা, এগুতেও পারে না। এগুতে গেলে পানির ভেতর চুলে টান পড়ে। কে যেন টেনে ধরে রেখেছে ওটা। চারদিকে হই চই পড়ে গেলো।

কত লোক এলো। কত লোক গেলো।

কত কামার কুমার ওঝা এসে জড়ো হল। কেউ কিছু করতে পারলো না। ইস্পাতে তৈরি কুড়োল দিয়েও কাটা গেলো না চুলটা? তিন মাস তিন দিন চলে গেলো।

তারপরে- এক রাতে স্বপনে দেখিলো সুন্দরী।
দীঘির পানিতে আছে এক রাজপুরী॥
সেইখানে আছে এক রাজপুত্র সুন্দর।
আসেক হইয়াছে তার কমলার উপর॥
কমলারে পাইতে চায় আপন করিয়া।
কমলার লাইগা তার কান্দিছে হিয়া॥

কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেলো কমলার। কাঁদলো সবাই। বাবা, মা। স্বামী সবাই।

দীঘির পানি থেকে চুলে টান পড়লো এতদিনে। পাতা পানি থেকে হাঁটু পানিতে নেমে গেলো কমলা। হাঁটু থেকে বুক। তারপর গলা। ধীরে ধীরে দীঘির পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো কমলা সুন্দরী।

চাঁদ হেলে পড়ে পুব থেকে পশ্চিমে।

ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।
ঢুলে ঢুলে পুঁথি পড়া শেষ করলো সুরত আলী।

হীন মোয়াজ্জেমে কহেরে শুন সর্বজন
কমলা সুন্দরীর কিচ্ছা হইল সমাপন॥
ভুল চুক হইলে মোরে লইবেন ক্ষেমিয়া।
দোয়া করিবেন মোরে অধীন জানিয়া॥

পুঁথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেক অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতা পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কী যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।
খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে হাত পা ধোয়ার জন্যে পুকুর ঘাটে চলে যায় মন্তু। অজু করে এসে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আজ।
মাঝি-বাড়ি থেকে ধপাস ধপাস ঢেঁকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।
রাত জেগে আজও ধান ভানছে আম্বিয়া। বড় মিহি কণ্ঠস্বর ওর, বড় সুন্দর গান গায় সে।

ভাটুইরে না দিয়ো শাড়ি,
ভাটুই যাবো বাপের বাড়ি।
সর্ব লক্ষণ কাম চিক্কণ,
পঞ্চ রঙের ভাটুইরে॥

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মন্তু। ছোট পুকুরের পূর্ব পাড় থেকে কে যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাড়ের দিকে। আবছা আলোতে সব কিছু স্পষ্ট না দেখলেও মেয়েটিকে চিনতে ভুল হল না মন্তুর। আবুলের বউ হালিমা। এত রাতে একা একা কোথায় যাচ্ছে সে। পশ্চিম পাড়ের লম্বা পেয়ারা গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটা। চারপাশে বার কয়েক ফিরে তাকালো সে। ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মন্তু। হাত-পাগুলো কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর।
পরনের কাপড়টার একটা প্রান্ত পেয়ারা গাছের মোটা ডালটার সঙ্গে বাঁধলো হালিমা। আরেকটা প্রান্ত নিজের গলার সঙ্গে পেচিয়ে কী যেন পরখ করলো সে।
মন্তুর আর বুঝতে বাকি রইলো না, গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে চায় হালিমা–
এ দুনিয়াটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। তাই আর বাঁচতে চায় না ও।
মন্তু এ মুহূর্তে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিলো না।
হঠাৎ ওকে অবাক করে দিয়ে গলার ফাঁসটা খুলে ফেলে আপন মনে কেঁদে উঠলো হালিমা। পেয়ারা গাছটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।
হয়তো, বাবা-মার কথা মনে পড়েছে ওর। কিম্বা, দুনিয়াটা অতি নির্মম হলেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না হয়ত।
এর মধ্যে বার চারেক গলায় ফাঁস পরেছে আর খুলেছে হালিমা। ওর অবস্থা দেখে অতি দুঃখে হাসি পেলো মন্তুর। ধীরে ধীরে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেলো সে। তারপর অকস্মাৎ ওর একখানা হাত চেপে ধরলো মন্তু।
একটা করুণ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো হালিমা। বড় বিষণ্ন চাহনি ওর। অনেকক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুলো না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলো দুইজন। ঈষৎ চাঁদের আলোয় মন্তু দেখলো, হালিমার নাক আর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ফুলে গেছে। এত মার মেরেছে ওকে আবুল। মন্তু শিউরে উঠলো। তারপর কী বলতে যাচ্ছিলো সে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে একটা চাপা কান্নার সঙ্গে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলো হালিমা। বোবা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।
পুকুর পাড় থেকে ফিরে এসে উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো সে। চেয়ে দেখে, ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথির কথাগুলো গুনগুন করছে টুনি।
দাওয়া থেকে নেমে এসে টুনি শুধালো, কোথায় গেছলা মিয়া। তোমারে আমি খুঁইজা মরি।
শোবার ঘর থেকে মকবুল আর আমেনার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। রশীদ আর সালেহাও কী নিয়ে যেন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

সুরত আলীর ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।
আবুল আর হালিমার ঘরেও কোনো বাতি নেই।
মন্তু সহসা টুনির কথার কোনো জবাব দিলো না।
টুনি আরো কাছে এগিয়ে এসে বললো, এহনি ঘুমাইবা বুঝি?
মন্তু বললো, হুঁ শরীরটা আইজ ভালো নাই।
ক্যান, কী অইছে? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা। জ্বর হয় নাই তো?
মন্তু বললো, না এমনি খারাপ লাগতাছে।
টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে করে বললো, আইজ শাপলা তুলতে যাইবা না?
মন্তু বললো, আইজ থাক, কালকা যামু।
টুনি কী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, পরশু দিনকা আমি বাপের বাড়ি চইলা যামু।
তাই নাহি?
হুঁ। বাপজানের অসুখ, তাই।
অসুখের কথা কার কাছ থাইকা শুনলা? ওর মুখের দিকে তাকালো মন্তু।
টুনি আস্তে করে বললো, বাপজানে লোক পাঠাইছিলো।
অ। উঠোনের মাঝখানে দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। একটু পরে মন্তু নীরবতা ভাঙলো, পরশু থাইকা আমিও নাও বাইতে যাইতেছি।
কোনহানে যাইবা? টুনি সোৎসাহে তাকালো ওর দিকে।
মন্তু বললো, কোনহানে যাই ঠিক নাই। করিম শেখের নাও। সে যেইহানে নিয়া যায় সেইহানেই যামু।
টুনি বললো, তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা? বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।
সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না মন্তু। তারপর ইতস্তত করে বলে, অনেক রাত অইছে এইবার ঘুমাও গিয়া বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মন্তু।
পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো মন্তুর।
বাইরের উঠোনে তখন কী একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়েছে আমেনা আর সালেহা। অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। গনু মোল্লার ঘরের সামনে একটা বড় রকমের ভিড়।
গ্রামের অনেক ছেলে বুড়ো এসে জমায়েত হয়েছে সেখানে। ব্যাপারটা কী প্রথমে বুঝতে পারলো না মন্তু। পরে বুড়ো মকবুলের মেয়ে হিরনের কাছ থেকে শুনলো সব।
মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়াবার জন্য ওকে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে সবাই। ব্যাপারির ছোট ভাইকে সামনে পেয়ে মন্তু শুধালো, কী মিয়া ভূতে পাইলো কহন অ্যাঁ?
ব্যাপারির ভাই আদ্যোপান্ত জানালো সব।
কাল ভোর সকালে পরির দীঘির পাড়ে শুকনো ডাল পাতা কুড়োতে গিয়েছিলো মেয়েটা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল মেয়ে আর ফিরে না। ওদিকে মেয়ের মা তো ভেবেই আকুল। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোনো বিপদে পড়লো। প্রথমে ওকে দেখলো কাজি বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তেঁতুল গাছের মগডালে উঠে দুপা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে টেনে টেনে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়ি তো অবাক, বলি লজ্জা শরমের কি মাথা খাইছ? দিন দুপুরে গাছে নাহি উইঠা গীত গাইবার লাগছ। ও মাইয়্যা, বলি লজ্জা শরম কি সব উইঠা গেছে দুনিয়ার ওপর থ্যাইকা?
বুড়ি যত চিৎকার করে মরে, মেয়ে তত শব্দ করে হাসে। সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না।
খবর শুনে মজু ব্যাপারি নিজে ছুটে এলো দীঘির পাড়ে। নিচে থেকে মেয়ের নাম ধরে বারবার ডাকলো সে। সখিনা, মা আমার নাক-কান কাটিছ না মা, নাইম্যা আয়।
বাবাকে দেখে ওর গায়ের ওপর থুতু ছিটিয়ে দিলো সখিনা। তারপর খিলখিল শব্দে হেসে উঠে বললো, আর যামু না আমি। এইহানে থাকুম।
ওমা কয় কী। মাইয়্যা আমার এই কী কথা কয়? মেয়ের কথা শুনে চোখ উল্টে গেলো মজু ব্যাপারির।

থুরথুরে বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। সহসা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লো সে, লক্ষণ বড় ভালো না ব্যাপারি। মাইয়্যারে তোমার ভূতে পাইছে।

খবরদার বুড়ি বাজে কথা কইস না। ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো সখিনা। বেশি বক বক করলে ঘাড় মটকাইয়া দিমু।

এ কথার পরে কারো সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না।

বুড়ি বললো, এ বড় ভালো লক্ষণ নয়, জলদি কইরা লোকজন ডাহ।

লোকজন ডাকার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কারণ হাঁক-ডাক শুনে ততক্ষণে গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বুড়ো ছমির মিয়া বললো, দাঁড়ায়া তামাশা লেখতাছ ক্যান মিয়ারা, একজন উইঠ্যা যাও না ওপরে। কে উঠবে, কে উঠবে না তাই নিয়ে বচসা হল কিছুক্ষণ। কারণ, যে কেউ তো আর উঠতে পারে না। এমন একজনকে উপরে উঠতে হবে, মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াবার অধিকার আছে যার। অবশেষে ঠিক হল তকু ব্যাপারিই উঠবে ওপরে। মেয়ের আপন চাচা হয় সে। সুতরাং অধিকারের প্রশ্ন আসে না।

তকু ব্যাপারিকে উপরে উঠতে দেখে ক্ষেপে গেলো সখিনা। চিৎকার করে ওকে শাসাতে লাগলো সে, খবরদার খবরদার ব্যাপারি, জানে খতম কইরা দিমু। বলে ছোট ছোট ডাল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওর ঘাড়ের ওপরে ছুঁড়ে মারতে লাগলো সে। তারপর অকস্মাৎ এক লাফে দীঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়েটা। অনেক কষ্টে দীঘির পানি থেকে পাড়ে তুলে আনা হল তাকে।

কলসি কলসি পানি ঢালা হল মাথার ওপর। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো সখিনার তখন সে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। তারপর থেকে একটা কথাও বলেনি সখিনা। একটা প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি সে। তাই আজ সকালে গনু মোল্লার কাছে নিয়ে এসেছে ওকে যদি ভূতটাকে কোনো মতে তাড়ানো যায়। নইলে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। ব্যাপারির ভাইয়ের কাছ থেকে সব কিছু শুনলো মন্তু। গনু মোল্লার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো একটা সাদা কাপড়কে সরষের তেলের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে সেই কাপড়টাকে সখিনার নাকের ওপর গনু মোল্লা ধরছে আর চিৎকার করে বলছে, কোনহান থাইকা আইছস শিগ্‌গির কইরা ক, নইলে কিন্তুক ছাড়মু না আমি। ক শিগ্‌গির। সখিনা নীরব।

তার ঘাড়ের ওপর চেপে থাকা ভূতটা কোনো কথাই বলছে না।

মন্তু আর দাঁড়ালো না সেখানে। ঘরের পেছন থেকে একটা নিমের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে করতে পুকুর ঘাটে চলে গেলো সে। পুকুর পাড়ের পেয়ারা গাছের নিচে লাউ গাছগুলোর জন্য একটা মাচা বাঁধছে হালিমা। এখন দেখলে কে বলবে যে ওই মেয়েটাই গতকাল রাতে ওই পেয়ারা গাছটার ডালে গলায় কাপড় বেঁধে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো। ওর দিকে চোখ পড়তে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার মাচা বাঁধতে লাগলো হালিমা।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অদৃশ্য– যা দেখা যায় না। **অবিশ্রান্ত**– শ্রান্তিহীনভাবে; একটানা। অকস্মাৎ– হঠাৎ; সহসা; অতর্কিতভাবে। **আদ্যোপান্ত**– আগাগোড়া; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। **আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে**– যখন আকাশ জোছনার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। **আট বেহারার পালকি**– যে পালকি আটজন লোক ঘাড়ে করে নেয়। **আঁজল**– দুই হাত এক করে; অঞ্জলি। **উৎকণ্ঠা**– ব্যাকুলতা; চিন্তা; ভাবনা। **উৎকর্ণ**– শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকা। **খোয়াড়**– বাঁশ বা টিন দিয়ে বানানো হাঁস মুরগি রাখবার ঘর। **ইতস্তত**– সঙ্কোচ; দ্বিধা। **ছাইয়ের গাদা**– ছাইয়ের স্তূপ। **দাঁতন করা**– দাঁত মাজা। **মরশুম**– মৌসুম। **লাক্‌ড়ি**– খড়ি; জ্বালানী কাঠ। **দেউড়ি**– বাড়িতে ঢোকার প্রধান পথ। **হোগলা**– তিনকোণা ও চ্যাপ্টা এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ; এগুলো দিয়ে সাধারণত ঘরের বেড়া দেয়া বা পাটি বানানো হয়। **নাও**– নৌকা। **মৃদু মন্দ**– নরম ও মধুর। **প্রান্ত**– সীমা; কিনারা; একপাশ। বিষণ্ন– দুঃখিত; ম্লান। **শুধাল**– জিজ্ঞেস করল; জানতে চাইল। **সহসা**– হঠাৎ; অকস্মাৎ। **বিজ্ঞের মতো**– পণ্ডিতের মতো; জ্ঞানীর মতো। **শাসাতে লাগল**– সাবধান করতে লাগল। **স্বচ্ছ**– পরিচ্ছন্ন; পরিষ্কার।

সারসংক্ষেপ :

মন্তু পরের জমিতে খেটে রোজগার করে। এখন ক্ষেতের কাজ নেই। তাই করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে নৌকা চালানোর কাজের কথা বলে। আম্বিয়া করিম শেখের বোন। আম্বিয়ার পীড়াপীড়িতে অনেকক্ষণ বসে থেকে রাত করেই সে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরে দেখে সমস্ত উঠান জুড়ে জটলা পাকিয়ে বাড়ির সবাই সুরত আলীর পুঁথি পড়া শুনছে। আজ সে কমলার কিচ্ছা শুনাচ্ছিল সবাইকে। পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসবার সময় মন্তু দেখতে পায়, আবুলের বউ পুকুর পারের পেয়ারা গাছে তার পরনের শাড়ির এক কোণা শক্ত করে বাঁধে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই গাছে বাঁধা শাড়ির কোণা খুলে নিয়ে পেয়ারা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে হালিমা আপন মনে কেঁদে ওঠে। এ-অবস্থায় মন্তু তার দিকে এগিয়ে যায়; পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে। জোছনার আলোয় দেখতে পায় মার খাওয়া হালিমার চোখ নাক ফুলে আছে। টুনি তার বাবার অসুস্থতার খবর মন্তুকে দিয়ে বলে, আগামী পরশু সে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মন্তুও জানায়, পরশু থেকেই সে করিম শেখের নৌকা বাইতে যাবে। পরদিন সকালে উঠোনে একটা বড় জটলা দেখতে পায় মন্তু। মজু ব্যাপারির মেজ মেয়েটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূত ছাড়ানোর জন্য তাকে গনু মোল্লার কাছে আনা হয়েছে। দাঁত মাজতে মাজতে পুকুর পাড়ে গিয়ে মন্তু দেখলো, হালিমা গত রাতে যে পেয়ারা গাছে শাড়ি জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল সে গাছেই লাউয়ের মাচা বাঁধছে। কে বলবে গত রাতে এই হালিমাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. 'ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি' পাঠ করে কে?

ক. গাজী কালু　　খ. সুরত আলী　　গ. নন্তু শেখ　　ঘ. করিম শেখ

১৪. সকলে গনু মোল্লার বাড়ির সামনে যে কারণে ভিড় করেছিল−

ক. আমেনা ও সালেহার ঝগড়া দেখতে　　খ. গনু মোল্লার দোয়া নিতে

গ. মজু ব্যাপারীর ভূতগ্রস্থ মেয়েকে দেখতে　　ঘ. অসুস্থ মকবুলকে দেখতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পুকুর ঘাট থেকে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পৃথু। আবছা আলোয় মেয়েটিকে চিনতে ভুল হয় না তার। জাম গাছটিকে জড়িযে ধরে সে কাঁদছে। উপরে লটকে রয়েছে ফাঁস নেয়ার দড়িটি। মেয়েটি কেন যেন তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে।

১৫. উদ্দীপকের 'মেয়ে'টি উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. ফাতেমা　　খ. হালিমা　　গ. আমেনা　　ঘ. সখিনা

১৬. উদ্দীপক ও উপন্যাসের চরিত্র −এ দুটির মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ−

i. জীবনে হতাশায়　　ii. জীবনকে ভালবাসায়　　iii. জীবনে দুঃখবোধে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নৌকার মাঝি হিসেবে মন্তুর জীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- বিয়ে প্রসঙ্গে মন্তুর মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কুটুম-বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মন্তুর আচরণগত পরিবর্তনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- টুনিদের বাড়ির পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নৌকোটা ঘাটে বেঁধে রেখে একগাদা কাদা ডিঙিয়ে পাড়ে উঠে আসে ওরা। মন্তু আর করিম শেখ। হাটের এক কোণে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানে বসে গরম দুকাপ চা খায়।

হাটের নাম শান্তির হাট। কিন্তু সারাদিন অশান্তিই লেগে থাকে এখানে। দূর দূর বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসে সওদা করতে। খুচরো জিনিসপত্রের চেয়ে পাইকারি জিনিসপত্রের বিক্রি অনেক বেশি। এখান থেকে মালপত্র কিনে নিয়ে গ্রামে গ্রামে আর ছোট ছোট হাট বাজারের দোকানিরা দোকান চালায়।

মাঝে মাঝে দুএকটা সার্কাস পার্টিও আসে এখানে। তখন সমস্ত পরগণায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে ছেলে বুড়ো মেয়ে এসে জড়ো হয় এখানে। দোকানিদেরও তখন খুশির অন্ত থাকে না। জোর বিক্রি চলে। নদীর পাড়ের ভরা জায়গাটায় কয়েকটা দোচালা ঘর তুলে নিয়ে সেখানে হোটেল খোলে কেউ। ভিড় লেগেই থাকে। মনোয়ার হাজির সঙ্গে করিম শেখের অনেক দিনের খাতির। এ হাটে এলে একমাত্র হাজির দোকানেই চা খায় করিম। হাজিও বাইরের কোথাও যেতে হলে করিম শেখের নাও ছাড়া অন্য কারো নৌকায় যায় না। চায়ের পয়সা দিতে এলে হাজি একমুখ হেসে শুধালো, কী মেয়া খবর সব ভালো তো?

করিম শেখ বিরক্তির সঙ্গে বললো, আর খবর, হাঁপানি হয়া মরতাছি।

আহা, ওইডা আবার কখন থাইকা হইলো? হাজির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। তা মেয়া হাঁপানি নিয়া না বাইরলেই পারতা।

কী আর কইমু ভাই। পেট তো চলে না। করিম শেখ আস্তে করে বললো, পেটতো ঠাণ্ডা গরম কিছু মানে না।

মন্তুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে করিম।

কিছুক্ষণ হাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে ওরা।

তারপর আবার নৌকায়।

যাত্রী নিয়ে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় ওদের। করিম শেখ হাল ধরে বসে থাকে। মন্তু দাঁড় বায়। আকাশটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে দুপাশের গ্রামগুলো। মাঝে মাঝে দুএকটা মিটমিটে বাতি দেখে বোঝা যায় গেরস্থদের বাড়ি গেলো একটা। কিম্বা হঠাৎ কোথাও একসার বাতি দুলতে দুলতে এগিয়ে যেতে দেখলে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায় হাট থেকে ফিরছে ওরা, হাটুরের দল।

মাঝে মাঝে দুএকটা শিয়াল আর অনেকগুলো কুকুরের দলবাঁধা ডাক শোনা যায়। আর উজান নদীর একটানা কলকল শব্দ।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরে মন্তু।

গানের সুর বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। করিম শেখ হুঁকোটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে, নাও মিয়া তামুক খাও। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেয় মন্তু। গুড়ুক গুড়ুক টান মারে হুঁকোতে।

তারপর আবার গান ধরে, আশা ছিলো মনে মনে।

গান শুনে করিম শেখের মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

ও বলে, এইবার একডা বিয়া শাদী করমু ঠিক করছি। একা একা আর ভালো লাগে না। মন্তু গান থামিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো করে দেখতে পায় না সে!

করিম শেখ আবার বলে, কী মিয়া কিছু কও না যে?

মন্তু বলে, বিয়া করবা সেতো ভালো কথা।
করিম শেখ বলে, করবার তো ইচ্ছা হয়, করি কারে? ভালো দেইখা একটা মাইয়া দেহায়া দাও না।
মন্তু হাসে, বলে, ভালো মাইয়া পাইলে কি আর নিজে এতদিন অবিয়াত থাকি মিয়া। বলে আবার গান ধরে সে।
আশা ছিলো মনে মনে ... ... ।
বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখলো বুড়ো মকবুলের ঘরের সামনে একটা ছোটখাট জটলা বসেছে। বাড়ির সবার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করছে মকবুল। বাড়ির সবার চেয়ে বড় সে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সকলকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না বুড়ো। অন্য সবার বেলাও তাই। মকবুলকে জিজ্ঞেস না করে বাড়ির কেউ কোনোদিন কোনো কাজ কারবার করে না। সুরত আলীর সঙ্গে হয়তো রশীদের মনোমালিন্য আছে। আবুলকে হয়তো মকবুল দুচোখে দেখতে পারে না। গনু মোল্লাকে হয়তো দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার অভিশাপ দেয় ফকিরের মা। কিন্তু, বাড়ির মান সম্মান জড়িয়ে আছে এমন কোনো কাজের বেলা কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। তখন সবাই এক। একসঙ্গে বসে পরামর্শ করবে ওরা। মন্তুকে আসতে দেখে ওর দিকে একখানা পিঁড়ি বাড়িয়ে দিলো সালেহা, বহ মন্তু মিয়া বহ।
আলোচনার ধারাটা মুহূর্তে বুঝে নিলো মন্তু। বুড়ো মকবুলের মেয়ে হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাবার বাড়ির গ্রাম থেকে। আজ সন্ধ্যায় টুনিকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর বাবার বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো। সেই দিয়ে গেছে প্রস্তাবটা। জুলু শেখের বেটা কদম শেখ। হাল গরু জমি সব আছে ওদের। খাস গেরস্থ ঘরের ছেলে। বিয়ে একটা অবশ্য করেছিলো একবার। মাস তিনেক হল বউ মারা গেছে।
আমেনা বলছে, অত চিন্তা কইরা আর কী অইবো; পাকা কথা দিয়া দ্যান। গনু মোল্লা বললো, সব খোদার ইচ্ছা। মাইয়ার কপালে যদি সুখ থাকে তাইলে যেইহানে বিয়া দিবা সেইহানেই সুখে থাকবো। বড় বেশি বাছ বিচার কইরো না।
মকবুল সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো, হ্যাঁ, তাতো ঠিক কথা।
হীরনের বিয়ের কথা নিয়ে আলাপ হচ্ছিল, মাঝখানে রশীদের বউ সালেহা বলে উঠলো, আমাগো মন্তু মিয়ারেও এইবার একটা বিয়া করাইয়া দ্যান। এক কোণে নীরবে বসেছিলো মন্তু। ওর দিকে তাকিয়ে সকলে সালেহার কথায় একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো।
বুড়ো মকবুল গম্ভীর গলায় বললো, হ, ঠিক কথা কইছ সালেহা।
ওর লাইগা একটা মাইয়া দেহন লাগে।
আমেনা বললো, ওর তো বাপ-মা কেউ নাই, আপনেরা আছেন দেইখা শুইনা করায়া দেন বিয়াডা।
সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন মেয়ে নিয়েও আলাপ করলো ওরা।
ফাতেমার এক খালাতো বোন আছে। রসুন তার নাম। রসুনের মতো সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। বয়স তের চৌদ্দ হবে।
আবুল বললো, ওর মামার এক মেয়ে আছে। দেখতে যেমন হুরপরি। তাই মামা আদর করে পরি বলে ডাকে। শুধু স্বভাবটা যেন একটু কেমন কেমন। তাও তেমন কিছু নয়।
খায় একটু বেশি। আর ঘুমোয়। মকবুল পরক্ষণে বললো, ও মাইয়া ঘরে আইনা কাজ নাই মিয়া। আমেনা বললো, অত দূরে দূরে যাইতাছ ক্যান, নিজ গেরামে দেহ না। আমাগো আম্বিয়া কী খারাপ মাইয়া নাহি। ও হইলেই খুব ভালো হয়। দিনরাত গতর খাটাবার পারে। মন্তু মিয়ারে সুখে রাখবো। আম্বিয়ার প্রশ্নে কারো কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেলো না। ও মেয়ে গতর খাটাতে পারে এ কথা সত্যি। কিন্তু ঘরের বউ করে আনার মতো মেয়ে ও নয়।
মকবুল বললো, ওগো বংশে হাঁপানি রোগ আছে। শেষে হাঁপানি হইয়া মন্তুও মরবো।
মন্তু কিন্তু একটা কথাও বললো না। সে চুপ করে বসে রইলো এক কোণে। আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সেদিনের মতো উঠে গেলো সবাই। একটু পরে যে যার ঘরে চলে গেলো ওরা।
পিদিম জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হল মন্তু। মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলার ফুল ঝুলছে। বকের মতো সাদা ধবধবে পাতার মাঝখানে হলুদ রঙের কুঁড়ি। ডাটাসহ ফুলগুলো মাচাঙ থেকে নামিয়ে নিলো মন্তু।
আজ সন্ধ্যায় বাপের বাড়ি চলে গেছে টুনি। যাবার আগে এগুলো রেখে গেছে ওর ঘরে। এক টুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো মন্তুর ঠোঁটের কোণে। ফুলগুলো আবার মাচাঙের উপর তুলে রেখে বিছানাটা নামিয়ে নিলো মন্তু।
কিছুদিন ধরে শীত পড়তে শুরু করেছে।

দিনের বেলা ঈষৎ গরম। শেষ রাতে প্রচণ্ড শীত, হাড় কাঁপুনি শুরু হয়। কাঁথার নিচেও দেহটা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। এ সময়ে বাড়ির সবাই মাটির ভাড়ে ভুসির আগুন জ্বেলে মাথার কাছে রাখে। মাঝে মাঝে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আগুনটাকে উস্কে দেয়। আজকাল ভোর হওয়ার অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে যায় মন্তু। সোয়া দুটাকা দিয়ে কেনা খদ্দরের চাদরটা গায়ে মাথায় মুড়িয়ে নিয়ে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে মাঝি-বাড়ির দিকে ছোটে সে। ক'দিন হল করিম শেখ হাঁপানিতে পড়েছে। সারাদিন খুক খুক করে কাশে আর লম্বা শ্বাস নেয়।

মন্তু বলে, একডা কোবিরাজ দেহাও মিয়া।

করিম বলে, কিছু হয় না মিয়া, অনেক দেহাইছি।

আম্বিয়া বলে, হাটে গঞ্জে যাও ভালো দেইখা ডাকতর দেখাইতে পার না?

করিম শেখ চুপ করে থাকে কিছু বলে না। আজ সকালে মাঝি-বাড়ির দিকে সবে রওয়ানা দিয়েছে মন্তু। দাওয়া থেকে মকবুল ডেকে বললো, রাইতের বেলা একটু সকাল কইরা ফিরো মন্তু মিয়া। হীরনের বিয়ার ফর্দ হইবো আজই।

বাড়ির সকলকে আজ একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরে আসতে বলে দিয়েছে বুড়ো মকবুল। বিদেশ থেকে মেহমানরা আসবে ওদের, খাতির যত্ন করতে হবে। আদর আপ্যায়ন করে খাওয়াতে হবে ওদের। নইলে বাড়ির বদনাম করবে ওরা।

মন্তুর উপরে আরো একটা ভার দিয়েছে মকবুল। নাও নিয়ে গিয়ে টুনিকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

দুএক দিনের মধ্যে নবীনগরে যাবে মন্তু। করিম শেখের শরীরটা একটু ভালো হয়ে উঠলেই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে সে।

পথের দুপাশের ক্ষেতগুলোতে কলাই, মুগ, মটর আর সরষে লাগানো হয়েছে। সারারাতের কুয়াশায় সকালে সতেজ হয়ে উঠেছে ওরা। রোদ পড়ে শিশিরের ফোঁটাগুলো চিকচিক করছে ওদের গায়ে।

মাঝি-বাড়ির দেউড়ির সামনে আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মন্তুর। পুকুর থেকে এইমাত্র গোছল করে ফিরছে সে। ঘন কালো চুলগুলো থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখনো পানি ঝরছে। হাতের ভেজা শাড়িটার পানি নিংড়াতে নিংড়াতে আম্বিয়া বললো, মন্তু ভাই হুট কইরা চইলা যাইও না। পিঠা বানাইছি খাইয়া যাইও।

মন্তু বললো, এই সকাল বেলা গোছল করছো তোমার শীত লাগে না? আম্বিয়া একটু হাসলো শুধু। কিছু বললো না।

সারারাত মিয়া-বাড়িতে ধান ভেনেছে সে। এই শীতের রাতেও ধান ভানতে গিয়ে সারা দেহে ঘাম নেমেছে ওর। পুরো গায়ের কাপড়ে ঘামের বিশ্রী গন্ধ। তাই সকাল সকাল গোসল করে নিয়েছে আম্বিয়া। খেয়ে দেয়ে একটু পরে ঘুম দেবে সে। উঠবে সেই অপরাহ্নে। তারপর আবার মিয়া বাড়ি চলে যাবে আম্বিয়া। ধান ভানবে, সারারাত।

মন্তুকে একটা পিঁড়িতে বসতে দিয়ে ওর সামনে এক বাসন পিঠা এগিয়ে দিলো আম্বিয়া। কাঁথার ভেতর থেকে মুখ বের করে করিম শেখ বললো, খাও মিয়া খাও। বলে আবার কাশতে শুরু করলো সে। আম্বিয়া তখন পাশের ঘরে গিয়ে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। মাঝে মাঝে বুড়ো নন্তু শেখের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে সে।

বেড়ার খুপরি দিয়ে ওকে দেখতে লাগলো মন্তু। আঁটসাঁট দেহের খাঁচে খাঁচে দুরন্ত যৌবন। আট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়। আজ আম্বিয়াকে বড় ভালো লাগছে মন্তুর। চোখের পলক জোড়া ঈষৎ কেঁপে উঠলো। হ্যাঁ, আম্বিয়াকে বিয়ে করবে সে। হোক হাঁপানি। সে পরে দেখা যাবে। বুড়ো মকবুলকে আজকেই ওর মনের কথাটা জানিয়ে দেবে মন্তু। সহসা একটা সিদ্ধান্ত করে বসলো সে।

করিম শেখ লম্বা শ্বাস নিয়ে বললো, কী মিয়া হাত তুইলা বইসা রইলা যে? মন্তু তাড়াতাড়ি একটা পিঠা মুখে পুরে দিয়ে বললো, হুঁ হুঁ এইতো খাইতাছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো বাসনটা শূন্য করে দিলো মন্তু। কাঁথাটা ভালোভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে করিম শেখ কাঁপা গলায় বললো, আমার বুঝি দিনকাল শেষ হইয়া আইলো মিয়া, আর বাঁচুম না।

আহা অমন কথা কয় না মিয়া। অমন কথা কয় না। পরক্ষণে ওকে বাধা দিয়ে মন্তু বললো, মরণের কথা চিন্তা কইরতে নাই। আয়ু কইমা যায়।

করিম শেখ তবু বিড়বিড় করে আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করতে লাগে।

রাতে এলো ওরা।

বরের মামা, চাচা আরো দুতিনজন লোক।

হীরনের বিয়ের ফর্দ হবে আজ।

মকবুলের বাইরের ঘরটাতে ফরাস পেতে বসানো হল ওদের।

গনু মোল্লা বসলেন সবার মাঝখানে।

আবুল, রশীদ আর সুরত আলী ওরাও বসলো সেখানে। বুড়ো মকবুল প্রথমে আসতে রাজি হয়নি। বলছিলো, তোমরা সবাই আছ, ভালো মন্দ যা বুঝ আলাপ কর গিয়া। আমারে ওর মধ্যে টাইনো না। রশীদ বললো, কী কথা, আপনের মাইয়া আপনে না থাকলে চলবো কেমন কইরা?

ঘরের ভেতর থেকে বরের চাচা হাঁক ছাড়লো, কই, বেয়াই কই, তেনারে দেহি না ক্যান?

অবশেষে ঘরে এসে এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লো মকবুল। প্রথমে মেহমানদের ভাত খাওয়ান হবে। তারপরে ফর্দ হবে বিয়ের। মন্তু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলো কখন বুড়ো মকবুলকে কিছুক্ষণের জন্যে একা পাওয়া যায়। তাহলে নিজের বিয়ের কথাটা ওকে বলবে সে। এই শীতে, হ্যাঁ এই শীতেই বিয়ে করে ঘরে বউ আনতে চায় মন্তু। কিন্তু মকবুলকে একা পাওয়া গেলো না।

সারা বাড়িতে আজ ভিড়।

রান্না ঘরের ভিড়টা সবচেয়ে বেশি। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা সবাই গিয়ে জুটেছে সেখানে। সারাক্ষণ বকবক করছে। কার কথা কে শুনছে কিছু বোঝা যায় না। হাঁড়িপাতিলগুলো একপাশে টেনে নিয়ে বাসন বাসন ভাত বাড়ছে আমেনা।

হঠাৎ মন্তুকে সামনে পেয়ে আমেনা জিজ্ঞেস করলো, মানুষ ক'জন?

মন্তু বললো, আটজন।

আটজন! আমেনার মাথায় রীতিমতো বাজ পড়লো। আটজনের কি ভাত রানছি আমি? আমি তো রানছি চাইরজনের। তোমার ভাইয়ে আমারে চাইরজনের কথা কইছিলো।

বড় ঘর থেকে রান্নাঘরের দিকে আসছিলো মকবুল, কথাটা কানে গেলো ওর। পরক্ষণে ভিতরে এসে রাগে ফেটে পড়লো সে। আমি কি জাইনতাম, আটজন আইব ওরা? বারবার কইরা কইয়া দিছি চাইরজনের বেশি আইসেন না আপনেরা। ওরা তহন মাইনা নিছে। আর এহন– বলে ঠোঁটজোড়া বিকৃত করে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করলো মকবুল, হালার ভাত যেন এই জন্মে দেহে নাই হালারা।

হইছে হইছে। আপনে আর চিল্লায়েন না, থামেন। মেঝ বউ ফাতেমা চাপা গলায় বললো, যান যা আছে তা দিয়ে একবার খাওয়ান। আমরা না হয় পরে খামু।

ফাতেমার কথায় শান্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল মকবুল, মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বললো, তাইলে মন্তু মিয়া তুমি কাইল পরশু একদিন নবীনগর যাও। কেমন?

মন্তু সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো।

নিজের কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না সে। সহসা তার মনে একটা নতুন চিন্তা এলো। টুনি ফিরে এলে ওকে দিয়ে কথাটা মকবুলকে বলাবে মন্তু।

খাওয়া-দাওয়া শেষে ফর্দ করতে বসলো সবাই।

প্রথমে উঠলো দেনা-পাওনার প্রশ্নটা।

বরের চাচা ইদন শেখ বললো, অলঙ্কারপত্র বেশি দিবার পারমু না মিয়া। হাতের দুই জোড়া চুড়ি আর কানের দুইডা ঝুমকা। গলার আর কমরেরডা দিবো কে? সুরত আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো, ওইগুলোও দিতে অইবো আপনেগোরে।

পায়েরটারে বাদ দিলা ক্যান মিয়া, অ্যাঁ? আবুল জোরের সঙ্গে বললো, পায়ের একজোড়া মলও দেওন লাগবো।

বুড়ো মকবুল নড়েচড়ে বসলো। সুরত আর আবুলের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো সে।

বরের মামা আরব পাটারী মৃদু হেসে বললো, এই বাজারে এতগুলান জিনিস দিতে গেলে কি কম টাকার দরকার মিয়া। আরো একটু কম সম কইরা ধরেন। আচ্ছা, পায়েরটা না হয় নাই দিলাম। মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থতা করে দিলো রশীদ। বাকিগুলান তো দিবেন? হ্যাঁ তাই সই। সুরত আলী বললো, সোনার জিনিস তো আর দিবার লাগছে না রূপার জিনিস দিবেন। তা মন কষাকষির কী দরকার?

মকবুল কিছুই বললো না। একপাশে বসে রইলো চুপ করে।

গনু মোল্লাও নীরব। নীরবে শুধু তছবিহ পড়ছেন ঢুলে ঢুলে।

গহনার কথা শেষ হলে পরে মোহরানার কথা উঠলো।

ইদন শেখ বললো, সব ব্যাপারে আপনাগোডা মাইনা নিছি। এই ব্যাপারে কিন্তুক আমাগোডা মানতো অইবো।

আহা কয়েন না শুনি। রশীদ ঘাড় ঝাঁকালো।

ইদন বললো, মোহরানাডা পাঁচ টাকাই ধরেন।

পাঁচ টাহা? অ্যাঁ পাঁচ টাহা? কন কী? রীতিমতো ক্ষেপে উঠলো সুরত। মাইয়া কি মাগনা পাইছেন নাহি? অ্যাঁ। মাইয়ার কি কোনো দাম নাই?

আহ, দাম আছে বইলাই তো পাঁচ টাহা কইবার লাগছি। নইলে কি আর তিন টাহার উপরে উঠতাম। আবার পাটারীর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়লো। কণ্ঠস্বরে বিকৃতি এনে সে বললো, সক্কল দিক দিয়াই বাড়াবাড়ি করবার লাগছেন আপনারা। আচ্ছা যান, আরো আট আনা বাড়ায়া দিলাম। মোট সাড়ে পাঁচ টাহা।

না বিয়াই। তা অয় না, অইবো না। এতক্ষণে কথা বললো বুড়ো মকবুল। এত কম মোহরানায় মাইয়ারে বিয়া দিবার পারমু না, বলে হঠাৎ কেঁদে উঠলো সে, মাইয়া আমার কইলজার টুকরা বেয়াই। কত কষ্ট কইরা মানুষ করছি। দুহাতে চোখের পানি মুছলো মকবুল।

বিশ টাহা যদি মোহরানা দেন তাইলে মাইয়া বিয়া দিমু।

মকবুলের চোখের পানি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেলো সবাই। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর সোয়া এগার টাকায় মিটমাট হল সব। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে মেহমানরা বিদায় নিয়ে গেলো। মনে মনে খুশি হল মকবুল। সোয়া এগার টাকা মোহরানায় এর আগে এ বাড়ির কোনো মেয়ের বিয়ে হয়নি।

নবীনগরের ছোট খালে এসে নাওয়ের নোঙর ফেললো মন্তু।

খাল পাড়ে উঠে দাঁড়ালে টুনিদের বাড়ির লম্বা নারকেল আর তালগাছগুলো দেখা যায়। আর সেই তাল-নারকেলের বনের ফাঁকে ওদের দেউড়ি ঘরটাও চোখে পড়ে এখান থেকে।

নৌকা থেকে নামার আগে মুখ হাতটা ভালো করে ধুয়ে নিলো মন্তু। পুরনো লুঙিটা পালটে নিয়ে নতুন লুঙিটা পরল, ফতুয়াটা খুলে জামাটা গায়ে দিলো সে। তারপর খদ্দরের চাদরটা কাঁধে ফেলে, পুরনো ছাতাঁ বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে নৌকো থেকে নেমে এলো মন্তু।

কিছুদূর এসে পকেট থেকে টুপিটা বের করলো।

আসার সময় বুড়ো মকবুল বার বার করে বলে দিয়েছে, কুটুমবাড়িতে গিয়ে যেন মন্তু এমন কিছু না করে যার ফলে বাড়ির বদনাম হতে পারে। টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল মন্তু। পথঘাট জানা আছে ওর। এর আগে মকবুলের বিয়ের সময় একবার এসেছিলো সে। দিন তিনেক থেকে গিয়েছে এখানে। রাস্তায় দুচারজন অপরিচিত লোক ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো ওকে।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুর উড়ে যাচ্ছে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। একটু একটু করে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। এদিকের লোকেরা এর মধ্যে খেজুর গাছ কেটে রস নামাতে শুরু করে দিয়েছে। পথে আসতে তিন চারজন গাছুনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মন্তুর।

ধারালো বাটাল দিয়ে গাছ কাটে ওরা। তারপর মাটির কলসী ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসছে গাছ থেকে।

টুনিদের বাড়ির সামনে এসে যার সঙ্গে মন্তুর প্রথম দেখা হল সে টুনির চাচা মোতালেব শিকদার। সন্ধ্যেবেলা গরু-বাছুরগুলোকে ঠেঙিয়ে গোয়াল ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো সে।

মন্তুকে দেখে হা করে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, মন্তু মিয়া না? কী মনে কইরা? মন্তু এগিয়ে এসে পা ধরে সালাম করলো ওর। তারপর বললো, ভাইজান পাঠাইছে, টুনি ভাবীরে নিবার লাইগা।

অ। মুখখানা ঈষৎ ফাঁক করে গরুগুলোকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে আবার গোয়ালঘরের দিকে চলে গেলো মোতালেব শিকদার।

একটু পরে আবার ফিরে এলো সে। বললো, আয়েন ভিতরে আয়েন। টুপিটা ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিলো মন্তু, তারপর শিকদারের পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে এগিয়ে চললো সে।

দেউড়ির পাশে একখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাইরের লোকদের কাছ থেকে ভেতর বাড়ির পর্দা রক্ষা করা হয়েছে। তারই পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে অবাক চোখে দেখছে ওরা। ভেতর বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াতে মন্তু দেখলো, ঘরের দাওয়ায় একটা বাঁশের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টুনি। সারা মুখে ওর হাসি যেন উপচে পড়ছে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

মন্তুকে টুনিদের ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো শিকদার।

রসুই ঘর থেকে টুনির মা বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্তু সালাম করলো তাকে।

মা বললেন, কইরে টুনি। মিয়ারে একখানা জলচৌকি আইনা দে, বউক।

চৌকি এনে দিলে দাওয়ায় বসলো মন্তু।

টুনির মা সবার কুশল জানতে চাইলো। টুনি কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, শুধু মুখ টিপে বারবার হাসতে লাগলো সে।
টুনির মা বললো, টুনি তো কদিন ধইরা যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে।
উঁ যাইবো। যামু না আমি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো টুনি।
মা বললো, দাঁড়ায়া থাইকো না। মিয়ার ওজুর পানি দাও।
মন্তুর জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার পানি আনতে চলে গেলো টুনি। মা-ও গেলো একটু পরে, বললো তরকারিটা নামায়া আই।
চারপাশটা তাকিয়ে দেখছিলো মন্তু। এক বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে বাড়িটার। উঠোনের কোণে পাশাপাশি দুটি জাম গাছ ছিলো। কেটে ফেলা হয়েছে। রান্নাঘরের এ পাশটা নুয়ে পড়েছে এখন। আগে অমনটি ছিলো না। আগে গোয়ালঘরটা পুকুরের পূর্ব পাশে ছিলো, এখন সেটা উত্তর পাশে সরিয়ে আনা হয়েছে।
টুনি এসে এক ঘটি পানি রাখলো ওর সামনে আর এক জোড়া খড়ম। বললো, হাত-মুখ ধুইয়া নাও।
মন্তু মুখ হাত ধুয়ে নিলে ওর দিকে একটা গামছা বাড়িয়ে দিয়ে টুনি বললো, চল ভেতরে চল, বাইরে শীত পড়তাছে।
মন্তু কোনো কথা বললো না। শান্ত শিশুর মতো ওকে অনুসরণ করে ভেতরে চলে গেলো সে।
পাশাপাশি দুটো ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। ও পাশেরটাতে মা-বাবা থাকে আর টুনির ছোট ছোট দুই ভাইবোন। এ পাশের ঘরটা দেখিয়ে টুনি মৃদু হেসে বললো, এইডা আমার ঘর।
ওর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো মন্তু। ছোট ঘর মালপত্র ভরা। কয়েকটা বড় বড় মাটির ঘটি এক কোণে রাখা, তার পাশে তিন চারটে বেতের ঝুড়ি। ঝুড়ি ভর্তি লাল আলু রাখা আছে। দক্ষিণ কোণে একটা কাঠের চৌকি। চৌকির উপরে একটা কাঁথা বিছানো। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। চৌকির নিচে দুটি ছোট ছোট টিনের প্যাটরা। পশ্চিমের বেড়ার সঙ্গে একটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তাকের উপরে রাখা আছে কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন। তার পাশে বেড়ার সঙ্গে একটা ভাঙ্গা আয়না ঝোলান। উত্তর কোণে একটা দড়ির সঙ্গে ঝুলছে টুনির দুখানা শাড়ি, একটা ময়লা কাঁথা। তাছাড়া ঘরের ঠিক মাঝখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতগুলো ছিকে। ছিকের মধ্যে কয়েকটা হাঁড়িপাতিল রাখা। মন্তু মুহূর্তে চোখ বুলিয়ে নিলো পুরো ঘরটার ওপর। টুনি চৌকিটা দেখিয়ে বললো, এইখানে বও।
মন্তু বসলো।
কিছুক্ষণ ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টুনি বললো, অমন শুকায়া গেছ ক্যান?
মন্তু পরক্ষণে বললো, কই না, শুকাই নাই তো।
টুনি মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।
মন্তুর মনে হল এ ক'মাসে টুনি অনেক পাল্টে গেছে।
রাতে টুনির ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত হল।
ময়লা কাঁথাটার ওপর ওর একখানা শাড়ি বিছিয়ে দিলো। বালিশটাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলো। তারপর বললো, আর বইসা থাইকো না শুইয়া পড়।
মন্তু বললো, বেহান রাইতে কিন্তুক রওয়ানা দিতে হইবো।
ওর কথা শেষ না হতে শব্দ করে হেসে দিলো টুনি।
বললো, ইস, কইলেই অইলো। তারপর একটুকাল থেমেই আবার বললো, সে কম কইরা অইলেও তিনদিন আমাগো বাড়ি বেড়ান লাগবো। তারপরে যাওনের নাম।
মন্তু বললো, পাগল অইছ? তাহলে ভাইজানে মাইরা ফালাইবো আমারে। করিম শেখের নাও নিয়ে আইছি- আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে। টুনি বললো, যাই শুই গিয়া, কথা যা অইবার কাল সকালে অইবো। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেলো সে। কুপিটা নিভিয়ে দিয়ে একটু পরেই শুয়ে পড়লো মন্তু। করিম শেখের কথা মনে হতে আম্বিয়ার কথাও মনে পড়ছে তার।
এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে টুনিকে সব বলবে মন্তু। টুনি নিশ্চয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে ওকে।
কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

ঘুম ভাঙলো কখন সে ঠিক বলতে পারবে না। রাতের গভীর অন্ধকারে সে অনুভব করলো একটা হাত তার চুলগুলো নিয়ে খেলছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলো মন্তু।
গনু মোল্লার কাছ থেকে নেয়া তাবিজটা বাহুতে বাঁধা আছে কিনা দেখলো। তারপরে কে যেন চাপা স্বরে ওকে ডাকলো, এই। সহসা কোনো সাড়া দিলো না মন্তু।

হঠাৎ ওর হাতখানা শক্ত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো সে। নরম তুলতুলে একটা হাত। একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি শোনা গেলো, উঃ এই।

পরমুহূর্তে হাতখানা ছেড়ে দিলো মন্তু। টুনি?

ইস, কথা কয়ো না। মায় হুনব। ওর মুখের ওপরে একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর মুখখানা আরো নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে করে বললো, চুপ শব্দ কইরো না। শোন, চুপচাপ উইড্যা আইও আমার সঙ্গে।

কিছু বুঝে উঠতে পারলো না মন্তু। টুনির মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। একটু পরে টুনির পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এলো মন্তু।

বাইরে এসে দেখলো টুনির হাতে একটা মাটির কলস। শীতে দুজনে রীতিমতো কাঁপছিলো ওরা।

মন্তু প্রশ্ন করলো, কী, কী অইছে?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, কিছু অয় নাই, এদিকে আইও। ওর একখানা হাত ধরে অন্ধকারে টেনে নিয়ে চললো তাকে। বার বাড়িতে এসে মন্তু আবার প্রশ্ন করলো, কই চললা?

টুনি শব্দ করে হাসলো, আবার বললো, কলসী গলায় দিয়া দুইজনে পুকুরে ডুইবা মরুম চল। তারপরেই মন্তুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সহসা প্রশ্ন করলো সে, আমার সঙ্গে মরতা পারবা না?

কী উত্তর দেবে ভেবে পেলো না মন্তু। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার হেসে উঠলো টুনি। হাসির দমকে দেহটা বারবার দুলে উঠলো তার। বললো, ঘাবড়ায়ো না মিয়া তোমারে মারুম না। বলে আবার চলতে লাগলো সে।

এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলো মন্তু যে শীতের প্রকোপটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে না যেতে প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁত লেগে এলো ওর।

একটা লম্বা খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো টুনি। কলসিটা মন্তুর হাতে দিয়ে বললো, এইটা রাখ হাতে তারপর পরনের শাড়িটাকে লুঙির মতো গুটিয়ে নিলো সে। মন্তু কাঁপা গলায় শুধালো কী কর?

ওর প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না টুনি। নির্বিকারভাবে খেজুর গাছটা বেয়ে ওপরে উঠে গেলো সে।

মন্তুর মনে হল ও স্বপ্ন দেখছে।

একটু পরে এক হাতে রসের হাঁড়িটা নিয়ে অন্য হাতে গাছ বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলো টুনি। কলসির মধ্যে রসটা ঢেলে হাঁড়িটা রেখে আসবার জন্য আবার ওপরে যাচ্ছিলো টুনি। মন্তু বললো, আরে কী কর। গাছ এখন পিছল। পইড়া যাইবা।

পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসলো টুনি। বললো, ইস কত উঠছি। পাশের ঝোপ থেকে দুটো শিয়াল ছুটে এসে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মন্তুর দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চোখজোড়া অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ওদের। মন্তু একটা ধমক দিতে ছুটে পালিয়ে গেলো ওরা।

টুনি নেবে এসে বললো, কারে ধমকাও?

মন্তু আস্তে করে বললো, শিয়াল।

আরো অনেকগুলো খেজুর গাছ থেকে রস নাবিয়ে কলসি ভর্তি করলো ওরা। শীতের রাতে কুয়াশার বৃষ্টি ঝরছে চারদিকে। মাটি ভিজে গেছে। গাছের পাতাগুলোও ভেজা। আশেপাশে তাকাতে গেলে বেশি দূরে দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে চারদিক। হঠাৎ মন্তুর গায়ে হাত দিয়ে টুনি বললো, শীত লাগতাছে বুঝি?

মন্তু কোনো জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তোমার লাগে না?

টুনি বললো, উঁহু। বলে মাথাটা দোলালো সে।

মন্তু বললো, রস দিয়া করবা কী?

টুনি বললো, সিন্নি রান্দুম।

মন্তু কোনো কথা বলার আগেই টুনি আবার বললো, তোমার নায়ে চলো।

মন্তু অবাক হল, নায়ে গিয়া কী করবা?

টুনি নির্লিপ্ত গলায় বললো, সিন্নি রান্দুম?

মন্তু বললো, পাগল হইছ?

টুনি ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, হুঁ। বলে মন্তুর মুখের দিকে তাকালো সে, কই নাওয়ে যাইবা না?

মন্তু কঠিন স্বরে বললো, না।

ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো টুনি। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মুহূর্তে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো সে। হাতের কলসিটা উপরে তুলে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। মাটিতে পড়ে মাটির কলসি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। রস গড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনে বোবা হয়ে গেলো ওরা।

কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুলো না।

মন্তু নীরবে তাকিয়ে রইলো, ভাঙা কলসির টুকরোগুলোর দিকে। টুনি মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্ধকারে পাথরের মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুকুর পাড়ে লম্বা তালগাছগুলোর মাথায় দুটো বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠলো।

টুনি আস্তে করে বললো, চল ঘরে যাই, চল।

মন্তু কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো শুধু।

পরদিন যাওয়া হল না মন্তুর।

টুনির মা বললো কুটুমবাড়ি আইয়ে নিজের ইচ্ছায়, যায় পরের ইচ্ছায়। ইচ্ছা করলেই তো আর যাইতে পারবা না মিয়া। যহন যাইতে দিমু তহন যাইবা। অগত্যা থেকে যাওয়া হল।

সারাদিন একবারও কাছে এলো না টুনি। অথচ সারাক্ষণ বাড়িতে ছিলো সে। ঘরদোর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছে। ঘাটে গিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে এনেছে। রান্নাবান্না করেছে।

তারপর খাওয়ার সময় মা ডেকে বলছে, কইরে টুনি এইদিকে আয়। মন্তু মিয়াকে ভাত বাইড়া দে। তখন শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে থেকেছে সে।

রাতেরবেলা হঠাৎ বেঁকে বসলো টুনি। বললো, কাল সক্কাল বেলাই চইলা যামু আমি।

জিনিসপত্র সব গুছাইয়া দাও।

মা বললো, আরো দুইটা দিন থাইকা যা। আবার কবে আইবার পারবি কে জানে।

টুনি বললো, না মন্তু মিয়ার কাম-কাজের ক্ষতি অইয়া যাইতেছে।

মা বললো, না মন্তু মিয়াকে বুঝাইয়া কইছি। হে রাজি আছে।

টুনি তবু বললো, না কাল সক্কালেই চইলা যামু।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনলো মন্তু।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অজুহাত– কারণ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যে কারণ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। **আশঙ্কা**– ভয়; সংশয়। **আন্তরিকতার সুর**– সহমর্মিতাসহ। **কাতরোক্তি**– কষ্ট বা যন্ত্রণায় লোকে যে ধরনের শব্দ করে। **কুপি**– খোলা বাতি। **কুটুম বাড়ি**– আত্মীয় বাড়ি। **খুচরো**– পরিমাণের দিক দিয়ে ছোট, সামান্য। **খড়ম**– কাঠের তৈরি পাদুকা বিশেষ। **খাতির**– সুসম্পর্ক। **খুপরি**– ছোট ছোট ফাঁক-ফোঁকর। **গতর খাটাবার পারে**– অত্যন্ত পরিশ্রম করতে পারে। **গেরস্থ**– গৃহস্ত শব্দের কথ্যরূপ। **ডিঙিয়ে**– পার হয়ে, অতিক্রম করে। **পাইকারি**– এক সঙ্গে অনেক জিনিস কেনা বা বেচা। **পরগনা**– কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। **দোচালা ঘর**– দুই চাল দিয়ে বানানো ঘর। **হাঁপানি**– শ্বাস কষ্ট জনিত রোগ বিশেষ। **একসার**– অনেকগুলো বাতি। **প্রতিধ্বনি**– কোথাও আঘাত পেয়ে আবার যে শব্দ হয়। **উদাস**– উন্মনা, এলোমেলো। **হুরপরি**– পরম সুন্দরী। **মাচাঙ**– বাঁশের তৈরি উঁচু জায়গা যেখানে বাসন কোসন বা গৃহস্থালির জিনিসপত্র রাখা হয়। **ম্লান**– মলিন বা বিষণ্ন। **ভাঁড়**– মাটির তৈরি পাত্র। **ভূসির আগুন**– কাঠের বা গম; চাল, ডাল ইত্যাদির খোসা বা চোকলা দিয়ে জ্বালানো আগুন যা অনেকক্ষণ ধরে তাপ দেয়। **ডাকতর**– ডাক্তার শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **সতেজ**– বলবান। **পরক্ষণে**– পর মুহূর্তে। **বিড়বিড় করে**– শব্দ না করে; অনুচ্চ স্বরে। **ফরাস**– মেঝেতে পেতে বসার জন্য কাপড়। **হাঁক ছাড়ল**– শব্দ করে বা উচ্চ স্বরে ডাকল। **রাঁনছি**– রেধেছি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **বিকৃতি**– অস্বাভাবিক। **মোহরানা**– দেনমোহর। **অপ্রতিভ**– বিব্রত; কী করতে হবে বুঝতে না পারা। **নোঙর**– শিকল বা কাছির সাথে বাঁধা লাঙলের আকৃতির লোহার ভারী অঙ্কুরবিশেষ। **ঈষৎ**–সামান্য। **বিস্ময়**– আশ্চর্য; অবাক। **গাছুনি**– খেজুর গাছ কেটে রস বের করে যারা। **বাটাল**– লোহার তৈরি ধারাল অস্ত্র। **হা করে**– অবাক হয়ে। **ঠেঙাতে ঠেঙাতে**– তাড়াতে

তাড়াতে। **দাওয়ায়**– বারান্দায়। **রসুই ঘর**– রান্নাঘর। **জলচৌকি**– কাঠের তৈরি ছোট চৌকি। **যাওনের লাগি উথাল পাতাল লাগাইছে**– যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। **নুয়ে পড়েছে**– হেলে পড়েছে; নিচু হয়ে পড়েছে। **ঘটি**– কাঁসা বা সিলভারের তৈরি ছোট পানির পাত্র। **টিনের প্যাটরা**– টিন দিয়ে বানানো ছোট বাক্স। **বেহান রাইতে**– খুব সকালে। **প্রকোপ**– তীব্রতা; **নির্বিকারভাবে**– বিকারহীনভাবে; কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না এমনভাবে। **পিছল**– পিচ্ছিল। **নির্লিপ্ত**– সমন্বয়হীন; সম্পর্কশূন্য। **নিশ্চল**– যা চলাচল করে না; স্থির।

সারসংক্ষেপ :

করিম শেখের নৌকায় করে মন্তু নানা জায়গায় যেতে শুরু করেছে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে মন্তু দেখে, মকবুলের ঘরের সামনে সবাই জটলা পাকিয়ে আছে। হীরনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে টুনির বাপের বাড়ির গ্রাম থেকে। হীরনের বিয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেই সালেহা হঠাৎ মন্তুর বিয়ের কথা তোলে। নানা মেয়ের প্রস্তাব আসে; কিন্তু কোনোটাতেই সকলে সম্মত হয় না। শেষে আসে আম্বিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা। আমেনাই প্রস্তাবটা দেয়। কিন্তু আম্বিয়ার বংশে হাঁপানি আছে বলে মকবুল আপত্তি করে। হীরনের বিয়ের আলোচনা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখে মাচাঙের ওপর একরাশ শাপলা ঝুলছে। টুনি আজ বাপের বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় মন্তুর জন্য সে রেখে গেছে স্মৃতিচিহ্ন। করিম শেখের বাড়ির দেউড়ির সামনেই আম্বিয়ার সঙ্গে দেখা হয় মন্তুর। আম্বিয়া এই শীতের সকালেও পুকুর থেকে গোসল করে এসেছে। আম্বিয়ার দেয়া পিঠা খেতে খেতেই মন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে আম্বিয়াকে বিয়ে করবে। এদিকে মকবুল আবার টুনিকে নিয়ে আসার জন্য মন্তুকে দায়িত্ব দেয়। টুনিদের বাড়িতে এসে মন্তু সবার সঙ্গে দেখা করে। সবাই কুশলাদি জানতে চায়। টুনি কিছুই জানতে চায় না, কেবল মুখ টিপে হাসে। মাঝরাতে টুনির ডাকে মন্তুর ঘুম ভেঙে যায়। টুনি মন্তুকে ডেকে নিয়ে নিজেই খেজুর গাছে উঠে রস নামায়। সে নৌকায় বসে রসের সিন্নি রাঁধতে চায়। কিন্তু এতে মন্তু কঠোরভাবেই আপত্তি জানায়। রাগে, দুঃখে টুনি রসের কলসিটা মাটিতে ফেলে দেয়। পরদিন টুনি সারাদিন একবারও মন্তুর কাছে আসে না। রাতের বেলায় মাকে জানিয়ে দেয়, পরদিন সকালেই সে চলে যাবে। অথচ এর আগে টুনিই মন্তুকে কয়েকদিন বেড়িয়ে যেতে বলেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. 'রসুনের মত সাদা হলুদে মেশানো গায়ের রঙ' – কার?

ক. ফাতেমার   খ. আম্বিয়ার   গ. টুনির   ঘ. পরির

১৮. করিম শেখের হাঁপানি শুনে মনোয়ার হাজির মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়–

ক. আনন্দের সুর   খ. বিষাদের সুর   গ. তাচ্ছিল্যের সুর   ঘ. নিন্দার সুর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ফ্রাইডেতে ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফিরতে হবে। হোটেল থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে। কাউন্টারে যেতেই হোটেল বয় ধরিয়ে দিল একটি ফুলের তোড়া। জানতে পারলাম না, কে এসেছিল? তোড়ার নিচের দিকে দেখা গেল, বড় যত্ন করে লেখা একটি নাম– নাছরিন।

১৯. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আম্বিয়া   খ. টুনি   গ. সালেহা   ঘ. আমেনা

২০. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ –

i. ভালবাসা প্রকাশে   ii. ঘৃণা প্রকাশে   iii. হতাশা প্রকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- মন্তু আর টুনির মধ্যকার মান-অভিমান কী করে সহজ হল তা বলতে পারবেন;
- মন্তু আর টুনির সার্কাস দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাড়ি পৌঁছাতে মন্তু আর টুনির এত দেরি হল কেন তা বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

পরদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলো ওরা।

মন্তু আর টুনি।

ওর বাবা আর দুই চাচা শিকদার খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো ওদের। সঙ্গে ছোট দুই ভাইবোনও এলো আর এলো ওদের কালো কুকুরটা।

ছইয়ের মধ্যে টুনির জন্যে কাঁথাটা বিছিয়ে দিয়েছিলো মন্তু। তার ওপর গুটিসুটি হয়ে বসলো সে।

খালের পাড়ে যতক্ষণ তার বাবা চাচা আর ভাইবোনদের দেখা গেলো ততক্ষণ সে দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টুনি। তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে রইলো।

খাল পেরিয়ে যখন নৌকা নদীতে এসে পড়লো তখন দুপুর হয়ে আসছে।

টুনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। মন্তু সারাক্ষণ কথা বলার জন্য আকুপাকু করছিলো। কিন্তু একবারও সুযোগ দিলো না টুনি। উজান নদীতে দাঁড় বেয়ে চলতে চলতে এক সময়ে মন্তু বললো, বাইরে আইয়া বহো গায়ে বাতাস লাগবো।

ও নড়েচড়ে বসলো কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলো না।

একটু পরে একটা কাপড়ের পুটুলি থেকে কিছু চিড়া আর এক টুকরো খেজুরের গুড় বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলো টুনি। বললো, বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও। বলে আবার চুপ করে গেলো সে।

মন্তু বললো, তুমি খাইবা না?

না।

না কেন?

ক্ষিধা নাই।

ঠিক আছে, আমারও ক্ষিধা নাই। বলে আবার দাঁড় বাইতে লাগলো মন্তু। নদীর পানিতে দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণ আর কিছুই শোনা গেলো না।

ক্ষণকাল পরে টুনি আবার বললো, খাইবা না।

না।

শেষে শরীর খারাপ করবো।

করুক গা। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিলো মন্তু।

আর বেশিক্ষণ ছইয়ের ভেতর বসে থাকতে পারলো না টুনি। অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এলো সে, চিড়ার বাসনটা তুলে নিয়ে ওর সামনে এসে বসলো।

নাও, খাও।

কইলাম তো খামু না।

তাইলে কিন্তু পানির মধ্যে সব ফালাইয়া দিমু আমি। টুনি ভয় দেখালো ওকে।

মন্তু নির্বিকার গলায় বললো, দাও ফালাইয়া।

কিন্তু ফেললো না টুনি। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাসির দমকে মাথার ঘোমটাটা খসে পড়লো কাঁধের ওপর।

টুনি বললো, আমি খাওয়াইয়া দিই।
মন্তু বললো, না।
টুনি বললো, তাইলে তুমি নিজ হাতে খাও। আমিও খাই। বলে এক মুঠো চিড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো সে।
মন্তুর মুখেও এক ঝলক হাসি জেগে উঠলো। এতক্ষণে টুনির কোলের উপরে রাখা বাসন থেকে এক মুঠো চিড়ে নিয়ে সেও মুখে পুরলো।
টুনি বললো, গুড় নাও। খাজুরি গুড়।
চিড়ে খেতে খেতে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সহজ হয়ে এলো টুনি।
এক ফাঁকে ওকে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি পৌঁছাইতে কতক্ষণ লাগবো?
মন্তু একটু চিন্তা করে নিয়ে বললো, মাইজ রাতে।
বেশ জোরে দাঁড় বাইছিলো মন্তু।
হঠাৎ টুনি বললো, এত তাড়াতাড়ি করতাছ কেন? আস্তে বাও না।
মন্তু বললো, তাইলে বাড়ি যাইতে তিন দিন লাগবো।
লাগে তো লাগুক না। টুনির কণ্ঠস্বরে চরম নির্লিপ্ততা।
মন্তু কোনো জবাব দিলো না।
আঁজলা ভরে নদীর পানি পান করলো ওরা। তারপর ছইয়ের বাইরে বসে টুনি দুহাতে নদীর পানি নিয়ে খেলা করতে লাগলো। দুপাশে অসংখ্য গ্রাম। একটার পর একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে রবি-শস্যের ক্ষেত, নারকেল আর ঘন সুপারির বন।
জেলেদের পাড়া।
ছোট ছোট ডিঙি নৌকোয় চড়ে মাঝ নদীতে এসে জাল ফেলেছে ওরা।
একখানা হাত পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে টুনি বললো, তুমি এইবার জিরাও। আমি দাঁড় টানি।
মন্তু হেসে বললো, পাগল নাকি?
টুনি বললো, ক্যান?
মন্তু বললো, অত সহজ না, দাঁড় বাইতে ক্ষেমতার দরকার আছে।
টুনি আবার চুপ করে গেলো।
বিকেলের দিকে শান্তির হাটের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো ওরা। নদী এখন দম ধরেছে। পানিতে আর সেই স্রোত নেই। একটা থমথমে ভাব। একটু পরে জোয়ার আসবে। তখন আর নৌকা নিয়ে এগোন যাবে না, কূলে এনে বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জোয়ার নেমে গিয়ে ভাটা পড়লে তখন আবার নৌকা ছাড়বে মন্তু।
দূর থেকে শান্তির হাট দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে সেখানে।
ওদিকে তাকিয়ে টুনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ওইহানে কী?
মন্তু বললো, ওইটা শান্তির হাট।
টুনি পানি থেকে হাতটা তুলে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গি করে বললো, ওইহানে চুড়ি পাওন যায়? আমারে কিন্না দিবা?
মন্তুর ইচ্ছে, জোয়ার আসার আগে শান্তির হাটে গিয়ে নৌকা ভিড়াবে। তাই সংক্ষেপে বললো, হুঁ দিমু।
শান্তির হাটে পৌঁছে, একটা নিরাপদ স্থান দেখে নৌকা বাঁধলো মন্তু।
নদীর পাড়ে খালি জায়গাটায় তাবু পড়েছে একটা। বিচিত্র তার রঙ। বাইরে ব্যান্ড পার্টি বাজছে খুব জোরে জোরে। চারপাশে লোকজনের ভিড়। হাটের কাছে আসার পর থেকে ছইয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে টুনি। সেখান থেকে মুখ বের করে হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, ওইহানে কী?
মন্তু বললো, সার্কাস পার্টি। সার্কাস পার্টি আইছে।
সেদিকে তাকিয়ে থেকে টুনি আবার বললো, সেইটা আবার কী ।
মন্তু বললো, নানারকম খেলা দেহায় ওরা। মানুষের খেলা, বাঘের খেলা। আর কত কী! বাঘের নাম শুনে ভয় পেয়ে গেলো টুনি। কিন্তু পরক্ষণেই বললো, আমারে দেহাইবা?
মন্তুর কোনো আপত্তি ছিলো না। কিন্তু হাটের মধ্যে মেয়ে মানুষ নিয়া যাওয়াটা সমীচীন মনে হল না ওর। তাই বললো, না, তোমার যাইয়া কাজ নাই। তুমি বহ, আমি আইতাছি। ওর চলে যাওয়ার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের বাইরে এলো টুনি।

বললো, ওমা, আমি একলা থাকবার পারমু না এহানে। তুমি যাইও না।
মুহূর্তে নিরাশ হয়ে গেলো মন্তু। ও নিজে এর আগে কোনোদিন সার্কাস দেখেনি। ভেবেছিলো এই সুযোগে একবার দেখে নেবে। কিন্তু টুনির কথায় ভেঙে পড়লো সে। সার্কাসের তাঁবুর দিকে চোখ পড়তেই দেখলো শুধু পুরুষ নয়, অসংখ্য মেয়েছেলেও দলে দলে এসে ঢুকছে তাঁবুর মধ্যে।
মন্তুকী যেন ভাবলো। ভেবে বললো, আহ, দেরি কইরো না, আহ।
ওর পিছু পিছু নিচে নেমে এলো টুনি। মাথার ঘোমটাটা সে এক হাত লম্বা করে দিয়েছে। আর সেই ঘোমটার ভেতর দিয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে।
তাঁবুর সামনে বড় বড় দুটো হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এক পাশে এক দল লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছে।
তাঁবুর দরজার উপরে একটা মাচায় চড়ে দুটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে। সারা গায়ে মুখে নানারকমের রঙ মেখেছে ওরা। টুনি অবাক হয়ে বললো, ওমা সরম করে না।
মন্তু বললো, সরম করবে ক্যান, ওরা ম্যাইয়া লোক না, পুরুষ মানুষ মাইয়্যা সাজছে।
অ। হা করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো টুনি।
দরজায় দাঁড়ান লোকটার কাছ থেকে তিন আনা দামের দুখানা টিকেট কাটলো মন্তু। ভেতরে ঢুকে দেখে ছেলে বুড়ো মেয়েতে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাঁবুর একটা কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়লো ওরা।
কিছুক্ষণের মধ্যে সার্কাস শুরু হয়ে গেলো।
প্রথমে একটা মেয়ে দুটো লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা একখানা দড়ির ওপর দিয়ে নির্বিকারভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে হেঁটে চলে গেলো।
দর্শকেরা হাতে তালি দিয়ে উঠলো জোরে।
তারপর আসলো বিকটাকার লোক। হাতের মুঠোর ওপরে তিনটে মানুষকে তুলে নিয়ে চরকির মতো ঘোরাতে লাগলো সে।
সবাই একসঙ্গে বাহবা দিয়ে উঠলো।
এরপরে খুব জোরে ব্যান্ড বাজালো কিছুক্ষণ।
তার পরেই এলো বাঘ। এসেই একটা হুঙ্কার ছাড়লো সে।
টুনির দুচোখে অপরিসীম বিস্ময়। ঘোমটার ফাঁকে একবার চারপাশের দর্শকের দিকে তাকালো সে। তাকালো মন্তুর দিকে। তারপর আবার চোখ ফিরিয়ে নিলো বাঘের ওপর।
সার্কাস শেষ হলে, দুজনের চমক ভাঙলো।
ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। ঘাটে যাবার পথে মনোয়ার হাজির চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে হয়। মন্তুকে দেখে হাজি দোকান থেকে চিৎকার করে উঠলো, আরে মন্তু মিয়া কই যাও, শুন শুন।
মন্তু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, পারলো না।
আরে মিয়া কাজের কথা আছে শুইনা যাও। দুহাতে ওকে কাছে ডাকলো মনোয়ার হাজি।
টুনি পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে গেলো মন্তু। কাউন্টারে আরো অনেকগুলো লোক কথা বলছিলো।
হঠাৎ মনোয়ার হাজি শব্দ করে হেসে উঠে বললো, বাহরে বাহ বিবিজানেরে সঙ্গে নিয়া সার্কাস দেখবার আইছ বুঝি?
সঙ্গে সঙ্গে আট জোড়া চোখ অদূরে দাঁড়ানো টুনির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো।
মন্তু কিছু বলবার আগেই, মনোয়ার হাজী সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, কহন করলা অ্যাঁ? একবার খবর দিলা না। দাওয়াত করলা না, এইডা কেমুন কথা?
হতবুদ্ধি মন্তু কী বলবে কিছু ভেবে পেলো না, সে শুধু ইতস্ততঃ করে একবার মনোয়ার হাজীর দিকে আরেকবার টুনির দিকে তাকালো বার কয়েক। এক বিচিত্র অনুভূতির আবেশে মনটা ভরে উঠেছে ওর। মনোয়ার হাজী শুধালো, কোনো কাজ কাম নাইতো?
এক ঢোক গিলে মন্তু বললো, কিছু চুড়ি কিনন লাগবো।
হ্যাঁ, তা কিনবা না, নিশ্চয় কিনবা। একগাল হাসলো মনোয়ার হাজী। তারপর বললো, এহন চলো মিয়া ভাবীরে নিয়া আজকা রাতে আমাগো বাড়ি মেহমান অইবা।

মন্তু পরক্ষণে বাঁধা দিলো, না না তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরন লাগবো। ওর কথাটা কানে নিলো না মনোয়ার হাজী। সে জানালো, থাকার কোনো অসুবিধে হবে না ওদের। বাড়িতে ঘর আছে অনেকগুলো, তারই একটিতে সুন্দর করে বিছানা পেতে দেবে। তাতে যদি মন্তুর আপত্তি থাকে তাহলে, আরো একটা ভালো বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মনোয়ার হাজী। সার্কাস পার্টির ওখানে হোটেল উঠেছে কয়েকটা। এক একটা ঘর এক টাকায় এক রাতের জন্য ভাড়া দেয় ওরা। সেখানেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারে মন্তু। পান-খাওয়া দাঁতগুলো বের করে মনোয়ার হাজী বললো, আরে মিয়া, নতুন বউ নিয়া যদি একটু ফুর্তি না কইরলা তাইলে চলে কেমন কইরা। এইতো বয়স তোমাগো।

এই শীতেও ঘেমে উঠেছে মন্তু। টুনির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো, ও ভীষণ বিব্রত বোধ করছে।

ক্ষণকাল পরে মন্তু বললো, আরেকদিন আইসা আপনাগো বাড়ি মেহমান হমু। আইজকা যাই।

ওর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার জন্যে কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করলো মনোয়ার হাজি। অবশেষে বললো, আরেকদিন কিন্তুক আইবা মিয়া। বলতে বলতে টুনির দিকে তাকালো হাজী।

জোয়ার পড়ে যাওয়ায়, ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। যেখানে নৌকোটা বেঁধে রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে ওটা। মাঝখানের জায়গাটা পানি আর কাদায় ভীষণ পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। ওর ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে অতি সাবধানে আঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে মাটি চেপে রাখতে হয়। নইলে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিচে নামতে গিয়ে অন্ধকারে মন্তুর ফতুয়াটার একটি কোণ শক্ত করে ধরে রেখেছে টুনি। একটু অসতর্ক হতে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলো সে। মন্তু ধরে ফেললো। মাথার আঁচলটা কাঁধের উপরে গড়িয়ে পড়লো, একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করলো টুনি। কাঁধের উপর থেকে ওর মুখখানা সরিয়ে দিতে গিয়ে মন্তু সহসা অনুভব করলো, টুনির দুচোখ দিয়ে পানি ঝরছে। নিঃশব্দে কাঁদছে টুনি।

ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে দিয়ে নীরবে বসে রইলো মন্তু। মনটা আজ ভীষণ ভেঙে পড়েছে ওর। সারা দেহে আশ্চর্য এক অবসাদ। সেদিন রাতে রসের কলসিটা ভেঙে ফেললো টুনি, তখনও এত খারাপ লাগেনি ওর। আজ কেমন ব্যথা অনুভব করছে সে। বুকের নিচটায়। কলজের মধ্যে।

নৌকোর ছইয়ের ভেতরে চুপচাপ বসে রয়েছে টুনি। একটা কথা বলছে না সে, একটু হাসছে না।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গান ধরলো মন্তু।

> বন্ধুরে আশা ছিলো মনে মনে প্রেম করিমু তোমার সনে।
> তোমারে নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।
> ও পরাণের বন্ধুয়ারে॥

নদীর স্রোত নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। যেন বহুদিনের এই স্নেহের টানকে চিরন্তন করে ধরে রাখার জন্যে প্রাণহীন কাঠের টুকরোগুলোকে গভীর আবেগে বারবার জড়িয়ে ধরতে চাইছে ওরা। টুনি এখনো নীরব।

খালের মুখের কাছে নৌকো থামাতে হল।

ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। পাতা পানিতে নৌকো নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখানে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসে। জোয়ারের স্রোতে নৌকা নিয়ে ভেতরে চলে যাবে মন্তু। কিন্তু সে এখনো অনেক দেরি। ভোর রাতের আগে জোয়ার আসবে না।

নৌকো থামাতে দেখে টুনি এতক্ষণে কথা বললো, কী, নাও থামাইলা ক্যান?

হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা কথা বলে বসলো মন্তু। বললো, বাড়ি যামু না। এইহানে থাকুম আমরা।

ক্যান? ক্যান? টুনির কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো মন্তু। ওর হাসিটা কাটা বাঁশের বাঁশির মতো শোনালো। নৌকো থেকে নোঙরটা নিয়ে নিচে নেমে গেলো মন্তু। ভালো করে মাটিতে পাতলো ওটা। নইলে জোয়ারের প্রথম ধাক্কায় মাঝ নদীতে যাওয়ার ভয় আছে। তারপর পা জোড়া ধুয়ে নিয়ে নৌকায় উঠতে উঠতে টুনির প্রশ্নের উত্তর দিলো মন্তু।

জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে ওদের।

এইহানে? বলতে গিয়ে চারপাশে তাকালো টুনি।

আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। দক্ষিণে যতদূর তাকানো যায় অথই পানির ঢেউ। নদী এখানে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। কয়েকটি জেলে নৌকো মাঝ নদীতে টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে জলে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই-কুই।

পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোনো লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার উপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পূবে, ফেলে আসা নদী এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।
উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরি লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেলো টুনি।
ও মাঝি। মাঝি- ও কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকলো, কোন হানের নাও, অ্যাঁ?
গলায় চড়িয়ে মন্তু জবাব দিলো, পরির দীঘি।
জবাব শুনে চুপ করে গেলো জেলেটা।
এতক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিলো বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারেনি মন্তু। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকলো সে।
টুনি নড়েচড়ে এক পাশে সরে গেলো।
ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিলো মন্তু। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগলো। দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।
আকাশে মেঘ।
মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার লুকাচ্ছে তাড়াতাড়ি।
টুনি ডাকলো, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।
মন্তু কোনো জবাব দিলো না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগলো সে।
টুনি আবার ডাকলো, আহ না, বাইরে ঠাণ্ডা লাগবো।
মন্তু নীরব।
আইবা না? টুনির কণ্ঠে অভিমান।
বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিলো টুনি। চল, ভেতরে গিয়া শুইবা। এবার আর কোনো বাধা দিলো না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়া শুয়ে পড়লো সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইলো টুনি।
বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইলো।
ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছলো ওরা।
মন্তু আর টুনি।
পরির দীঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।
দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠলো তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কে মরলো?
ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিলো কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিলো ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেরা করতে পারতো না। মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হতো।
দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিলো। প্রায়ই রক্তবমি করত। বুড়োরা বলত, শত্রুপক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।
তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।
মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো মন্তুর।
হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ইতস্ততঃ করে মন্তু বললো, কান্দ ক্যান, কাইন্দা কী অইবে।
বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলো একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন।
দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান? অ্যাঁ।
মন্তু খুলে বললো সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কী করতে পারে সে? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার ভাঁটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত

হল। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ি উপরের ক্ষেতটার দিকে চলে গেলো, সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেলো মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অপলক– পলকহীনভাবে। **অবসাদ**– ক্লান্তি; দুর্বলতা। **একছিলিম**– এক টিপ। **ছই**– নৌকার ওপরে দেয়া অর্ধগোলাকার চাল বিশেষ। **পুঁটুলি**– বোঁচকা। **মাইজ রাত**– মধ্যরাতে শব্দটির আঞ্চলিক রূপ। **জিরাও**– বিশ্রাম নাও। **ক্ষেমতোঁ**– ক্ষমতা বা শক্তি। **দম ধরেছে**– নিশ্চল বা স্রোতহীন হয়ে পড়েছে। **সমীচীন**– উচিত। **নিরাশ**– আশাহীন। **বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে**– আশ্চর্য ও মুগ্ধতা মেশানো দৃষ্টিতে। **হ্যাজাক**– উজ্জ্বল আলোর বাতি। **সরম**– লজ্জা। **বিকটাকার**– অদ্ভুত আকার বিশিষ্ট। **চিরন্তন**– চিরকালের বা চির দিনের। **পাতা পানি**– সামান্য পানি; পায়ের পাতা ডোবে এতোটুকু পরিমাণ পানি। **জনবসতি**– লোকজনের বসবাস। **লোকালয়**– জনপদ বা বসতি। **বিস্তীর্ণ**– দীর্ঘ। **নিস্তব্ধ নিঝুম**– কোনো প্রকার সাড়াশব্দহীন। **প্রান্তর**– বড় মাঠ। **পিলে**– এক ধরনের রোগ; টিউমার। **গভীর অসন্তোষ**– খুব মনঃক্ষুণ্ন; প্রবল বিরক্তি।

সারসংক্ষেপ :

পরদিন ভোরে মন্তু আর টুনি রওনা দিলো। শান্তির হাটে নৌকা রেখে তারা সার্কাস দেখতে গেলো। যদিও টুনিকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস দেখতে মন্তুর কেমন লজ্জা লাগছিলো। মন্তুর এই লজ্জা শতগুণ বেড়ে যায় সার্কাস দেখে ফেরার সময় মনোয়ার হাজি টুনিকে যখন তার স্ত্রী বলে মনে করে। সে ঘাটে ফিরে এসে দেখে, ভাটার পানি অনেক নিচে নেমে গেছে। কাদার মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে মন্তুর ফতুয়া ধরে টুনি এগোতে থাকে। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যেতে যেতে টুনি মন্তুকে জাপটে ধরে নিজেকে সামলে নেয়। আর মন্তু বুঝতে পারে টুনি নিঃশব্দে কাঁদছে। ভোরের দিকে গ্রামে পৌঁছল টুনি আর মন্তু। গ্রামে ঢুকেই পরির দীঘির পারে তিনটে নতুন কবর দেখলো তারা। তার মধ্যে একটা আবুলের বৌ হালিমার। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ করেই তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে সে। হালিমার মৃত্যু সংবাদ শুনে টুনি কাঁদল। বাড়ি ফিরে পড়লো মকবুলের অসন্তোষের মুখে। দুদিনের জায়গায় নবীনগর থেকে ফিরতে মন্তুর চারদিন লেগেছে, এজন্য মকবুল বিরক্ত। পরে অবশ্য নদীর জোয়ার-ভাটা আর আত্মীয় বাড়ির অনুরোধের কথা শুনে মকবুল শান্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১.'বন্ধুরে আশা ছিল মনে মনে' গানটি কে গেয়েছিল?

ক. করিম শেখ   খ. মনোয়ার হাজি   গ. সুরত আলী   ঘ. মন্তু মিয়া

২২. জোয়ারের সময় নৌকা চালানো যায় না যে কারণে–

ক. উজানে নৌকা বাওয়া কষ্টকর   খ. নদীতে বড় বড় ঢেউ থাকে

গ. উজানে নৌকা বাওয়া মাঝিদের ট্যাবু   ঘ. জলের চাপে নৌকা ডুবে যায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দিদি দুর্গার পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোওয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা হাতের পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল–লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল–আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে- আবার কোনোদিন আম দেবো খেও-ছাই দেবো।

২৩. উদ্দীপকের দূর্গা ও অপু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে?

ক. মন্তু ও টুনি   খ. মকবুল ও আমেনা   গ. আবুল ও হালিমা   ঘ. করিম শেখ ও আম্বিয়া

২৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ –

i. চপলতায়   ii. অভিমানে   iii. ঘৃণায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. ii ও iii

পাঠ-৭

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হীরনের বিয়ের সময়কার আনন্দঘন পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামে যে সব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান হয় তার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ওলাওঠা নিয়ে মকবুলের বাড়িতে সৃষ্ট আতঙ্কের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এলো।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোনো কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আট টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।

মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এলো আমেনা। বরপক্ষের লোক মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়তো বদনাম করবে ওরা, তাই।

বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে-শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার উপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভূঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।

আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।

পুরো উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে ওরা।

টুনি পুকুর ঘাটে বাসনপত্রগুলো মাজছে।

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।

দুপুর রাতে পাড়াপড়শীরা অনেকে এলো। কাচ্চাবাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে, উঠোনে বসলো ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে করে গান ধরলো–

মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যার সাজে।

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধ্যা থেকে ঢেঁকির উপরে উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিলো। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরলো।

ভাঁটুইরে না দিয়ো কলা
ভাঁটুইর হইবে লম্বা গলা।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কন পঞ্চ রঙের ভাঁটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোরে হুঁকো টানছে আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।

হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।

সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিন্তি ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো সালেহা।

মকবুল বললো, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো। আঁচল দুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।

আবের পাঙ্ক্ষা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এলো।

আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌঁড়ে এলো ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ করে ফকিরের মা গান গাইলো।

কেমন তোমার মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।
এত বড় মাইয়া অইছ না করাইছে বিয়া।

ওর গানটা শেষ না হতেই আম্বিয়া নেচে উঠে গানের সুরে জবাব দিলো।

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।
তোমার মতো কাঞ্চন পাইলে এখন করি বিয়া।

দূর পোড়া কপাইলা, দূর দূর করে তাকে তাড়া করলো ফকিরের মা।

দৌঁড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিলো আম্বিয়া। সালেহা হেসে বললো, কিরে আম্বিয়া, এত ঘর থাকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।

মন্তু তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানী তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বললো, কী মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।

মন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সবাই।

তীব্র গলায় সে বললো, কী অইতাছে অ্যাঁ? কী অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কী শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ?

সহসা সবাই চুপ করে গেলো। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।

মন্তু নির্বাক।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলো। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছ্বল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড় বিড় করে বললো, এমন কী কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু? সালেহা বললো, আমরা না অয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটু খানি ঠাট্টা মস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে ঝড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো টুনি। কী কইলা অ্যাঁ, কী কইলা অ্যাঁ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বললো, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচালো সে।

পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসলো টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো সালেহা। মনে হল এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এলো অনেকে।

মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠলো, কিরে কী অইলো অ্যাঁ। কী অইলো।

রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এলো সেখানে।

রশীদ বললে, কী কান্দবি না কইবি কিছু, কী অইছে? সালেহা কোনো জবাব দিলো না।

ফকিরের মা বুঝিয়ে বললো সব।

সালেহার কোনো দোষ নেই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিলো ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।

মাইরছে। মাইরছে ক্যান? রশীদ ক্ষেপে উঠলো।

ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিলো সালেহা।

বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করলো। ইতস্তত করে বললো, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে? মন্তুকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেলো। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেলো না সেখানে। এই গন্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।
ফকিরের মা বললো, ওগো কোনো দোষ নাই।
কী ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। আস্তে করে বললো, তোমরা হৈ-চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এইসব ভালা না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেলো সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বললো, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও। ছেলে-বুড়োরা আবার হৈচৈ করে উঠলো।
ফকিরের মা আবার গান ধরলো।
এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেলো আমেনা। বললো, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এলো আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করলো।

কেমন ওরে মাও বাপরে, কেমন ওরে হিয়া।
এত বড় ডাঙ্গর অইছ না করাইছে বিয়া॥

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে বে বে করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে উঠেছে ওর।
ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমালো না।
তারপর একজন দুজন করে যে যার ঘরে চলে যেতে লাগলো। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিলো টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকলো সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।
বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বললো, দেহি তোমার হাত দেহি।
মন্তু বললো, ক্যান?
টুনি বললো, তোমারে মেহেদি দিমু।
মন্তু বললো, না।
টুনি বললো, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিলো সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগলো টুনি। মন্তু কোনো বাধা দিলো না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসল। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?
কী?
একডা বিয়া কর।
হুঁ।
দুজনে আবার চুপ করে গেলো ওরা।
ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বললো, আরেকডা কথা রাইখবা?
কী?
আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।
হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, কথা দিলো? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকালো টুনি। মন্তু কী বলবে ভেবে পেল না। বার কয়েক ঢোক গিলল সে।
তারপর হঠাৎ করে বললো, শাপলা তুলতে যাইবা?
মৃদু হেসে মাথা নাড়লো টুনি। না।
তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।
টুনি আরো জোরে মাথা নাড়লো, না।
না ক্যান? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।
টুনি হেসে বললো, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে ওঠে দাঁড়ালো সে। মন্তুকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেলো টুনি।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হল। ছেলে-বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায় বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মন্তুরও শরীরটা ভালো নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইস। তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি কেউ, তাই।

মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো।

আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই।

একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দুবার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কী অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনে।

কথাটা কানে নেয়নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ঔষধ নিয়ে আসার জন্য।

উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে দিলো মন্তু। বললো, কোবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমতো খাইতে।

টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, কী অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকালো টুনি, কেউ শুনলো নাকি দেখলো। মন্তু কোনো জবাব দিলো না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেলো সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসলো টুনি।

অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধালো, খাইবা?

বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বললো, না। তারপর একমনে হুকো টানতে লাগলো সে।

টুনি বললো, কোবিরাজ কী কইছে?

একরাশ ধুঁয়া ছেড়ে মন্তু জবাব দিল, কইছে, কিছু না, ভালো অইয়া যাইবো।

ভালো অইয়া যাইবো? চোখজোড়া কপালে তুললো টুনি।

নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারল টুনি।

সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনোহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।

পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেলো কুকুরটা।

চৈত্র মাসের রোদে পুরো মাঠটা খা খা করছে।

যেদিকে তাকানো যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে।

নদী-নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমতো পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোতে পানিও অনেক কমে আসে।

গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগীর ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে তাই। পথে বামুন বাড়ির হাট থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।

ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এলো মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো সুরত! সুরত! ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।

মন্তু গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।
আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী ভাই সাব, কী অইছে?
টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এলো বাইরে।
মকবুল বললো, সুরত, রশীদ ওরা কই?
আমেনা বললো, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।
ওর জ্বর হইছে ভীষণ।
জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বললো, বাপু তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো! ও বিন্তির মা, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো।
গেরামে ওলা বিবি আইছে।
ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও! আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠলো।
গনু মোল্লা ওজু করছিলো, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি? কোন্ বাড়িতে আইছে?
মকবুল বললো মাঝি-বাড়ি।
মাঝি-বাড়ি? একসঙ্গে বলে উঠলো সবাই। কয়জন পড়ছে?
তিনজন।
তিনজন কে কে সে কথা বলতে পারবে না মকবুল। পথে আসার সময় ও-বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে। বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্ত সাবধান করে দিলো বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কলে একডু সাবধানে থাইকো বাপু। একডু দোয়া দরুদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেলো সে।
ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনছিলো সব, এবার বিড়বিড় করে বললো বড় খারাপ দিনকাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডার এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করলো সে।
টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এলো ওর দিকে, বুড়ি যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্‌গির থাম।
ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেলো। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।
ইতোমধ্যে মন্তু আর সুরত ফিরে এসেছে।
কাঁধের উপর থেকে কুড়োলটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেলো ওকে।
মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো?
মন্তু ঘাড় নাড়লো, না ক্যান কি অইছে?
টুনি বললো, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেলো ওর।
মন্তুর দুচোখে বিস্ময়। বললো কার কাছ থাইকা শুনছ?
ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বললো, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও। যাইও না কিন্তু?
মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়লো কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলো না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকোটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনেনি সে।
আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিলো, সেও কিছু বলেনি।
উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবলো মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেয়ার জন্যে সেই ঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়লো সে।
দীঘির পাড়ে মন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করলো, কী মিয়া খবর সব ভালো তো? মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়লো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কই যাও শ্বশুরবাড়ি বুঝি?
হুঁ, তোরাব শ্বশুর বাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারেনি, খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।

পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরালো সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছা করছিলো না ওর। তবু নিতে হল। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামলো তোরাব। জুতোজোড়া বগল থেকে নামিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেলো সে।

বললো, একটুখানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরানি।

হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার উপরে উঠে এলো তোরাব।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বললো, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাহি সক্কলে ভালো আছে তো?

মন্তু বললো, ভালো তো আছিলো, কিন্তুক একটু আগে শুনছি, ওলা লাগছে।

ওলা? তোরাব যেন আঁতকে উঠলো। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধালো, কার কার লাগছে?

মন্তু বললো, কী জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হুঁ। হঠাৎ থেমে গেলো তোরাব। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বললো, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোনো মানি অয় না মিয়া, যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়ালো সে। আস্তে করে বললো, আমি যে আইছলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিলো সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চললো তোরাব। হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আব– পানি। **কার্পণ্য**– কৃপণতা। **কুর্তা**– ছেলেদের ছোট জামা। **কেলেঙ্কারি বাধাইবো**– সকলে বদনাম করবে। **ঘনিয়ে এল**– কাছাকাছি এসে পড়ল। **পেয়ালা**– বাটি। **বরতন**– থালা। **গড়**– বড় মাঠ। **খিল দিল**– কপাট বন্ধ করল। **চিবুক**– কপোল। **পাকা লঙ্কা**– লাল মরিচ। **পরক্ষণে**– পর মুহূর্তে। **ঠাট্টা মস্করা**– হাসি ঠাট্টা। **ঘটনার আকস্মিকতা**– হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ঘোর। **জনশূন্য**– লোকজন নেই এমন। **দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি**– ঘুমুতে পারেনি। **মরাকান্না**– বাড়িতে কেউ মারা গেলে লোকেরা যেমন কাঁদে তেমন কান্না। **ফাঁল**–চির; ছিদ্র। **মাথা খাও**– শপথ বিশেষ; মাথার দিব্যি। **সাত-পাঁচ**– বিবিধ; নানা রকম। **প্রসন্ন**– সন্তুষ্ট; নির্মল। **হ্যাঁচকা টানে**– সজোরে টান দেয়া।

সারসংক্ষেপ :

হীরনের বিয়েকে কেন্দ্র করে বাড়িতে সাজসাজ রব পড়ে গেছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে; মকবুল তাই কোনো কৃপণতা করেনি। আয়োজনের কোনো কমতি রাখেনি। মেহেদির আসরে হঠাৎই বৃদ্ধা ফকিরের মাকে নাচতে দেখে সবাই খুব আনন্দিত হল। এমন সময় সেখানে আম্বিয়া আসায় তাকেও ফকিরের মা আসরের মাঝখানে টেনে নিয়ে নাচতে লাগলো। লজ্জা পেয়ে আম্বিয়া ফকিরের মার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে মন্তুর ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিলো। টুনি ক্ষেপে গিয়ে সালেহার চুল ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিয়ে কিল ঘুষি মেরে সেখান থেকে চলে যায়। টুনির এই অদ্ভুত আচরণে বাড়ির সবাই অবাক হয়ে যায়। মকবুল টুনির এই আচরণের যথাযথ শাস্তির বিধান করবে এই আশ্বাস দিলে আবার সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। ভোরের দিকে মন্তু যখন ঘুমুতে যাচ্ছিল তখন টুনি আসে তার কাছে। মন্তুর হাতে মেহেদি পরিয়ে দেয়। তাকে একটা বিয়ে করতে অনুরোধ করে। সঙ্গে একথাও বলে যেন মন্তু টুনির পছন্দে বিয়ে করে। মন্তু টুনির কথায় সায় দেয়। টুনিকে শাপলা তুলতে যেতে বলে, মাছ ধরতে যেতে বলে। কিন্তু টুনি কোথাও যেতে রাজি হয় না। এদিকে চৈত্র মাস এসে গেলো। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই। এমনি একদিন মকবুল নতুন বেয়াই বাড়িতে বেড়াতে গেলো। ভর সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরে এলো একটা আতঙ্কের খবর সঙ্গে নিয়ে। ওলাবিবি আক্রমণ করেছে। ওলাওঠার সংবাদে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. বিয়াই বাড়িতে মকবুল কি নিয়ে গিয়েছিল?

ক. কলা　　খ. দুধ

গ. ডিম　　ঘ. আলু

২৬. টুনির অসংযত আচরণ বুড়ো মকবুল যেভাবে সামাল দিয়েছিল–

ক. টুনির দোষ অস্বীকার করে
খ. টুনির দোষ স্বীকার করে
গ. টুনির বিচারের আশ্বাস দিয়ে
ঘ. টুনিকে শাসন করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

২৭. উদ্দীপকের রামসুন্দর 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. সুরত আলী
খ. বুড়ো মকবুল
গ. কদম শেখ
ঘ. গনু মোল্লা

২৮. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. ধর্মীয় বিধিনিষেধ
ii. ঋণমুক্ত হওয়া
iii. সন্তান বাৎসল্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও iii

পাঠ–৮

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ওলা ওঠা রোগে সমস্ত গ্রাম কীভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো তা বলতে পারবেন;
- ওলা বিবিকে নিয়ে প্রচলিত একটি লৌকিক উপাখ্যান বিবৃত করতে পারবেন;
- মকবুল কেন আম্বিয়াকে বিয়ে করতে চাইলো তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মাঝি-বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এলো সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেলো। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো মন্তুর। মাঝির বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো ওর। নন্তু শেখ মারা গেলো। হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে। দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলো মন্তু।

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো। এই কী মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলো মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোট ভাই জমির শেখ কোবিরাজ আনতে গেছে দুক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসেনি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা নাই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দুগণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এলো ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখলো, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মন্তু।

পরির দীঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে ছমির শেখ। কথা ছিলো একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটো খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কোবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায়ই একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেলো মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলতো, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আটটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্থানে কার কোনটা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে, সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিংবা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সাবইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলতো, চিনবার পার এরে? না না তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি, এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি। এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিলো বটে একটি। যেনো টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাতো নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে দেখতো ওটা, আহা কী মাইয়া কী অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এখন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলতো, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিলো অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা এ পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা। সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এলো মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দীঘির পাড়ে কাটিয়ে দিলো সে। ওর মায়ের কবরটা দেখলো। এককালে বেশ উঁচু ছিলো ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দুএকখানা হাড় হয়তো আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল ওর। মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকালো মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বললো, ঘরে যাইবা চল। কোনো কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়ালো মন্তু। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরলো না সে।

বললো, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো, কই যাইবা?

মন্তু বললো, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরির দীঘির পাড় থেকে নেমে এলো সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেলো গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কী যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনোদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বললো, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বললো, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এত বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লাহ মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করলো, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেলো আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি ওরা ছিলো তিন বোন। তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেতো একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুতো না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলো তখন হঠাৎ হজরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ওদের। রঙ্গীন শাড়ি পরে বেরুলে কী হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন এরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাণ্ড কইরা

বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেলো ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত।

হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেলো। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই নাই, মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ?

গনু মোল্লা বললো, আক্কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বললো, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার সে বললো, বাপু গেলেই কী অইবো আর না গেলেই কী অইবো। যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারবো না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন জানালো টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানালো, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বললো, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকালো সে।

মকবুল জানালো, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।

হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিলো। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।

সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। হ্যাঁ তাই করবে।

রাতে ঘুম হল না মন্তুর।

সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করলো সে। না, একটা বিয়ে ওকে এবার করতেই হবে। এমনি একা জীবন আর কতদিন কাটাবে মন্তু। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানিং টুনি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। শান্তির হাটের সেই রাত্রির পর থেকে টুনি তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বসে আছে।

গ্রামেত কত লোক তাদের বউকে তালাক দেয়। বুড়ো মকবুল কেন তালাক দেয় না টুনিকে? হঠাৎ পরিবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো মন্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।

ঘর নাই বাড়ি নাই দেখিতে জবর।
পরিবানুর আসিক লইল তাহারি উপর।

কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্তের বউ পরিবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হতো না। অষ্টপ্রহর ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকতো। ঘর ছেড়ে পুকুর পারে গিয়ে নীরবে বসে থাকতো সে। আর সেখান থেকে দেখতো একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাতো সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেলো।

তারপর।

তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।
দুইজনে পালায়া গেলো চোখে ধুলা দিয়া।

মন্তুরও তাই মনে হল। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোন গ্রামে কিম্বা শহরে। না। শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তা হলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোনো দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবে সে। এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করলো, নন্তু শেখের বাড়ির কোনো খবর জান?

না।

ওমা জান না? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।

মন্তু কোনো কথা বললো না।

আমেনা বলে চললো, কবিরাজে কিছু কইরবার পারলো না। তাই ও গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।

মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেলো।

অবশেষে আরও আট দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।

ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক পরে বৃষ্টি এলো জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এলো অবিরাম বর্ষণ।

সারা রাত মেঘ গর্জন করলো। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হল।

আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিকে নিবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালির পয়সাটাও জুটাতে হবে তাকে।

ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়লো মাঠে।

আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।

পুরুষেরা কেউ বাড়ি নাই।

পুরো মাঠ জুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মতো শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।

হট হট হট, হুঁ উ উ।

বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।

এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলতো তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকতো মাটিতে।

নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিতো সুরত। মই দিতো। ধান ফেলতো খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করতো।

ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।

আহা জমিডার কী অবস্থা কইরাছে দেখছস? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বললো, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।

মন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললো, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।

কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ।

বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো সুরত আলীর। রুগ্ন গরু দুইটাকে হট, হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বললো, জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমতো করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।

শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনোখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিতো সে। তখন সাত মণের জায়গায় আট মণ ধান বের করতো সে এ জমি থেকে।

আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিলো খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া? হিরর। হট। হট। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিলো সুরত আলী।

অদূরে রশীদ তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার ক্ষেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের ক্ষেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কী ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।

মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিলো, কী কও না।

ধান তো ফালাইয়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।

দাও, দাও ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।

আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিলো। ধান বেশি অইলেই-বা কি বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগব।
ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিলো ওকে।
সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে কোনো আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কী অইলো। হালার নবাবের ব্যাটা। হট, হট, হুঁ উ উ।
মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।

আশা ছিলো মনে মনে, প্রেম করিমু তোমার সনে
তোমায় নিয়া ঘর বাঁধিমু গহিন বালুর চরে।

হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিলো মন্তু।
ইতি, ইতি, ইতি, চল।
সুরত বললো, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা গাইয়া যা।
মন্তু বললো, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।
হ, হ দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই।
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিল সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।
ও খোদা,
আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন রোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশলো সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসলো সে। বললো, মন্তু মিয়া আহ, তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও ক্ষেত ছেড়ে উঠে এলো। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিলো সুরত। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ। সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।
রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকালো। কিছু বললো না।
ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।

সন্ধ্যে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনলো মন্তু। ওর বিয়ের কথা।
মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দিবে মন্তুকে। চাচা-চাচি এতদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।
চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।
পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আম্বিয়া।
নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর আম্বিয়া একা। বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট ক্ষেতটা আর সে নৌকোটার এখন মালিক সে।
ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।
রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিলো।
তাকে ডাকলো মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়াছে।
ওপর থেকে রশীদ বললো, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানি অইবো।
মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বললো, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলতো তাহলে তক্ষুণি রাজি হয়ে যেতো সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।

বুড়ো মকবুল বললো, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।
ফকিরের মা বললো, আপনেরা মুরুব্বি, আপনেরা ঠিক কইরা ফালান।
আমেনা বললো, ঠিক কথা কইছ চাচি।
মন্তু তখনও ভাবছে।
একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো ক্ষেত। দেখতেও সুন্দরী সে।
বুড়ো মকবুল বললো, তাইলে ওই কথাই রইলো। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।
মন্তু চুপ করে রইল, তারপর খুব আস্তে করে বললো ও আপনেরা যেইডা ভালা মনে করেন, করেন।
মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে। মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠলো সে। বললো, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখানা পালকি আনন লাগবো।
ফকিরের মা বললো, মাইয়া এমন কইরা হাসতাছে য্যান ওর বিয়ার কথা অইতাছে, দেহ না কারবার।
ওর দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে পরমুহূর্তে সেখান থেকে সরে গেলো টুনি।
বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বললো, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারি অইবো।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।
মকবুল রেগে উঠল। এই রাতেরবেলা এখন ঘুমোতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কী কথা বলতে চায় টুনি। রেগে বললো, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।
টুনি বললো, না অহনি লাগব।
বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো, আচ্ছা কও কী কথা।
চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বললো টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা ক্ষেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবেনি এর আগে। টুনি যা বললো, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়।
সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।
ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, চিন্তা কইরতাছ কী, চিন্তা করার কিছুই নাই।
এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল মকবুলের। মনে হল টুনির কাছে নেহায়েত একটা শিশু সে।
একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বললো, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজি না হয়?
টুনি বললো, রাজি অইবো না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।
মকবুল বললো, ওগো না অয় রাজি করন গেলো। কিন্তু আম্বিয়া?
মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।
টুনি বললো, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইব না ক্যান?
এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওরা। মকবুল বললো, বহ বউ। বহ।
টুনি বসলো ওর পাশে। দুজনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইলো ওরা। বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। সওদাগরের কিচ্ছা। একমনে হা করে শুনছে সবাই।
সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।
আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বললো বুড়ো মকবুল।
শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, এমন কী অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান।
ফাতেমা বললো, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি?
টুনি বললো, মাইনষের কথা হুইনা কী অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানালো। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হল না।
অবশেষে মকবুল রেগে গেলো, শাসিয়ে বললো, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অষ্ট প্রহর– আট প্রহর; দিনরাত সারাক্ষণ। **অবিরাম বর্ষণ**– একটানা বৃষ্টি। **অস্থি**– হাড়। **আল্লা মালুম**– আল্লাহ জানেন। **কিচ্ছা**– গল্প; অধিকাংশই রূপকথা বিষয়ক। **খপ কইরা**– হঠাৎ করে। **খেদমত**– সেবা; যত্ন; পরিচর্যা। **বিলাপ**– আক্ষেপপূর্ণ কথা। **জর্জর**– জীর্ণ; অত্যন্ত রুগ্ন। **দুক্রোশ**– চার মাইলের কিছু বেশি; এক ক্রোশ = ৮০০০ হাতের সমান অর্থাৎ দুই মাইলের কিছু বেশি। **বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না**– বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে আর কেউ বেঁচে থাকবে না। **ভেদবমি**– বিরামহীন বমি। **বনিবনা**– সদ্ভাব; মনের মিল। **বার বাড়ি**– বাড়ির বাইরের দিকের অংশ। **গ্রামান্তরে**– অন্য গ্রামে; একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। **ঠিকে নিবে**– ধার নেবে। **সরেস**– শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। **জমিন**– জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **ইনছাফ**– ন্যায় বিচার। **ধান তো ফালায়া দিলা**– ধান মাটিতে বুনে দিলাম এ অর্থে। **সান্ত্বনা**– আশ্বাস দিয়ে শান্ত করা; প্রবোধ। **গাজী কালু; সোনাভান**– পুঁথি সাহিত্যের বিখ্যাত সব চরিত্র। **ফয়সালা**– মীমাংসা; মিটিয়ে ফেলা। **চোখ পইড়াছে**– অনেকের নজর পড়েছে। **সম্বন্ধ**– বিয়ের প্রস্তাব অর্থে এখানে ব্যবহৃত। **নেহায়েত**– সামান্য। **গভীর অন্তরঙ্গতা**– খুব অন্তরঙ্গভাবে। **প্রতিবাদ**– আপত্তি। **শাসানো**– ভয় দেখানো।

সারসংক্ষেপ :

ওলা বিবির আক্রমণে কে কখন মারা যাবে তার কোনো ঠিক নেই। মাঝি বাড়ির নন্ত শেখ মারা গেলো। ওলা বিবি সম্পর্কে গ্রামের লোকদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে তার একটা পা খোঁড়া। সে মানুষ, কুকুর বা বেড়ালের চেহারা নিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়। সে জন্য মকবুল বাড়ির সবাইকে সতর্ক করে দিলো যাতে তারা পা খোঁড়া কাউকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে না দেয়। সেদিন রাতে মন্তুর ভালো ঘুম হল না। বারবার পরিবানুর পুঁথির কথা মনে পড়লো। আর ভাবলো টুনিকে নিয়ে যদি ঐ পুঁথির রাখাল ছেলের মতো দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারতো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খবর পেল, মাঝি বাড়ির করিম শেখও মারা গিয়েছে। অবশেষে আরো দশ দশটি প্রাণ হরণ করে তবে ওলা বিবি বিদায় হল গ্রাম থেকে। গ্রামের সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ দিলো প্রত্যেক বাড়িতে। মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ের প্রস্তাব দেয় মকবুল। টুনি কৌশলে মকবুলকে বোঝায়, মকবুল যদি নিজেই আম্বিয়াকে বিয়ে করে, তবে মন্তুর বদলে সম্পদের মালিক মকবুলও হতে পারে। মকবুল ঘোষণা করে, আম্বিয়াকে সে নিজেই বিয়ে করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. আম্বিয়ার সম্পদ ছিল কী কী?
- ক. জমি, নৌকা, বাড়ি
- খ. ফ্ল্যাট, লঞ্চ, প্লট
- গ. শেয়ার, প্লট, জমি
- ঘ. টাকা, জমি, লাঙ্গল

৩০. ওলাওঠার সংবাদ শুনে তোরাব পালিয়ে গেল যে কারণে–
- ক.শ্বশুর বাড়িতে সকলে অসুস্থ বলে
- খ. ওলাওঠায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে
- গ. মাঝি অর্থ চাইতে পারে মনে করে
- ঘ. শ্বশুরের রাগের কারণে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত, শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্ধ্বদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

৩১. উদ্দীপকের কাঙালী 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?
- ক. নন্ত শেখ
- খ. মন্তু মিয়া
- গ. কদম শেখ
- ঘ. ইদন মিয়া

৩২. উদ্দীপকটির ভাবার্থ নিচের যে বাক্যে বিদ্যমান–
- ক. তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেল আমেনা।
- খ. সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করল সে।
- গ. রাতে ঘুম হল না মন্তুর।
- ঘ. মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নই।

পাঠ-৯

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- কোন পরিপ্রেক্ষিতে মকবুল তার দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- অসুস্থ মকবুলের প্রতি টুনির সেবাপরায়ণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মন্তু ও আম্বিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

কথাটা চাপা থাকলো না।
পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেলো ব্যাপারটা।
মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।
কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।
মন্তু রীতিমতো অবাক হল।
সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললো, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কী?
ফকিরের মা বললো, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উচিত অয় নাই।
আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসা-হাসি কইরবো। আপনে উনারে বাধা দেন। আপনের কথা ওনি হুনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করলো গনু মোল্লা। বললো, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইবো।
শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজনে ক্ষেপে উঠলো। এইসব কী অ্যাঁ, বুড়ার কী ভীমরতি অইছে নাহি?
আবুল বললো, বুড়ো বয়সে এইসব কী পাগলামি শুরু অইছে।
কিছু বললো না শুধু মন্তু।
রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হল সবাই।
রশীদ এলো। আবুল এলো। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এলো।
এলো না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।
মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইলো।
সব কিছু সেও শুনেছে।
গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।
এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগলো বুড়ো মকবুল। টুনি বললো, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।
টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক।
বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।
এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিলো টুনি। বললো, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখন লাগে।
গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করলো না।
আবুল বললো, সুরতকে যেতে।
সুরত বললো, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বললো, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।
অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হল।
উঠোন থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে। মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এলো টুনি।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বললো, আপনারে যাইতে কয়, গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বললো, ক্যান, ক্যান, যাইতে কয়।

টুনি বললো, কী কথা আছে।

মকবুল বললো, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান? টুনি ওকে শান্ত করলো। বললো, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কী কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকালো বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়ালো সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলো সবাই।

কারো মুখে কথা নেই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার ওপরে বসলো। সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কী দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বললো, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসলো।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বললো, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারে কী অইছে। কথাটা বলে, মকবুলের দিকে তাকালো সে।

বুড়ো মকবুল কোনো জবাব দেবার আগেই টুনি বললো, মন্তু কইছে ও আম্বিয়াকে বিয়া করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পর মুখের দিকে তাকালো সবাই।

ফকিরের মা বললো, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেলো না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বললো, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে। আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠলো, হু তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকালো।

টুনি বললো, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠলো, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কী?

চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠলো মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, সরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বললো, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকালো সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।

যা কইছি ঠিক কইছি। আঙ্গুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসালো মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।

শুনছেন শুনছেন আপনেরা। কী কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেললো। গনু মোল্লা বললো, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোনো কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কী কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বললো, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বললো, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকালো মকবুল।

ফাতেমা বললো, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।

নিমকহারাম বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে একসঙ্গে তালাক দিয়ে দিলো সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা।
ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠলো।
পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আমেনা।
ফাতেমা মূর্ছা গেলো।
ফকিরের মা চিৎকার করে উঠলো, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কী কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কী কইরলি।
আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো মকবুলের কপাল লক্ষ করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআকেইল্যা কোনহানের।
দুহাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।
কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিলো।
মকবুলকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো টুনি।
ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলো সালেহা।
ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেললো।
উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলো মন্তু। সব দেখলো সে।
কিন্তু কাউকে কিছু বললো না। নীরবে পরির দীঘির দিকে চলে গেলো সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেলো ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেলো ওরা। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়ার মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেলো, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে, মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইলো, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।
ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিলো ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভালো ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।
মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দুএকবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলো। এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এলো ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কিনা দেখলো। তারপর আস্তে করে বললো, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালা অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরে বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।
এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেলো।
টুনির ওপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।
উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বললো। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা।
টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিলো না।

দিন কয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেলো, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া। তাছাড়া খুব শীঘ্রই আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।
কথাটা শুনলো বুড়ো মকবুল। শুনে কোনো ভাবান্তর হল না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। ইদানিং দিনরাত মকবুলের সেবা শুশ্রূষা করছে টুনি। সারাক্ষণ সে ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচ ক্ষেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়ালো টুনি। বললো, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কোবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিলো।

টুনি আবার বললো, আজকা না হয় মাঝি-বাড়ি না গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু কী জবাব দেবে ভেবে পেলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বললো, যাইবা না ক্যান, একশ বার যাইবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়ালো না টুনি। পরক্ষণে চলে গেলো সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মন্তু। তারপর বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে।

আম্বিয়া বলেছে, নৌকোটা ঠিক করে নেবার জন্যে। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিলো নৌকোটা নিজে বাইবে।

কিন্তু আম্বিয়া রাজি হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম। তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো আম্বিয়া।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিলো আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না। আম্বিয়া বললো, এত দেরি অইলো?

মন্তু বললো, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিলো তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আম্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কী যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি পড়ছে।

ক'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ওপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিলো এদিকে সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দুভাই মাছ ধরছিলো বসে বসে।

মন্তুকে দেখে বললো, কী মিয়া এত রাইতে কোন্ দিক থাইক্যা?

মাঝি-বাড়ি।

হুঁ। একটা পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বললো, চইল্যা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।

মন্তু যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে ছকু বললো, আরে মিয়া যাইবা আর কি বও। কথা আছে।

কী কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর করে মাটিতে বসলো মন্তু।

নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বললো, কী মন্তু মিয়া তুমি নাহি করিমনের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল সে। তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকালো মন্তু। কিছু বললো না।

মকু বললো, ভালো মাইয়ার উপর তোমার চোখ পইড়ছে মন্তু মিয়া। তোমার পছন্দের তারিফ করন লাগে। অমন মাইয়া এই দুই চাইর গেরামে নাই। আহা সারা গায়ে যেন যৈবন ঢল ঢল করতাছে।
কী মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারল ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত টাওয়াত কইরো।
করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে।
দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।
মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এলো।
উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে। মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে। এই যে রাত বিরাতে আম্বিয়ার সাথে মন্তুর এত অন্তরঙ্গ মেলামেশা এ শুধু সামাজিক অন্যায় নয়, অধর্মও বটে। তাই নিয়ে মসজিদে বিচার বসাবে আম্বিয়ার চাচা।
ফকিরের মা বললো, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।
সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ঠিক কইছ চাচি।
কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।
নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।
উঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো মন্তু।
সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকালো ওর দিকে।
টুনি কিছু বললো না। একটু নড়লো না। চুপচাপ রইলো।
মন্তু ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিলো।
কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।

অবশেষে মকবুল মারা গেলো।
ধলপহর হওয়ার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো সে।
সারা রাত কেউ ঘুমালো না।
গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি সবাই জেগে রইলো মাথার পাশে।
সন্ধ্যাবেলা ফকিরের মা বলছিলো লক্ষণ বড় ভালো না।
তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।
বহু লোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।
সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।
কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।
মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কোরান শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।
তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এলো বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হল।
একটু পরে মারা গেলো সে।
ওর বুকের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো টুনি।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সে।
তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরির দীঘির পাড়ে মিলিয়ে গেলো।
বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু।

পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হল তখন বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগলো টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করলো অনেকক্ষণ ধরে।

পরির দীঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হল বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট পুকুরে। আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়ে ছিলো। যার অস্তিত্ব ছিলো কি ছিলো না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদলো।

সারা বিকেল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করলো ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেলো না।

ফকিরের মা বললো কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।

তবু খেলো না টুনি।

মন্তু, সুরত আলী, আবুল, রশীদ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোর-গোড়ায় বসে। আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আযানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেলো গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়ালো।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।

পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বললো, কই যাইবা না মন্তু মিয়া?

মন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বললো, চলো।

বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো মন্তু।

টুনি ডাকলো, শোন।

মন্তু তাকিয়ে দেখলো এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ন। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মন্তু বললো, কী।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বললো, আমার একটা কথা রাইখবা?

মন্তু বললো, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো টুনি। তারপর আস্তে করে বললো, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।

বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।

মন্তু আস্তে করে বললো, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা?

টুনি মৃদু গলায় বললো, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো সে।

মন্তু বিব্রত বোধ করলো। কী বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেলো না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বললো, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরায়া যামু। থাকন আর গেলো না। এ কথার আর উত্তর দিলো না মন্তু। গাঁয়ের সবাই জানে, সামনের শীতে আম্বিয়াকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বললো, বিয়ার সময় আমারে নাইওর আনবা না?

নিস্তেজ গলায় মন্তু পরক্ষণে বললো, আনমু।

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। এক টুকরো ম্লান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বললো, কথা দিলা মনে থাহে যেন।
মন্তু বললো, থাকবো।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অলক্ষুইণা– অশুভ লক্ষণযুক্ত। **অবিরাম বর্ষণ**– একটানা বৃষ্টি। **অস্তিত্ব**– যা আছে এমন; সত্তা। **অশ্লীল মন্তব্য**– অশালীন বা খারাপ কথা। **আক্রোশ**– রাগ; ক্রোধ। **আর্তনাদ**– তীব্র চিৎকার। **এই জিন্দেগিতে**– এ জীবনে। **এঁটে দিল**– আটকে দিল। **কড়ি-কাঠ**– ঘরের চাল ধরে রাখার জন্য লোহা বা কাঠের আড়াআড়ি দেয়া কাঠ। **খানাপিনা**– খাবার দাবার। **ওনারে**– তাঁকে, এখানে মকবুলকে। **ক্ষেপে উঠল**– ভীষণ রেগে গেল। **ভীমরতি**– বয়সের কারণে বুদ্ধি লোপ বা কমে যাওয়া। **সম্পত্তি**– সম্পদ; টাকা-পয়সা; জমি ইত্যাদি। **নামাজের চৌকি**– নামাজ পড়বার জন্য ছোট আকারের চৌকি। **সরম**– লজ্জা। **শাসাল**– সতর্ক বা সাবধান করল। **নিমকহারাম**– যে উপকারী উপকার স্বীকার করে না বা ক্ষতি করে। **বাইরইয়া যা**– বের হয়ে যায়। **মূর্ছা**– জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। **বেআকেইল্যা**– বুদ্ধিহীন। **ফিনকি**– খুব বেগে বের হয়ে আসা। **নরক**– দোজখ। **সচকিত**– ভয়ে চমকে বা কাঁপিয়ে দেয়া। **নির্বিকার**– বিকারহীন, ভাবলেশহীন। **ঠিকে নিবে**– ধার নেবে। **সরেস**– শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; উত্তম। **জমিন**– জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **শীঘ্রি**– তাড়াতাড়ি। **ইদানীং**– সম্প্রতি; বর্তমানে; আজকাল। **সেবা-শুশ্রূষা**– আদর যত্ন। **তদারক করে**– দেখাশুনা করে। **পাঁচরকম**– নানা রকম। **নির্লিপ্ত**– উদাসীন। **হক চকিয়ে**– হতভম্ব হয়ে। **সলজ্জ হাসি**– লজ্জা মাখানো হাসি। **ইলশে গুঁড়ি**– গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। **নিঝুম রাত**– গভীর রাত। **শ্লথ**– ধীর। **প্রলাপ**– বিলাপ; অর্থহীন কথাবার্তা। **উতলা**– অস্থির। **দাওয়ায়**– বারান্দায়। **ছলছল**– চোখে জলপূর্ণ হয়ে থাকা; কাঁদো কাঁদো অবস্থায় চোখের পাতা পানিতে ভিজে আসা।

সারসংক্ষেপ :

আম্বিয়ার সঙ্গে মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে মকবুল পাত্র হিসেবে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে – এ-কথাটা বাড়িতে আর চাপা থাকলো না। কিন্তু বাধ সাধে আবুল, বাড়ির অন্য সবাই, বিশেষ করে ফাতেমা আর আমেনা। আম্বিয়ার সঙ্গে আবুলের বিয়ে দিতে মকবুল রাজি হয় না। কারণ এর মধ্যেই সে তিন তিনটে বউকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। এক পর্যায়ে ফাতেমা আর আমেনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মকবুল তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ আবুল তার বসার পিঁড়িটা মকবুলের কপাল লক্ষ করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। পিঁড়ির আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে মকবুলের কপাল থেকে। এসব কিছুই মন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে সবার অলক্ষে বেরিয়ে যায় পরির দীঘির পাড়ে। পরদিন আমেনা আর ফাতেমার বাপের বাড়ির লোকজন এসে তাদেরকে নিয়ে যায়। বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করতে আম্বিয়া রাজি হয়নি। বাড়ির সকল কাজকর্ম সামাল দিয়ে টুনি যারপরনাই আন্তরিকতার সঙ্গে মকবুলের সেবাযত্ন করে। এদিকে মন্তু সকলকে উপেক্ষা করে মাঝি বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলো। আম্বিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর হতে থাকলো এই যাতায়াতের মধ্য দিয়ে। অসুস্থতায় ধুঁকে ধুঁকে মকবুল একরাতে মারা যায়। কয়েকদিন পর টুনি মন্তুকে কাছে পেয়ে তাকে সময় করে বাপের বাড়ি রেখে আসতে বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. আবুল কতজন স্ত্রীকে কবরে পাঠিয়েছে?
- ক. দুজন
- খ. তিনজন
- গ. চারজন
- ঘ. একজন

৩৪. মকবুল বুড়োর কবর দেখে টুনির যে প্রতিক্রিয়া হয়–
- ক. প্রতিহিংসা জেগেছিল
- খ. আনন্দ হয়েছিল
- গ. বুক কেঁপে উঠেছিল
- ঘ. অনুশোচনা হয়েছিল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অপরাজিতা অগ্রসর হয়ে স্বামীর নিকট আসল। জীবনে যে স্বামীকে সে ভালোবাসা দেয়নি, অশন-বসন দেয়নি, কোনো খোঁজখবর করেনি, মরণকালে তাকে সে শুধু একটু দেখা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

৩৫. উদ্দীপকের অপরাজিতা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. টুনি
খ. সখিনা
গ. আম্বিয়া
ঘ. হালিমা

৩৬. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

i. অনুশোচনায়
ii. আত্মতৃপ্তিতে
iii. অনুভূতিহীনতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. ii ও iii

পাঠ-১০

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- টুনি ও মন্তুর জীবনের পরিণতির কথা বলতে পারবেন;
- ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিলো টুনি।
সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলো সে।

পরির দীঘির পাড়ের উপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়লো। শুকনো মাটির সাদা ঢেলাগুলো ঢিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কী এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।

ভাটার স্রোতে নৌকো ভাসিয়ে দিলো মন্তু।

সেই নৌকো।

যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলো সে। দুধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথই জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী-নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকো চালানোর প্রয়োজন হয় না। ক্ষেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা। মন্তু সহসা বললো, বাইরে আইসা বস না। গায়ে বাতাস লাইগবো।

টুনি পরক্ষণে বললো, আইতাছি। কিন্তু সহসা এলো না সে।

এলো অনেকক্ষণ পরে।

বাইরে কাঠের পাটাতনের উপরে ছোট হয়ে বসলো টুনি।

সেই নদী।

পুরনো নদী।

আগে যেমনটি ছিলো তেমনি আছে।

আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করলো না টুনি।

উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকালো না কোনো দিকে।

শুধু বললো, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?

মন্তু সংক্ষেপে বললো, হু।

টুনি বললো, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা?
এ কথার কোনো জবাব দিলো না মন্তু। সে শুধু দেখলো, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বললো, চুপ কইরা রইলা যে?
মন্তু হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বললো, শান্তির হাট।
টুনি চমকে তাকালো সেদিকে।
ভাটার স্রোত ঠেলে নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সার বাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।
সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগলো মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো নৌকো। পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো টুনি। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিলো আবার।
মন্তু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কী যেন দেখছে সে।
নৌকোটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বললো, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি?
মন্তু চুপ করে রইলো।
টুনি আবার বললো, হাটে কি কোনো কাম আছে?
মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বললো, মনোয়ার হাজিরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকমু। চল যাই।
টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেলো ওর। মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে।
মন্তু আবার বললো, মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো। আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর।
টুনির চোখের কোণে তখনও দুফোটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীর মাথাটা নাড়লো সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বললো, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়া ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুলো না ওর।

তারপর।
তারপর নদীর স্রোতে বয়ে চললো। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।
সেদিন হাটবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দুই পয়সার পান।
এক আনার তামাক। আর দশ পয়সার বাতাসা।
কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পাহারা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।
হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না । মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়লো মন্তুর।
বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।
কেউ নেই।
জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।
টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।
প্রথম প্রথম খোঁজ-খবর নিতো। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।
হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিলো। বছর তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।

আবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়। যে-কোনো কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।

উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিলো আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।

কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করলো সে।

মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসালো ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেলো আম্বিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগলো। চাঁদ হেলে পড়লো পশ্চিমে।

উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। পরির দীঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেলো। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেলো।

কী কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরি।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে।

রাত বাড়ছে।

হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অবিরাম বর্ষণ– একটানা বৃষ্টি। **ঠিকে নিবে**– ধার নেবে। **সরেস**– শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; উত্তম। **জমিন**– জমি শব্দের আঞ্চলিক রূপ। **পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে**– পথের দূরত্ব কমে যায়। **নাওডা**– নৌকাটা। **নাইয়র**– বিবাহিত নারীর পিতৃগৃহে গমন করা। **বোবা চাউনি**– ভাবলেশহীন চোখে তাকানো।

সারসংক্ষেপ :

মকবুলের মৃত্যুর কয়েকদিন পর টুনি বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলো। মন্তু টুনিকে নিয়ে ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিলো। সেই নৌকা, যাতে করে মন্তু টুনিকে নিয়ে এসেছিলো তার বাপের বাড়ি থেকে। শান্তির হাট দেখে মন্তু সেখানে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা করে। মন্তু জানায়, সে নামবে ওখানে, হাজিকে বললে মোল্লা ডেকে তাদের বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। কথাটা বলবার সময় আবেগে মন্তুর গলাটা থরথর করে কাঁপে। কিন্তু টুনি সায় দেয় না মন্তুর এ-প্রস্তাবে। সে কেবল ফিসফিস করে বলে, 'না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না।' কথাটা বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে টুনি। টুনি আর মন্তুর জীবনে যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো, তা পরিণতি পায়নি। মন্তু বিয়ে করেছে আম্বিয়াকে। তাদের একটি সন্তানও আছে। অনেক বছর হল টুনির সঙ্গে দেখা হয় না। বুড়ো মকবুল, আবুল, সুরত আলী সবাই পরপারে চলে গেছে। হীরনের বার দুয়েক বিয়ে হয়েছিলো, দুবারই তালাক হয়ে গেছে। এখন সে বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। মন্তু চেষ্টা করছে তাকে আর একটি ভালো বিয়ে দেবার। কারণ এখন সে-ই বাড়ির কর্তা। সবাই মরে যায়; কিন্তু রেখে যায় উত্তরাধিকার। যেমন সুরত আলী তাঁর ছেলেকে রেখে গেছে আর দিয়ে গেছে পুঁথি পড়ার চমৎকার গুণ। মকবুল নেই; কিন্তু হীরন রয়েছে। একদিন হয়তো মন্তুও থাকবে না; কিন্তু তাদের উত্তরাধিকার থাকবে। এই দিন থাকবে না, অন্য দিন এসে যাবে; যেমন এই সকল মানুষ থাকবে না, অন্য মানুষেরা এসে পৃথিবীতে বসবাস করতে শুরু করবে। হাজার বছর ধরে পৃথিবী এভাবেই চলেছে –হয়তো চলবে আরো হাজার বছর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. হাট থেকে মন্তু কী কী কিনে এনেছিল?

i. এক আনার তামাক
ii. দুই পয়সার পান
iii. দশ পয়সার বাতাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৩৮. মন্তু চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে–

i. পুরাতনের বিদায়

ii. নতুনের আগমন

iii. পুরাতনের সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতি চিরকালের নবীনরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর কবিতার চরিত্রগুলো সেই চিরকালের প্রকৃতির সন্তান। এরা যায়, আসে –থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি চিরকালই নানা রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে বিরাজমান থাকে।

৩৯. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোন উপন্যাসের?

ক. হাজার বছর ধরে খ. আরেক ফাল্গুন

গ. বরফ গলা নদী ঘ. কাঁদো নদী কাঁদো

৪০. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে নিচের যে বাক্যের মিল রয়েছে–

ক. কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। খ. মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

গ. মানুষ মাত্রই ভুল। ঘ. হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে সূর্য উদিত হয়।

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৪১. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৬৪ খ. ১৯৬৫ গ. ১৯৬৬ ঘ. ১৯৬৭

৪২. কাশেম শিকদার ও তার স্ত্রী কী নিয়ে বানের জলে ভেসেছিলেন?
ক. খাদ্যদ্রব্য খ. টাকার কলসি গ. কাঁথা ও বালিশ ঘ. শূন্য হাতে

৪৩. 'সে এক অদ্ভুত হাসি। যেন ফুরোতেই চায় না'– হাসিটি কার?
ক. আম্বিয়ার খ. টুনির গ. সালেহার ঘ. সখিনার

৪৪. হীরনের বিয়েতে কত টাকা মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল?
ক. সোয়া আট টাকা খ. সাড়ে আট টাকা গ. সোয়া এগার টাকা ঘ. সাড়ে এগার টাকা

৪৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে কোন কোন বিবির নাম রয়েছে?
ক. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, অহল্যাবিবি খ. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, চণ্ডীবিবি
গ. বসন্তবিবি, কলেরাবিবি, মনসাবিবি ঘ. ওলাবিবি, বসন্তবিবি, যক্ষ্মাবিবি

৪৬. 'আম্বিয়াকে বিয়া করলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না?'– উক্তিটি কার?
ক. টুনির খ. সালেহার গ. আমেনার ঘ. সখিনার

৪৭. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি যে শ্রেণির–
ক. কাব্যধর্মী খ. সামাজিক গ. ডিটেক্টিভ ঘ. রূপকধর্মী

৪৮. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে যে সমাজ চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা মূলত–
ক. উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের খ. নিম্নবিত্ত শ্রেণির গ. ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ঘ. একান্নবর্তী পরিবারের

৪৯. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে যে চরিত্রটি প্রতিবাদী–
ক. আম্বিয়া খ. সখিনা গ. টুনি ঘ. সালেহা

৫০. সালেহা যে প্রকৃতির মেয়ে–
ক. বদরাগী খ. সহমর্মী গ. আন্তরিক ঘ. কূটিল

৫১. 'ঘরের বৌ করে আনার মত মেয়ে ও নয়'– কেন আম্বিয়া সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে?
ক. বয়স বেশি খ. পরিবার হাঁপানি রোগী গ. বদমেজাজি ঘ. ভূতগ্রস্ত নারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্ত্রীদের ধমকে উঠে কলিম শেখ , 'তোদের কি গায়ে শক্তি নেই? আরো জোরে ঢেঁকিতে পাড় দে না, হাঁ।' এমনভাবে গর্জে ওঠে কলিম শেখ যেন মাঠে লাঙল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে।

৫২. উদ্দীপকের কলিম শেখ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ক. বুড়ো মকবুল খ. সুরত আলী গ. কদম শেখ ঘ. গনু মোল্লা

৫৩. কলিম শেখ ও চরিত্রটির মিল রয়েছে যে বিষয়ে–
ক. মমত্ববোধে খ. নির্মমতায় গ. সহযোগিতায় ঘ. সৌজন্যবোধে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গ্রামের লোকের বিশ্বাস কলেরা রোগের মূল ওলাবিবি। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ওলাবিবির এক পা খোঁড়া এবং অদৃশ্য। বসন্তবিবি এবং যক্ষ্মাবিবি নামে ওলাবিবির আরও দুই বোন রয়েছে। ওলাবিবি যে গ্রামে প্রবেশ করে সে গ্রামেই কলেরা রোগ দেখা দেয়।

৫৪. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. লোককথা বর্ণনায় ii. ঐতিহ্যপ্রীতিতে iii. মানসিকতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৫৫. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে–

i. সামাজিক সচেতনায় ii. কুসংস্কারে বিশ্বাসে iii. লিঙ্গবৈষম্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমি জন্মেছি বাংলায় ,আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে ,'কোথা থেকে তুমি এলে?'

৫৬. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে জহির রায়হানের কোন উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আরেক ফাল্গুন খ. হাজার বছর ধরে গ. শেষ বিকেলের মেয়ে ঘ. বরফ গলা নদী

৫৭. উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে–

i. আবহমানকালের বাংলা ii. বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চল iii. বাঙালির প্রাচীন জীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

৫৮. 'তা আর অয় না মিয়া ! তা অয় না !' উক্তিটির মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে–

ক. বুড়ো মকবুলের বিয়ে খ. টুনির বেড়াতে যাওয়া গ. মন্তু ও টুনির বিয়ে ঘ. আম্বিয়া ও মন্তুর বিয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

জীবনকে সুন্দর করতে হলে সৌন্দর্যের নিদর্শন শিল্পকে সাধারণ জীবনে একটু স্থান দেয়া দরকার। আমাদের বাড়ি সুন্দর হওয়া চাই,বাড়ির প্রাঙ্গণ সুন্দর হওয়া চাই,বাড়ির আসবাবপত্র সুন্দর হওয়া চাই,বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম সুন্দর হওয়া চাই,বাড়ির বেষ্টনিও সুন্দর হওয়া চাই। তারপর আমরা যা পারি,আমরা যা ব্যবহার করি,সবই সুন্দর হওয়া চাই। সৌন্দর্য আমাদের জীবনের অপরিহার্য একটি অঙ্গ। জীবনের এই সৌন্দর্যকে সাহিত্যশিল্প অঙ্গীভূত করে। আর নিজের সৃষ্টিকর্মে এই সৌন্দর্যকে রূপায়ণ করতে পারাটাই হচ্ছে একজন সাহিত্যশিল্পীর সাফল্য।

ক. 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস?

খ. আঞ্চলিক উপন্যাস কাকে বলে?

গ. উদ্দীপকের ভাবনার সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?–আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকের সৌন্দর্য ভাবনা 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।"–স্বীকার করেন কী? মন্তব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিগুলো তুলে ধরুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

ঢেঁকির পাশে বসে এই মুহূর্তে বার বার জমিলার কথা মনে পড়ছে বুড়ো গণি মোল্লার। জমিলা কেমন যেন ধপাস ধপাস করে ধান ভানে। ঢেঁকিতে চড়লেই ওর গান গাওয়ার সখ চাপে। সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি ওর। চেহারায় মাধুর্য আছে। চোখ জোড়া বড় বেশি মর্মভেদী। ঢেঁকিতে চড়লে, ঢেঁকিকে আর সুখ দেয় না ও। মনে হয় ঢেঁকির সাথে আজ ওর একটা এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাবে।

ক. আওরঙ্গজেব কে ছিলেন?

খ. মকবুলের পরিবার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসকে কীভাবে প্রতিফলিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "ধান ভানার উৎসব আবহমান বাংলায় লালিত একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

কেমন বিচিগুলি তেল চুকচুক কচ্চে– আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গোরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙি গাইটা একেবারে রাক্কুস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে

অনেকগুলো হলো। অতঃপর দুর্গা খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বিচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রুক্ষ্ম চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহাখুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

ক. মন্তু তাবিজটা কোথায় বেঁধেছিল?
খ. 'নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না তিনি।' – বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? – বিশ্লেষণ করুন।
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও দুর্গা যেন টুনিরই প্রতিচ্ছবি।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, 'ওর সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল,'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।' শাশুড়ি বলিলেন,' কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।' কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না– যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

ক. মন্তুর কতটুকু জমি আছে?
খ. 'তোমার নায়ে আমারে বাপের বাড়ি পৌঁছায়া দিবা?– কে,কাকে, কেন বলেছিল?
গ. উদ্দীপকের নিরু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. নিরু ও হালিমা উভয়ের করুণ পরিণতির জন্য আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দায়ী।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলো যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে।

ক. 'বেলা অইয়া গেছে খাইয়া নাও।' –কে, কাকে বলেছিল?
খ. মনোয়ার হাজির পরিচয় দিন।
গ. উদ্দীপকের ভাবের সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটি কী সাদৃশ্যপূর্ণ? – মতামত ব্যক্ত করুন।
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও রতন ও টুনির হৃদয়ের অন্তঃক্ষরণ একই ধারায় প্রবাহিত।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভান্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। রূপের ভারে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যুথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

ক. টুনি কাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল?
খ. শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে আসা তোরাবের অদ্ভুত আচরণের পরিচয় দিন।
গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের বিয়ের অনুষ্ঠানটিকে সামগ্রিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

হায়রে সংসার। কী বিচিত্র এর লীলা! পূর্ণার সঙ্গে অপুর্বর বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এলে বিশাখা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। সে তার স্বামী মোবারককে পূর্ণার সম্পতির লোভ দেখিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রলুব্ধ করে তোলে। বিশাখার এমন প্রস্তাবে মোবারক যারপরনাই খুশি হল। মোবারকের নিকট তখন বিশাখাকে অনেক বড় বলে মনে হয়।

ক. মন্তুর মায়ের কবর কোথায়?

খ. নন্তু শেখের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের বিপাশা 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে নারী জীবনের ঈর্ষাপরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" –যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

ইতিহাসের জগৎ থেকে কোন ঘটনা কিংবা চরিত্র অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করলে তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে। ইতিহাসের চরিত্র কিংবা ঘটনাকে বিকৃত না করে শিল্পসুষমার মাধ্যমে কাহিনি ও চরিত্র বয়ন করতে পারাটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক উপন্যসের সার্থকতা। এ ধরনের উপসন্যাসে লেখকের কল্পনার রঙ অবশ্য থাকে। কারণ ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন,ইতিহাস নয়। ইতিহাসের মাল-মসলা,উপকরণ ও তথ্য নিয়ে তিনি কঙ্কালের উপর রক্ত-মাংস দিয়ে একে আরও সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' ও 'চন্দ্রশেখর' এ ধারার দুটো শ্রেষ্ঠ রচনা।

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান কয়টি?

খ. বাংলাদেশের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ. উদ্দীপকের বিষয়য়বস্তু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন দিকটিকে নির্দেশ করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপকে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাব প্রকাশিত হয়নি,একটি অংশ ফুটে উঠেছে মাত্র।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল, বলিতে লজ্জা নাই, তাহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইল যে, তাহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাহাকে টলাইতে পারি না।

ক. বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস কোনটি?

খ. 'আদিম মাদকতায় মাতাল ছিল মকবুল।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে কার প্রতিনিধিত্ব করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "প্রথা বহির্ভূত বিয়ের কারণেই মূলত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

কাল ভর দুপুরে বারুণী দীঘির পাড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। শুকনো ডালপাতা কুড়োতে। বিকেল হলেও মেয়েটা আর ঘরে ফেরে না। মেয়ের মা-তো ভয়ে অস্থির। বয়স্কা মেয়ে কে জানে আবার কোন বিপদে পড়ল। প্রথমে ওকে দেখে ডহর বাড়ির থুরথুরে বুড়িটা। লম্বা তালগাছের শিয়রে উঠে দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দিব্যি গান গাইছে মেয়েটা। বুড়িতো অবাক, 'বলি শেফালি ! তুই কি লজ্জা-শরমের মাথা খাইছিস? দিন দুপুরে গাছে উইঠা গীত গাইবার লাগছস?' শেফালি ভয় পাওয়ার বদলে উল্টো বুড়ির ঘাড় মটকিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

ক.'ওইহানে চুড়ি পাওন যায়?' –উক্তিটি কার?

খ. ওলা বিবি কে? তার পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও উপন্যাসের কুসংস্কারাচ্ছান্নতা যেন একই সূত্রে গাঁথা।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১১

ভাটি অঞ্চলের একটি গ্রাম । বসন্তের আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে, দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস যখন অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায় পাতায়, তখন গ্রামের সবাই সারাদিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে ঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। গ্রামটিতে তখন ধুম পড়ে পুঁথিপাঠের। পাঠ করা হয় মহুয়া, মলুয়া কখনোবা গাজীকালু, সোনাভানের পুঁথি।

ক. ধানের মওসুম শেষ হলে মন্তু কোথায় কাজ করে?

খ. সংক্ষেপে আবুলের পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "পুঁথি পড়া আমাদের হাজার বছরের লোকসংস্কৃতির অংশ।" –উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮ এর নমুনা উত্তর :

ক. উপন্যাসের প্রধান উপাদান পাঁচটি।

খ. 'বাংলাদেশের উপন্যাস' বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত একটি শাখা।

বাংলাদেশের উপন্যাস ঐতিহ্যবাহী বাংলা উপন্যাসের কনিষ্ঠতম ধারা। এদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে মূলত এখানকার ভৌগোলিক আবহ, কৃষিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধ এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। নিম্নে বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল– এ দেশের উপন্যাসে একদিকে রয়েছে কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবন, অপরদিকে দেখা যায় আধুনিক রুচির পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনধারা। এর একদিকে আছে বাংলার প্রকৃতির ঐশ্বর্যময় উপস্থাপনা, অপর দিকে রয়েছে আধুনিক মানুষের অন্তরের জটিল বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের উপন্যাসে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, তেমনি অপর দিকে রয়েছে রোমান্টিক কল্পনা বিলাস। এদেশের উপন্যাসে একদিকে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভুমিকায় মানুষের অস্থিরতা, অপরদিকে ছায়াপাত করেছে হৃদয়ের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়বস্তু 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোচনা অংশে উল্লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নির্দেশ করে।

উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি যখন কোনো বাস্তব কাহিনিকে অবলম্বন করে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপলাভ করে তখন তাকে উপন্যাস বলা হয়। উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক জীবনচিত্র তুলে ধরে। উপনাস যখন কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কিংবা ঘটনাকে অবলম্বন করে তখন তা ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের জগৎ থেকে কাহিনি বা চরিত্র সংগ্রহ করে। এখানে উপন্যাস রচয়িতা ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করেন না। তবে তিনি কখনো কখনো ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে থাকেন। উপন্যাসের আলোচনা অংশেও দেখা যায়, যে ঔপন্যাসিক এ ধরনের উপন্যাস রচনা করেন তিনি ইতিহাসের সত্যকে অবলম্বন করে থাকেন। তাঁর রচনায় ইতিহাসের প্রচলিত সত্য একটি নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্য রচনার ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাস শিল্প হতে মাত্র একটি ধারা অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

উপন্যাসে বাণীরূপ পায় জগৎ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি। এতে প্রতিফলিত হয় দেশ,কাল ও সমাজের বাস্তব চিত্র। উপন্যাস পাঠক উপন্যাস থেকে রসমাধুর্য উপভোগ করেন। উপন্যাসের রসমাধুর্যের সঙ্গে তার নিকট জীবন ও চারপাশের পরিচিত জগৎ নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। বলা হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে থাকেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে

ইতিহাসের মালমসলা ও তথ্য-উপকরণ থাকে। আর ঔপন্যাসিক একে আরও প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলে। পক্ষান্তরে পাঠ্য রচনায় উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এখানে উপন্যাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গঠনশৈলী প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে উপন্যাসের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়েরও বিশ্লেষণ রয়েছে।

উপন্যাসে শুধু একটি অংশের আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাস-শিল্পের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পাঠ্য-অংশে উপন্যাসের ধারাগুলোর নিপুণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র, ভাষা ও সংলাপ, লেখকের জীবনদর্শন প্রভৃতির আলোচনাও উঠে এসেছে। সর্বোপরি রয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোচনা অংশের সমগ্র ভাবটি প্রকাশিত হয়নি, একটিমাত্র অংশ ফুটে উঠেছে।

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-৯ এর নমুনা উত্তর :</u>

ক. প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস।

খ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বুড়ো মকবুল সিকদার বাড়ির প্রধান পুরুষ।

আবহমান বাংলায় মকবুল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। সে সমাজপতি হলেও তার মধ্যে সমাজ প্রধানের স্বভাব ধর্ম ছিল না। তার ঘরে তিনজন স্ত্রী রয়েছে। স্ত্রীদেরকে সে নির্মম শাসনে রাখে। কিন্তু সে স্ত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে মোটেও খেয়াল রাখে না। ঘরে-বাইরে সে স্ত্রীদেরকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করায়। সম্পদের লোভে মকবুল আম্বিয়াকে চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে ঘরে আনতে চেয়েছে। এর জন্য তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক পর্যন্ত দিতে হয়েছে। মানব জীবনে অন্ধকার পর্যায়ের যে দিকগুলো রয়েছে তার সবকয়টিই বুড়ো মকবুলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই মকবুলকে আদিম মাদকতায় মাতাল বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের চরিত্রটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের বুড়ো মকবুলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতি সুষমাময়। কিন্তু মানুষের জীবন এর আলোকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর নয়। গ্রামীণ জীবনে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিচু দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজালে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকে কোনো রকমে। জীবনের মহত্ত্ব তাদেরকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় না। প্রাচীন সমাজের যে যূথবদ্ধতা, নিষ্ঠুর পুরুষতান্ত্রিকতা ও অমানবিক নারী নির্যাতন তার সবই রয়েছে বুড়ো মকবুলদের গ্রামীণ সমাজে।

উদ্দীপকে দেখা যায় চরিত্রটি বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছে। কিন্ত তার স্ত্রী তার নিকট থেকে পলায়ন করে। উদ্দীপকের চরিত্রটি তাকে খুঁজে পেয়েছেন নদীতে রাখা একটি বজরায়। স্ত্রীকে তিনি সঙ্গে নিতে চান কিন্তু তার স্ত্রী সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক। উপন্যাসেও দেখা যায় বুড়ো মকবুল বৃদ্ধ বয়সে টুনিকে বিয়ে করে। অসম বয়সের কারণে টুনির সঙ্গে মকবুলের কোন প্রকার বোঝাপড়া গড়ে উঠেনি। টুনি ঘুরে বেড়ায় মকবুলের চাচাত ভাই মন্তুর সঙ্গে। স্বামী কিংবা সংসারের প্রতি তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও মকবুল তার কোন সান্নিধ্য পায় না। তাই বলা যায় উদ্দীপকের বৃদ্ধের সঙ্গে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বুড়ো মকবুলের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের চরিত্র ও বুড়ো মকবুল সামাজিক প্রথার বাইরে গিয়ে বিয়ে করায় তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে এসেছে।

বিয়ে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষ সংসার রচনা করে এই বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে। সংসার জীবনে মানুষ আনন্দ, প্রশান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। আর এর মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধানের কারণে অনেক সময় এই বোঝাপড়াটা গড়ে উঠে না। তার অনিবার্য পরিণতি হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে দেখা যায় বুড়ো মকবুল কিশোরী টুনিকে বিয়ে করে ঘরে তুলেছে। কিন্তু তখনো টুনির বিয়ের বয়স হয়নি। মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সে খেলার ছলে ঘুরে বেড়ায় মকবুলের চাচাত ভাই মন্তুর সঙ্গে। কোন কোন সময় হতাশায় টুনি বুড়ো মকবুলের মৃত্যু কামনা করে। টুনি স্বপ্ন দেখে মকবুল মারা গেলে সে পাখির মতো উড়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মন্তুকে কাছে পাবার জন্য টুনি একসময় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। যদিও এই কৌশলটি সফল হয়নি। তবুও এর পরিণতি হয় মারাত্মক। বুড়ো মকবুল মারা যায়। উদ্দীপকের চরিত্রটিও বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করে। একসময় তার স্ত্রী তার নিকট থেকে পলায়ন করে। স্ত্রীকে তিনি সৌভাগ্যক্রমে খুঁজে পান একটি বজরা নৌকায়। কিন্তু স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ফিরে যেতে রাজি নয়। অতি সাধ্য-সাধনা করেও উদ্দীপকের চরিত্রটি স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি।

উদ্দীপকের বৃদ্ধ লোক এবং উপন্যাসের বুড়ো মকবুল দুজনেই সামাজিক প্রথা ভেঙ্গে অধিক বয়সে বিয়ে করেছেন। তারা তাদের স্ত্রীদের বয়স বিবেচনা না করে অল্পবয়সী কিশোরীর পাণিগ্রহণ করেছেন। ফলে উভয়ের জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। তাই বলা যায়, উপন্যাসে বুড়ো মকবুলের প্রেক্ষাপটটি কিছুটা ভিন্ন হলেও সামাজিক প্রথার বাইরে বিয়ে করায় উভয়ের জীবনেই সংকট তৈরি হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০ এর নমুনা উত্তর :

ক. উক্তিটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র টুনির।

খ. ওলা বিবি বলতে কলেরা বা ভেদবমি রোগকে বোঝানো হয়েছে।

কলেরা একটি সংক্রামক ব্যাধি। একসময় গ্রামবাংলায় কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিত এবং গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ওলাবিবি একজন নারী। তার একটি খোঁড়া পা আছে। হযরত আলি ওলাবিবিকে আছাড় মেরে তার এক পা খোঁড়া করে দেন। ওলা বিবির অন্য দুই বোন হচ্ছে বসন্ত বিবি ও যক্ষ্মা বিবি। কোনো বাড়িতে ওলা বিবির আগমন ঘটলে সে বাড়িতে কলেরা রোগ দেখা দেয়।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ভুতের বিশ্বাসে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবহমান বাংলায় গ্রামীণ জীবনে যে সকল সংস্কার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভুতে বিশ্বাস। কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করলে কিংবা অসংলগ্ন কথাবার্তা বললে ধরে নেয়া হয় যে তাকে ভুতে ধরেছে। এই ভুতকে তাড়ানোর জন্য তখন কবিরাজ বা কোন ওঝার নিকট নেয়া হয়। উদ্দীপক এবং 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে এরকম ভুতে বিশ্বাসের বর্ণনা রযেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় শেফালি বারুণী দীঘির পাড়ে ডালপাতা কুড়াতে যায়। বিকাল হয়ে গেলেও সে বাড়ি ফেরার নাম করে না। তাকে হঠাৎ সেখানে তালগাছের মাথায় আবিষ্কার করে ডহর বাড়ির বুড়ি। শেফালি তালগাছের মাথায় বসে দুদিকে দু'পা ছড়িয়ে দিযে গান গায়। কেউ কাছে গেলে তার ঘাড় মটকিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসেও দেখা যায়, মজু ব্যাপারির মেয়ে সখিনা একদিন খুব ভোরে শুকনো ডালপাতা কুড়াতে পরির দীঘির পাড়ে যায়। সেখানে সে লম্বা তেঁতুলগাছের মগডালে বসে উচ্চস্বরে গান গাইতে থাকে। তখন তার চাচা তকু ব্যাপারি তাকে গাছ থেকে নামাতে গেলে সে উল্টো চাচাকে শাসায়। এমনকি চাচাকে জানে খতম করে ফেলার হুমকি দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটির সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যেন একই সূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি যথার্থ।

আমাদের গ্রামীণ সমাজে অনেক অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ভুত-প্রেতে বিশ্বাস। আসলে পৃথিবীতে ভুতের কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রামীণ সমাজে যেটিকে ভুত বলে বিশ্বাস করা হয় তা আসলে একটি মানসিক রোগ। ভুতে ধরার বিষয়টি মূলত মানুষের মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাবজনিত একটি ঘটনা। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে একধরনের হ্যালুসিনেশন তৈরি হয। এটি মানুষকে অসংলগ্ন আচরণ করতে বাধ্য করে। তাই বাস্তব পৃথিবীতে ভুতকে দেখা যায না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শেফালি বারুণীর দীঘির পাড়ে পাতা কুড়াতে গেলে তাকে ভুতে ধরে। সে বিশাল লম্বা একটি তালগাছে চড়ে বসে। গাছের উপর বসে গান গায়। ডহর বাড়ির বুড়ি তার নিকট গেলে সে তার ঘাড় মটকিয়ে দেবার হুমকি দেয়। পক্ষান্তরে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসেও রয়েছে মজু ব্যাপারির মেয়ে সখিনা পরির দীঘির পাড়ে ভোরে শুকনা পাতা কুড়াতে গিয়ে বিকাল হলেও আর ঘরে ফেরে না। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তেঁতুল গাছের মাথায়। সেখানে সে দু'পা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে মনের আনন্দে গান গায়।

উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস দুটিতেই সমাজের প্রচলিত লোকবিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। সমাজে শিক্ষার অভাব থাকলে এ ধরনের বিশ্বাস তৈরি হয়। এছাড়া সেখানে বিজ্ঞান চিন্তার অনুপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেনি। প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারকে তারা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে উল্লিখিত ভুতের কুসংস্কার যেন একইসূত্রে গাঁথা।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১১ এর নমুনা উত্তর :

ক. ধানের মওসুম শেষ হয়ে গেলে মন্তু কলাই, মুগ, তিল, সরিষার খেতে কাজ করে। মাঝে মাঝে সে এ বাড়ি ও বাড়ি লাকড়ি কাটার কাজ নেয়।

খ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে আবুল একটি অমানবিক চরিত্র।

আবুল হচ্ছে শিকদার বাড়ির কর্তা মকবুলের প্রতিবেশি। সে তিনটি বিয়ে করেছে। তার বর্তমান স্ত্রীর নাম হালিমা। এর আগে সে তার দুটো স্ত্রীকে পিটিয়ে মেরেছে। তাদের নাম ছিল আয়েশা ও জমিলা। কারণে-অকারণে আবুল বউদেরকে পিটায়। বউ মারায় সে যেন পৈশাচিক আনন্দ পায়। আবুল প্রকৃতপক্ষে আমাদের গ্রামীণ সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিনিধি। এই পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে সম্মান দেয় না, ভালবাসে না, এমনকি মানবিক অধিকারটুকু পর্যন্ত দিতে চায় না। আবুল সমাজে নির্মমতার প্রতীক।

গ. উদ্দীপকটি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে পুঁথি পড়ার সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন প্রায় স্থবির, গতিহীন। এখানে মানুষের জীবনে তেমন কোন উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় না,জীবন চলে প্রায় পরিবর্তনহীনতায়। এখানে সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দের উপকরণ বলতেও তেমন কিছু নেই। তাই কর্মক্লান্ত মানুষ বেলা শেষে আনন্দের উপকরণ হিসাবে পুঁথিপাঠের আয়োজন করে। আর অবসর সময়ে গ্রামের সবাই গোল হয়ে বসে পুঁথিপাঠ শোনে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভাটি অঞ্চলের গ্রামটিতে পুঁথিপাঠের আসর বসেছে। গ্রামটিতে যখন মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস বয় তখন সেখানে পুঁথি পড়ার আসর জমে উঠে। সন্ধ্যার পর গ্রামের কর্মক্লান্ত মানুষ আনন্দ উপভোগের জন্য পুঁথিপাঠ শোনে। উচ্ছ্বসিত হয় গাজী কালু-চম্পাবতী কিংবা সোনাভানের কাহিনি শুনে। 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসেও দেখা যায় সুরত আলী পুঁথি পড়ে। এখানেও সারা দিনের কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনে আনন্দের উপকরণ তেমন একটা নেই। তারা সন্ধ্যার পর আকাশ ভাসিয়ে যখন জোছনার বান ডাকে তখন ওঠোনে গোল হয়ে বসে, পুঁথিপাঠ শোনে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের পুঁথিপাঠের সংস্কৃতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. পুঁথি পড়া আমাদের আবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ।

গ্রামের মানুষ পুঁথি পাঠের মধ্য দিয়ে আনন্দের জগতকে খোঁজে। কেননা পুঁথির জগৎ রোমান্সের জগৎ। এই জগতের সঙ্গে মানুষ তার কল্পনার জগতকে মিলিয়ে নেয়। একসময় দেখা যায় তার সকল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কল্পলোকের পুঁথির জগতের সত্য। উদ্দীপকে দেখা যায় ভাটি অঞ্চলের গ্রামটিতে অবসর সময়ে পুঁথি পড়ার আসর বসে। সারা দিন পরিশ্রমের পর সুযোগ পেলেই গ্রামের মানুষ নাচ, গান, হাসি,তামাশা আর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। দখিনা সমীরণ তাদের স্বাগত জানায়। নিশুতি রাতের ঘরের দীর্ঘ ছায়া তাদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। উপন্যাসেও রয়েছে আকাশে জোছনার বান ডাকলে শিকদার বাড়িতে পুঁথিপাঠের আসর জমে ওঠে। শিকদার পরিবারের সদস্যরা মেতে উঠে আনন্দে। পুঁথির জগত তাদের নিয়ে যায় রোমান্সের জগতে। হয়তো এখানে তারা নতুন জীবনের স্বপ্নও দেখে।

পুঁথিপাঠ আমাদের গ্রামীণ জীবনে আনন্দ লাভের এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। নিস্তরঙ্গ জীবনে এই পুঁথিপাঠই সামান্য গতির সঞ্চার করে। পুঁথির মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবনের কল্পলোকে প্রবেশ করে। আর এভাবেই তার জীবনে জড়িয়ে থাকে পুঁথির জগতের সত্য। তাই বলা যায়, পুঁথিপাঠ আমাদের সমাজে হাজার বছর ধরে চলমান লোকসংস্কৃতির অংশ।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

ক. ‘নিমক হারাম’ শব্দের অর্থ কী?
খ. ‘কথাটা চাপা থাকল না।’ –কোন কথাটি? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সাকিনা বিবি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ঘ. “উদ্দীপকের হরিদাসী ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের টুনির জীবনে বিপর্যয় নেমে এলেও উভয়ের পটভূমি ভিন্ন।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়। এক সময় সকলে মরে যায় কিন্তু রেখে যায় তার উত্তরাধিকার। মানুষের গড়া অনেক সভ্যতা চিরকালের তরে বিলীন হয়ে গেছে। এককালের পৃথিবীখ্যাত এশিরিয় ও ব্যাবিলনিয় সভ্যতা আজ আর ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। কেবল প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় হয়ে পৃথিবীতে প্রবহমান রয়েছে। এভাবে পৃথিবী চলছে হাজার বছর ধরে। হয়তোবা চলতে থাকবে আরও হাজার বছর।

ক. হীরন আজকাল কোথায় থাকে?
খ. সুরত আলীর ছেলেটা কীভাবে পিতার পুঁথিপাঠের গুণটি রপ্ত করেছে?
গ. উদ্দীপকের ভাবনা ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাবই অনুরণিত হয়েছে‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

হঠাৎ চিৎকার করে উঠে মজিদ। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড করে বসে সে। ঘরের মাঝখানে এতগুলো লোকের সামনে সে হঠাৎ রহিমা আর জমিলাকে একসঙ্গে তালাক দিয়ে বসে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে, তোরা আমার পীরের মাজারকে অপমান করছস। বাইর হইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা। পরিবেশ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে। পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রহিমা। জমিলা মূর্ছা যায়। আহাদের মা চিৎকার করে উঠে, ‘আহারে পোড়া কপাইল্যা, ই কি কইরলি তুই? ওরে পোড়া কপাইল্যারে, এই কি কইরলি?’

ক. সার্কাস কী?
খ. ‘ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।’–বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকটি ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসের কোন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপক ও ‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে নারী জীবনের অসহায়ত্বই প্রকাশিত হয়েছে।” –মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.ক	২.খ	৩.ক	৪.ক	৫.গ	৬.খ	৭.ঘ	৮.খ	৯.খ	১০.ক
১১.খ	১২.গ	১৩.খ	১৪.গ	১৫.খ	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮.খ	১৯. খ	২০. ক
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪.	২৫. গ	২৬. গ	২৭. খ	২৮.গ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. ঘ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. ঘ
৪১. ক	৪২. খ	৪৩. ঘ	৪৪. গ	৪৫. ঘ	৪৬. ক	৪৭. খ	৪৮. খ	৪৯.ক	৫০. ঘ
৫১. খ	৫২. ক	৫৩. খ	৫৪. ক	৫৫. খ	৫৬. খ	৫৭. ক	৫৮. গ		

নাটক

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

এসএসসি প্রোগ্রাম

বাংলা প্রথম পত্র : SSC-1651

মানবণ্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন **(কাঠামোবদ্ধ)**	: ৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	: ৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
	সর্বমোট	**= ১০০**

১. সৃজনশীল প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

গদ্য, কবিতা ও সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) অংশের প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টিসহ মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেকটি প্রশ্নের পূর্ণমান ১০ নম্বর।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।
প্রশ্ন ৪টির নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগদক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক) নম্বর।

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে গদ্য থেকে ১৫টি, কবিতা থেকে ১৫টি এবং সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) থেকে ১০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

নাট্যকার পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা মারা যান।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ, আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও তা শেষ করতে পারেননি। কেননা এমএ ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ সালে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দি স্টেটস্‌ম্যান' এর সাংবাদিক হন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। তখন থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বুলবুল', 'পরিচয়', 'অরণি', 'পূর্বাশা' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি করাচি বেতারের বার্তা সম্পাদক হন এবং তারপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ এবং অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সঙ্কোচপরায়ণ একজন ব্যক্তি। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যয়নস্পৃহা ও কল্পনাপ্রিয়তা। তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো যে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তিনি গল্প এবং উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের যে সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবনের চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি তিনি মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীর মতোই উদ্‌ঘাটন করেছেন। শুধু উপভোগ্য মজাদার গল্প রচনা তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তিনি মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লালসালু' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে তিনি গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)-তে চেতনা-প্রবাহ রীতি ও অস্তিত্ববাদের ধারণাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নয়ন চারা' ও 'দুই তীর' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৬৫ সালে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষামূলক তিনখানি নাটকও লিখেছেন। সেগুলো হল 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'সুড়ঙ্গ'। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন এবং প্যারিসেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'বহিপীর' নাটকটি পড়া শেষে আপনি –

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখতে পারবেন।
- 'বহিপীর' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে পারবেন;
- বহিপীরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- প্রতিবাদী ব্যক্তি হিসেবে তাহেরা ও হাশেমের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পীরপ্রথার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একজন সার্থক নাট্যকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ–১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের ইতিহাস লিখতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা সবাই কম-বেশি নাটক দেখেছি; কখনো মঞ্চে বা টেলিভিশনে, কখনো বা নাটক শুনেছি রেডিওতে। আপনিও নিশ্চয়ই নাটক দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। অতীতকালে নাটক কেবল দেখারই বিষয় ছিল। এজন্য প্রাচীন ভারতে নাটককে বলা হতো দৃশ্যকাব্য। কিন্তু আধুনিককালে প্রচার মাধ্যমের উন্নতির ফলে এখন নাটক শোনারও বিষয় হয়েছে। যেমন আমরা নাটক শুনি রেডিওতে, কখনো বা ক্যাসেট প্লেয়ারে। আপনিও তো নাটক দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। কিন্তু বলতে কি পারবেন, নাটক কাকে বলে? নাটকের বৈশিষ্ট্য কী? প্রশ্নটা একটু জটিল হল, তাই না? দেখাই যাক তাহলে, বিষয়টা সহজভাবে আমরা কীভাবে বুঝতে পারি।

সাহিত্যের নানা রকম শাখা রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ –এগুলো সাহিত্যের প্রধান শাখা। এসব শাখার মধ্যে নাটক খুবই জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। সহজ কথায় বলা যায়, নাটক দেখা ও শোনার বিষয়। মনে করুন, আপনি টেলিভিশনে একটি নাটক দেখতে বসেছেন। নাটক শুরু হল। কিন্তু আপনার সামনে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি আসছে না কিন্তু শব্দ ঠিকভাবেই শুনতে পারছেন। নিশ্চয়ই আপনার খুব খারাপ লাগবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিই যদি দেখা না গেল, তাহলে নাটক দেখে আর আনন্দ কোথায়? আবার মনে করুন, আপনার টেলিভিশনে ছবি খুব ভালো আসছে, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাহলেও আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। তাই নয় কি? এমনটা কেন হয়? কারণ, আমরা আগেই বলেছি, নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। অবশ্য মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে রেডিও নাটক। রেডিও নাটক আমরা কেবল শুনি; কিন্তু দেখি না, দেখতে চাই না।

এবার তাহলে নাটকের একটা সংজ্ঞা দেয়া যাক। এখানে মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন মাধ্যমে নাটক উপস্থাপিত হলেও সাহিত্যে বা নাট্যতত্ত্বে যে নাটকের আলোচনা করা হয়, তা মূলত মঞ্চনাটক। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে

মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তাকে নাটক বলে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে –এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। নাটক শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটক –তিনটি শব্দেরই মূল হল নট্। আর নট্-এর অর্থ হল নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Drama-র মধ্যেও একই সত্য আমরা খুঁজে পাই। Drama শব্দের মূলে রয়েছে গ্রিক শব্দ Dracin, যার অর্থ to do অর্থাৎ কিছু করা। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস উপলব্ধি করতে পারি। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দলাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

আপনি আগেই জেনেছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। বস্তুত, সাহিত্যের অন্য যে সব শাখা রয়েছে, সেখানেও মানব জীবনের নানা দিক রূপায়িত হয়। তাহলে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যশাখার মৌলিক পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য হল, নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে; কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এজন্যে অন্যান্য সাহিত্য-শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে :

১. কাহিনি বা বিষয়;
২. চরিত্র;
৩. সংলাপ এবং
৪. পরিবেশ।

একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনির মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, নাটকে সময়েরও সীমাবদ্ধতা থাকে। তাই কাহিনি এতটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হবে। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না। বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়ে গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনি।

কাহিনিকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনি দাঁড়াবে কীভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত নাটকে একটি প্রধান চরিত্র থাকে। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্র তো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে আসে আরো কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকেই দুগুচ্ছ চরিত্র থাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন, পৃথিবীর যে কোনো সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্য-কাহিনিতে চরিত্র বিকশিত হয়।

কাহিনি আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হল না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্যে চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনি ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে–

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;
খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ এবং
গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য-পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ এখানে করতে হয় নাট্যকারকে।

নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ-সংযোজন, আলোক-বিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চ-নির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে এ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ কাজটি মূলত করেন নাট্য-নির্দেশক। তবে পরিবেশ নির্মাণের এ নির্দেশনা নাট্যকার নাটকে দিয়ে থাকেন। নাট্যকারকে এ-বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। এমন কোনো পরিবেশ নাটকে না থাকাই ভালো, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা অসম্ভব।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, নাটকের যে চারটি উপাদানের কথা বললাম তার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় বা প্রধান উপাদান। না, কোনো উপাদানকেই আমরা প্রধান বলবো না, প্রধান করে বলারও কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু মনে রাখব, ঐ চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, এক-এক যুগে এক-একটি উপাদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে কাহিনি এবং চরিত্রের স্থানই উচ্চে।

গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল প্রাচীন গ্রিক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের গঠনকৌশল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ঐক্যত্রয় হচ্ছে–

১. কালের ঐক্য;
২. স্থানের ঐক্য ;
৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক মঞ্চে যত সময় অভিনীত হবে, সে-সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট হতে পারে।

স্থানের ঐক্য হল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকের চরিত্রসমূহ যতটুকু স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটুকুই দেখানো হবে। এর বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। ঘটনার ঐক্য হল, নাটকে এমন কোনো ঘটনা আনা যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। মূল নাট্য-কাহিনিকে অ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত –এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে এ-তিন পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনি বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হল আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্তপর্বে অতি দ্রুত কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। অ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনির এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, ওপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো অসাধ্য কাজ। এই দুই ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালে নাটকে আমরা ঐ দুই ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করি না। এমনকি শেক্সপিয়রও কাল ও স্থানের ঐক্য তাঁর সব নাটকে মানেননি। ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না।
একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। পর্ব পাঁচটি নিম্নরূপ–

১. কাহিনির আরম্ভ Exposition (মুখ);
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি Rising Action (প্রতিমুখ);
৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব Climax (গর্ভ);

৪. গ্রন্থিমোচন Falling Action (বিমর্ষ);

৫. যবনিকাপাত Conclusion Denouement (উপসংহৃতি)।

ওপরের পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করে রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় একটি অঙ্ক। অ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। বর্তমান কালে নাট্যকারেরা পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

আপনি যেসব নাটক দেখেছেন, তার সবগুলোই কি একই রকমের? নিশ্চয়ই নয়। কোনো নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা কষ্ট। কোনো কোনো নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের বিজয়কাহিনি কিংবা তার পতন ও পরাজয়ের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। নানা ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেয়া হল :

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণিবিভাগ				
ভাব-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোম্যান্টিক	বাস্তববাদী		
বিষয়-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	রাজনৈতিক	চরিতমূলক
রস-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ট্র্যাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজি-কমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাঙ্কেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ-অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	কাব্যনাটক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক	-	-

আপনি ইচ্ছা করলে আরও কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয়স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিনটি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন– বেতার-নাটক, টেলিভিশন-নাটক, মঞ্চ-নাটক ইত্যাদি।

বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিসে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে প্রায় দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। রুশদেশীয় যুবক হেরাসিম লেবেডফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে মঞ্চস্থ করেন। 'দ্য ডিসগাইজ'-এরই রূপান্তরিত বাংলা নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটকটি বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেডফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন– ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য-উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোক-নাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য ও গীতের সাক্ষাৎ আমরা এসব রচনায় পাই। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কেই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে ধরা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড় শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। নিচে একটা ছকের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার, নাটকের নাম ও প্রকাশকাল আমরা উল্লেখ করছি। বলাই বাহুল্য, ছকটি একটা নমুনা মাত্র। তবে এ-ছক থেকে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্তবিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬১ ১৮৬০ ১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ সধবার একাদশী	১৮৬০ ১৮৬৬
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী জমীদার দর্পণ	১৮৭৩ ১৮৭৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	জনা	১৮৯৪
অমৃতলাল বসু	প্রফুল্ল	১৮৮৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন ডাকঘর রক্তকরবী	১৮৯০ ১৯১১ ১৯২৩
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	টিনের তলোয়ার	১৯৭১

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওপরের তালিকা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। এবার আমরা বাংলাদেশের নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। বিভাগ-পরবর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। ১৯৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটকের নাম ছকে উপস্থাপিত হল–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর কবর	১৯৬২ ১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	বহিপীর তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬০ ১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজউদ্দৌলা মহাকবি আলাউল	১৯৬৫ ১৯৬৬

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
সাঈদ আহমদ	কালবেলা শেষ নবাব	১৯৭৬ ১৯৮৯
জিয়া হায়দার	শুভ্রাসুন্দরী কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা অগ্নিগিরি	১৯৫২ ১৯৫৯
মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ	স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল সাত ঘাটের কানাকড়ি	১৯৭৬ ১৯৮৫ ১৯৯১
সৈয়দ শামসুল হক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নূরলদীনের সারা জীবন	১৯৭৬ ১৯৮৩
মামুনুর রশীদ	ওরা কদম আলী ইবলিশ	১৯৭৮ ১৯৮২
আবদুল্লাহ আল মামুন	সেনাপতি কোকিলারা	১৯৮০ ১৯৮৯
সেলিম আল দীন	কিত্তনখোলা যৈবতী কন্যার মন	১৯৮৬ ১৯৯২
আব্দুল মতিন খান	গিলগামেশ	১৯৮২

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটকের রচয়িতা কে?
ক. তারাচাঁদ শিকদার   খ. ইউজিন ও' নীল   গ. বিক্রম শেঠ   ঘ. ওরহাম পামুক

২. মঞ্চনাটকে কৃত্রিমভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়–
i. মঞ্চে সজ্জার মাধ্যমে   ii. আলোক সম্পাতের মাধ্যমে   iii. শব্দযোজনার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কাহিনির উৎস পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক হতে পারে। কিন্তু এটি বিভিন্ন অঙ্ক বা দৃশ্যে বিভক্ত হতে হবে। কাহিনি সাধারণত গদ্যে রচিত হয়, তবে পদ্যেও রচিত হতে পারে। বড় কথা হল কাহিনিটিতে উত্থান-পতন থাকবে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে রচনাটির–
ক. লালসালু   খ. বহিপীর   গ. চাঁদের অমাবস্যা   ঘ. ইবলিশ

৪. উদ্দীপক ও 'রচনা'টির আলোকে নাটকের শ্রেণিকরণ হতে পারে যে ভাবে–
i. পৌরাণিক   ii. ঐতিহাসিক   iii. সামাজিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i   খ. ii   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- 'বহিপীর' নাটকের মঞ্চসজ্জার বর্ণনা করতে পারবেন;
- নাটকের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হাশেম আলি, হাতেম আলি, খোদেজা, তাহেরা ও বহিপীরের পরিচয় ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন;
- বহিপীর নামের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

[হেমন্তের বেলা নয়টা। পানির শব্দ, জাহাজের সিটি-ধ্বনি, তীরে ফেরিওয়ালার হাঁকাহাঁকি, ভাটিয়ালি গানের অতি ক্ষীণ রেশ ইত্যাদির সমবেত কোলাহলের মধ্যে পর্দা উঠলে দেখা যাবে মঞ্চের অধিকাংশ স্থান জুড়ে দু-কামরাওয়ালা একটি রঙদার বজরা। কোণে সামান্য উঁচু পাড়, বজরা থেকে সে পাড়ে যাতায়াতের জন্য একটা সিঁড়ি।

দর্শকের দিকে বজরাটি খোলা। পেছনে জানালাগুলোর অধিকাংশ তোলা, যার ভেতর দিয়ে অপর পারের আভাস ও কিছুটা টানি দেখা যাবে। বজরার সামনে পাটাতনে বসে একটি চাকর মসলা পেষে; একটু দূরে একজন মাঝি আপন মনে দড়ি পাকায়। তারই কাছাকাছি বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা টানে। ছাদে শুকায় একটি রঙিন আলখাল্লা ও পায়জামা।

বড় কামরায় হাতেম আলি চাদরে আধা-শরীর ঢেকে বহিপীরের সঙ্গে কথোপকথন করেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো, মুখে চিন্তার ছাপ। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বহিপীরের বয়স কিছু বেশি কিন্তু মজবুত শরীর। মুখে আধা-পাকা দাড়ি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা।

পাশের ঘরে হাতেম আলির ছেলে হাশেম আলি মোড়ায় বসে বসে তার মা খোদেজা ও তাহেরার তরকারি কোটা দেখে। হাশেম আলি যুবক মানুষ; অস্থির মতি ও একটুতে রেগে ওঠার অভ্যাস। কখনো সে পায়চারি করে, কখনো বসে, কখনো বা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে জানালার ধারে বিছানা পাতা বেঞ্চির ওপর।

তাহেরার বয়স অল্প; মুখে সামান্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। সেটা অবশ্য সব সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকরটিকে মসলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে থেকে আসবে যাবে এটা-সেটা নিয়ে।

পর্দা ওঠার পর হাতেম ও বহিপীরের আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলি ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ]

হাশেম - কী ঝড়ই হল শেষ রাতে! এমন ঝড় কখনো দেখিনি। সময়মতো খালের ভেতর ঢুকতে না পারলে কে জানে কী হতো। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আপনি ভয় পেয়েছিলেন কী?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে কেবল)

খোদেজা - যে মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে, সে অত সহজে ভয় পায় না। কিন্তু আমি এ কথা বুঝি না যে তুমি কী করে পালাতে পারলে। কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কে কখন এমন কথা শুনেছে? (একটু থেমে) পালাবার সময় সত্যিই এ কথা খেয়াল হয়নি যে কোথায় যাব কোথায় থাকব কী করে এমন কাজ করি?

তাহেরা - (আবার মাথা নাড়ে)

খোদেজা - (কাজ করতে করতে) কাল ডেমরার ঘাটে আমরা যদি বজরা না থামাতাম আর বিপদে পড়েছ দেখে তোমাকে যদি তুলে না নিতাম, তবে কোথায় থাকতে এখন, যেতেই বা কোথায়? (উত্তর না পেয়ে) হঠাৎ দেখি তীরে ভিড়। একটা ছেলে কাঁদছে, পাশে অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। চাকরটা এসে বলল, একটি মুসলমান মেয়ে বিপদে পড়েছে।

সঙ্গে একটি ছেলে, সেও ডাকচিৎকার পেড়ে কাঁদছে। তাদের নাকি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই? জানেও না কোথায় যাচ্ছে। শুনে ভিড় জমে গেছে, বদলোকেরা তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে, এক-আধটু ঠাট্টা-মস্করা করতেও শুরু করেছে। (থেমে) কথাটা একবার ভেবে দ্যাখ; আমি তোমাকে ডেকে না পাঠালে কী হতো তোমার?

তাহেরা - (সামান্য হেসে) অত ভাবলে কি কেউ পালাতে পারে?

হাশেম - ছেলেটি কে ছিল?

তাহেরা - চাচাতো ভাই।

খোদেজা - তার কথা সে বলেছে আমাকে। অল্প বয়সের ছেলে, না বুঝে না শুনে ওর কথায় পালানোর সাথী হয়েছিল। কিন্তু ডেমরায় পৌঁছে ছেলেটার হঠাৎ হুঁশ হল; এ কী সে করছে। তখন বলে, পুলিশ এলো, এসে ধরল তাদের। তা ছাড়া ক্ষিধাও পেয়েছে অথচ পয়সা নাই কারও কাছে। ভয়ে আর ক্ষিধায় কাঁদতে লাগল ছেলেটা। (তাহেরাকে) অথচ তুমি মেয়ে হয়েও তোমার চোখে না ছিল ভয়, না ছিল কান্না, শাবাশ মেয়ে তুমি। এমন মেয়েও কারও পেটে জন্মায়, জানতাম না।

তাহেরা - (হেসে) আপনার তো বুড়োর কাছে বিয়ে হয়নি, আপনি কী করে বুঝলেন কেন বা কী করে পালিয়েছি?

খোদেজা - (বিস্ময়ে) কথা শোনো! বুড়োর কাছে বিয়ে হলেই এমন করে পালায় নাকি কেউ? বিয়ে হল তগদিরের কথা। কারও ভালো দুলা জোটে, কারও জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ সবই পায়, কেউ পায় না। তাই বলে পালাতে হয় নাকি? ওটা কত বড় গুনাহ্ তা বোঝো না?

তাহেরা - (মুচকি হেসে, উত্তর না দিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে) নদীতে খালি কচুরিপানা। নদীতে বেগুনি রঙের শাপলা থাকে না, পদ্ম-পলাশ থাকে না। খালি কচুরিপানা, কেবল কচুরিপানা ভেসে যায়।

খোদেজা - না, মেয়েটির চিন্তাভাবনা নাই। সুখেই আছে।

হাশেম - বাড়িতে কে আছে আপনার?

তাহেরা - (একনজর হাশেমের দিকে তাকিয়ে) বাপজান আর সৎমা। যে বুড়ো পীরের সঙ্গে বাপজান আমাকে বিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মুরিদ। অবশ্য আমি না, আমার বাপজান ও সৎমাই তাঁর মুরিদ। বছরে-দুইবছরে পীরসাহেব একবার এলেই তাঁরা তাঁর খাতির-খেদমত করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। (থেমে হঠাৎ রেগে) আমি কি বকরি-ঈদের গরু ছাগল নাকি?

খোদেজা - কী ঢঙের কথাই যে তুমি বলো! পীরের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কোনো খারাপ কথা নয়। (হঠাৎ মনে পড়ায়) ভালো কথা, পীরসাহেব রাতেও খাবেন নাকি, হাশেম?

হাশেম - না। দুপুরে খাওয়ার পরেই চলে যাবেন। আব্বা অনেক বললেন কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। তাঁর নাকি জরুরি কাজ আছে। পীরসাহেবের লেবাসও দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। কাল রাতে মাঝিরা তাঁকে আমাদের বজরায় তুলে না নিলে তিনি হয়তো ডুবেই মারা যেতেন।

খোদেজা - তাঁর নৌকার সঙ্গে বজরার কী করে ধাক্কা লাগল বুঝলাম না।

হাশেম - ঝড়ের সময় বজরা আর নৌকা একই সঙ্গে খালের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে আর হাওয়ার ধাক্কায় মাঝিরা বোধ হয় ঠিক সামাল দিতে পারেনি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটা এক মিনিটে আধা-ডোবা হয়ে গেল। ভাগ্য ভালো, বজরার কিছু হয়নি। মনে হয়, ধাক্কা খাওয়ার আগেই পীরসাহেবের নৌকাটা বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পীরসাহেব আর তাঁর সঙ্গী দুজনেই কিছুটা নাকানি-চুবানি খেয়েছেন।

খোদেজা - কিন্তু আমাদের বজরায় কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে এলো অচেনা-অজানা এই মেয়েটি। তারপর পানিতে ডুবে মরতে মরতে বজরায় উঠে জান বাঁচালেন এক পীরসাহেব।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) এই পীরসাহেব আপনার পীরসাহেব নন তো?

তাহেরা - না। তাঁকে ভালো না দেখলেও তাঁর গলা অনেক শুনেছি। নিশ্চয়ই গলা চিনতাম। তা ছাড়া তিনি হঠাৎ নৌকা করে এদিকে যাবেনই বা কোথায়?

হাশেম - (রসিকতা করে) হয়তো আপনার খোঁজে বেরিয়েছেন।

তাহেরা - (কথাটা ভেবে ভয় পায়; কিছু বলে না।)

খোদেজা - তাহলে তো ভালোই হয়। এই বজরাতেই পীরসাহেব আর তাঁর বিবির মিলন হয়, মাঝখানে থেকে আমরা কিছু সওয়াব পাই।

তাহেরা - (হঠাৎ তরকারি কোটা বন্ধ করে অধীরভাবে সোজা হয়ে বসে) না না, অমন কথা বলবেন না।

খোদেজা - (বিরক্ত হয়ে) না, এমন মেয়ে কখনো দেখিনি, বাবা। বয়স হলেও পীর হল পীর। তা ছাড়া জোয়ান পীর তো দেখা যায় না।

[পাশের ঘর থেকে হাতেম আলি ছেলেকে ডাকেন, হাশেম, হাশেম। হাশেম সেই কামরায় যায়। যাওয়ার সময় দরজা খুলে তাহেরা উঁকি মেরে দেখে, তারপর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তাহেরা আর খোদেজা মাঝে মাঝে আলাপ করবে বটে, কিন্তু এবার তাদের কথার আওয়াজ দর্শকদের নিকট পৌঁছাবে না।]

হাতেম আলি - পাশের ঘরে বসে আছ কেন? পীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করো। (হাশেম দূরে একটা মোড়ায় বসে।) ছেলেটি কলেজে পড়া শেষ করে এখন ছাপাখানা দিতে চায়। বলে, ছাপাখানার ব্যবসা বড় ভালো। আমি কিন্তু অত বুঝি না। শরীরটা আমার ভালো নাই। আমি বলি, কদিন বাঁচি না-বাঁচি ঠিক নাই, যত দিন জিন্দা আছি আমার সঙ্গে থাকো। আমার তো আর ছেলেপুলে নাই। কিন্তু কী বলব, সবই খোদার মর্জি, তাঁর ইচ্ছা বোঝা মুশকিল, কার ভাগ্যে কী আছে তাই বা কে জানে। ধরুন না কেন, আপনার সঙ্গে এইভাবে দেখা হবে এ-কথা কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছি? কে ভেবেছিল হঠাৎ এমন ঝড় উঠবে, খালের ভেতরে ঢোকার সময় আমার বজরার সঙ্গে আপনার নৌকার এমন ধাক্কা লাগবে, যার দরুন আপনার নৌকা আধা-ডোবা হবে? কিন্তু সে যা-ই হোক, আপনার যে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় নাই, তার জন্য খোদার কাছে হাজার শোকর। তা ছাড়া, দুর্ঘটনার সময় আপনাকে আমার বজরায় স্থান দিতে পেরেছি তাতে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করছি।

বহিপীর - সবই খোদার হুকুম। (থেমে) আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়-তো এখনো পাইলাম না।

হাতেম আলি - আমার নাম হাতেম আলি। রেশমপুরে আমার যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। এইটে আমার একমাত্র ছেলে, নাম হাশেম আলি। একটু অস্থির প্রকৃতির, খোদা চাহে-তো মতিগতি ভালোই। সে যা-হোক। কদিন ধরে আমার শরীরটা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না, ভাবলাম, শহরে এসে দাওয়াই করাই। একাই আসতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বিবি সাহেবা আর ছেলেটি একা আসতে দিল না! যাক্, এসেছে ভালোই হয়েছে। (থেমে) আচ্ছা পীরসাহেব, বেয়াদপি মনে না করেন তো একটি সওয়াল করি। আপনার নাম বহিপীর কী করে হল?

বহিপীর - আপনি লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কী করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তা ছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে। মনে হয়, তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার

মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।

হাতেম আলি - আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নাই। একটা কথা পীরসাহেব, দুর্ঘটনায় আপনার যাত্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? আপনি কি এই শহরেই আসছিলেন?

বহিপীর - (ইতস্তত করে) ব্যাঘাত? হ্যাঁ ব্যাঘাত কিছু ঘটিয়াছে বৈকি। তবে অতি নিকটেই কোথাও আমাকে যাইতে হইবে। একটু দেরি হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। খাওয়া-দাওয়ার পরই হকিকুল্লাহ্ মজবুত দেখিয়া একটি নৌকা ঠিক করিয়া লইবে, তারপর আবার রওয়ানা হইয়া পড়িব। জানে বাঁচিয়া আছি ইহাই যথেষ্ট। খোদার ভেদ বোঝা সত্যই মুশকিল। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটাইলেন, মরিতে মরিতে কেন আবার বাঁচিয়া রহিলাম আর আপনার বজরাতেই কেন বা আশ্রয় পাইলাম, তাহা তিনিই জানেন। কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নিশ্চয় ইহাতে কোনো গূঢ়তত্ত্ব আছে, যাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। আশা করি শরীর খারাপ হইবে না। কত আর ছোটাছুটি করিতে পারি। বয়স-তো হইয়াছে। একেকবার ভাবি, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, কেবল মুরিদান করিয়াই জীবন কাটাইয়াছি। মুরিদ হওয়ার জন্য লোকেরা দলেবলে আসিয়াছে, কেহ কাঁদিয়াছে, কেহ ধনসম্পদ উজাড় করিয়া আমার পায় ঢালিয়া দিয়াছে। তাহারাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমাকে কোনো অবসর দেয় নাই, এবাদত করিবার ফুরসত দেয় নাই। সারা জীবন কেবল মুরিদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছি, কখনো ফল পাইয়াছি কখনো পাই নাই, সবই খোদার ইচ্ছা। কিন্তু এখনো সময় আছে। মধ্যে মধ্যে ভাবি, সমস্ত ছাড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়ি যেই দিকে দুই চোখ যায়, সেই দিকে পা দুইটা আমাকে লইয়া যায়।

হাতেম আলি - হয়তো খোদা তা চান না।

বহিপীর - হয়তো।

খোদেজা - (পাশের ঘর থেকে) হাশেম! (এক ডাকেই হাশেম উঠে সেই কামরায় যায়)।

[এখন সে, কামরারই কথাবার্তার আওয়াজ দর্শকের কাছে পৌঁছাবে; বহিপীর ও হাতেম আলি হাত-মুখ নেড়ে কথা বলতে থাকবে বটে, কিন্তু সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

খোদেজা - মেয়েটি দ্যাখ কেমন করছে। তুই যখন পাশের কামরায় যাচ্ছিলি, তখন খোলা দরজা দিয়ে পীরসাহেবকে সে দেখেছে। ওর সন্দেহ হচ্ছে, তিনিই সেই পীর।

তাহেরা - (তরকারি কোটা ছেড়ে সোজা হয়ে বসে) তিনি কে?

হাশেম - তাঁর নাম বহিপীর, তিনি এদিককার লোক নন; উত্তরে সুনামগঞ্জে তাঁর বাড়ি।

তাহেরা - (সভয়ে আপন মনে) ইনিই তিনি, বহিপীর। যিনি বইয়ের ভাষায় কথা বলেন। বাপজান আর সৎমা যাঁর মুরিদ আর যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। (থেমে) তিনি আমার খোঁজে বেরিয়েছেন।

[হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে পানি দেখে।]

হাশেম - আম্মা! উনি কী করছেন ওখানে?

তাহেরা - (এদের দিকে ঘুরে বিস্ফারিত চোখে) খবরদার! আমার কাছে কেউ আসবেন না, এলেই আমি পানিতে ঝাঁপ দেব। আমি সাঁতার জানি না, পানিতে ডুবে মরব।

খোদেজা - (চিৎকার করে) অরে, এই মেয়েটা পাগলি দেখছি! কী বলে সে।

হাশেম - আম্মা চিৎকার করবেন না, পাশের ঘরে পীরসাহেব শুনবেন। তিনি এখনো জানেন না যে তাঁর বিবি এখানেই আছেন।

তাহেরা - (ব্যঙ্গ করে) তাঁর বিবি। বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।

হাশেম - দেখুন, আপনি ওখান থেকে সরে আসুন। আপনার কোনো ভয় নেই। আপনার কথা পীরসাহেব জানেন না, জানবেনও না আর খেয়েদেয়ে দুপুরেই তিনি চলে যাবেন।

তাহেরা - (হঠাৎ নেবে বসে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। মনে হবে অনেকক্ষণ কাঁদবে কিন্তু শীঘ্রই চোখ মুছে শান্ত গলায়) আমাকে যখন আশ্রয় দিয়েছেন, তখন আর এইটুকুও আমার জন্য করুন, তাঁকে আমার কথা বলবেন না।

হাশেম - না না। কেউ বলবে না।

খোদেজা - হাশেম, সে কেমন কথা। পীরসাহেবকে না বলে কী করে পারি? তার সঙ্গে না গেলে কোথায় যাবে মেয়েটা, কে দেখবে তাকে?

হাশেম - আম্মা। এখন তো একটু চুপ করুন।

তাহেরা - আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। ডেমরা ঘাট থেকে তুলে নিয়ে বজরায় আশ্রয় দিয়েছেন। দয়া করে আরেকটু করুন। কারণ, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মরব, তবু যাব না। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না।

হাশেম - (হঠাৎ জোর দিয়ে) দেখুন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি, পীরসাহেবের সঙ্গে আপনাকে ফিরে যেতে হবে না।

খোদেজা - তুই আবার এর মধ্যে অত লম্বা-চওড়া কথা বলিস কেন? তোর বাপ ফিরে আসুন, তিনি বুঝে-শুনে যা-ই করতে বলবেন তা-ই করা হবে। (পাশের ঘর থেকে পীরসাহেব ডাকেন, হাশেম মিঞা) ঐ যে পীরসাহেব তোকে ডাকছেন। গিয়ে দ্যাখ, তাঁর কী চাই। তা ছাড়া এ ঘরে তোর অত ঘুরঘুর করার কী প্রয়োজন? মেয়েটারও যেন একটু লজ্জা-শরম নাই। থাকলে কী এমন করে পালাতে পারে?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

উপযুক্ততা– যোগ্যতা। **কথোপকথন–** বাক্যালাপ; আলোচনা। **খেদমত–** সেবাযত্ন; পরিচর্যা। **পীর–** মুসলিম দীক্ষাগুরু। **ফুসরত–** অবসর; অবকাশ। **বহিপীর–** বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে খেতাব প্রাপ্ত। **বিস্ফারিত–** বিস্তারিত, প্রসারিত। **বজরা–** কাঠের কামরা ও ছাদযুক্ত বৃহৎ নৌকা বিশেষ। **ভাটিয়ালি–** লোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। **মুরিদ–** পীরের শিষ্য। **যৎকিঞ্চিৎ–** সামান্য। **সওয়াল–** প্রশ্ন করা; জেরা। **সমবেত–** একত্রিত; যৌথ।

সারসংক্ষেপ :

এই পাঠটিতে পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সমাজে বিরাজিত কুসংস্কারের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলি দুই কামরা বিশিষ্ট বজরা নিয়ে শহর থেকে ফেরার পথে ঝড়ে একটি আধডোবা নৌকা থেকে সুনামগঞ্জের বহিপীর ও তার সাগরেদ হকিকুল্লাহকে আশ্রয় দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। বইয়ের ভাষায় কথা বলেন বলে সকলে তাকে বহিপীর বলে ডাকে। এদিকে ডেমরার ঘাট থেকে জমিদার-পত্নী খোদেজা ও তার পুত্র হাশেম তাহেরা নামের মাতৃহীনা এক বালিকাকে বজরায় আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেন। তাহেরার পিতা ও সৎমা বহিপীরের মুরিদ হওয়ায় তার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বহিপীরের সাথে তাকে বিয়ে দেয়। কিন্তু তাহেরা বিয়ের পর অল্পবয়সী এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে গৃহত্যাগ করে বিড়ম্বনার শিকার হয়। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে খোদেজা বজরায় তোলে এবং তার পলায়নের উদ্দেশ্য জানতে চায়। কারণ শুনে তিনি তাহেরাকে পীর-স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। অন্যদিকে জমিদার ও বহিপীর দুজনেই তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য একে-অন্যের কাছ থেকে গোপন করেন। ঘটনাক্রমে তাহেরা ও বহিপীর যখন বুঝতে পারেন যে একই বজরায় তারা দুজন অবস্থান করছেন, তখন তাহেরা নদীতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। আর হাশেমও নিজের মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে তাহেরাকে পীরের কাছ থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ‘কী ঝড়ই হল শেষ রাতে!’ –উক্তিটি কে করেছে?

ক. হাশেম আলি খ. হাতেম আলি

গ. বহিপীর ঘ. হকিকুল্লা

৬. ‘আমি কি বকরী-ঈদের গরু-ছাগল না কি?’ বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. আনন্দ খ. ঘৃণা গ. অভিমান ঘ. প্রতিবাদ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পারলৌকিক মুক্তির আশায় তথাকথিত পীর নামক বয়স্ক পরগাছা শ্রেণির লোকের হাতে আপন কন্যাকে তুলে দেয়। এই মেয়েরা কেউ বিয়েতে মত না দিলেও আজীবন পীরের সংসার করে। কেউবা পালিয়ে বাঁচে।

৭. উদ্দীপকের কন্যার সঙ্গে ‘বহিপীর’ নাটকে কার মিল পাওয়া যায়?

ক. তাহেরা খ. খোদেজা

গ. যাহেরা ঘ. মোমেনা

৮. উদ্দীপক ও তাহেরার পিতার বিয়ের সিদ্ধান্তে যে বিষয়টি কাজ করেছে–

i. দরিদ্রতা ii. সংস্কারাচ্ছন্নতা iii. জমিদারের নির্দেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. iii ঘ. ii ও iii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাতেম আলির জমিদারির বেহাল অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বহিপীর ও তাহেরার বিবাহের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- খোদেজা (মা) ও হাশেম আলির (ছেলে) কথোপকথনের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

বহিপীর - হাশেম বাবা–। ও হাশেম মিঞা!

হাশেম - (গলা উঁচিয়ে) এই যে আসছি পীরসাহেব। (তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, ছেলে হয়েও আপনার সঙ্গে কোনো দিন এত কথা বলি নাই বা মুখের ওপর জবাব দিই নাই। কিন্তু এখন সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেছে। কাজেই আমাকে বলতেই হচ্ছে। আম্মা, শোনেন আমার কথা। পথ থেকে একটা বিপন্ন মেয়েকে তুলে নিয়েছেন। ভুল করে হোক আর যা-ই করে হোক, তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন-সেটা একটি মেয়ের পক্ষে সোজা কথা নয়। আপনি বুঝতেই পারেন তাঁর মনের অবস্থা আপনার আমার মতো নয়। হলে কি তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের হাতে নিজের জান দেওয়ার কথা বলতেন? তা ছাড়া, ডেমরার ঘাটে তাঁকে বিপন্ন অবস্থায় দেখে আপনার মনে যখন মমতা জেগেছিল, তাঁকে না চিনে, না জেনেও যখন নিজের বজরায় তুলে নিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতি আপনার কি একটু দায়িত্বও নেই? আম্মা, তাঁকে এখন আর কোনো কথা বলবেন না; একটু সবুর করে থাকুন। উনি যদি সত্যি হঠাৎ পানিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি কি একা তাঁকে ঠেকাতে পারবেন?

খোদেজা - (বিস্ময়ে) তুই কী চাস? পীরসাহেবের বিবিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

হাশেম - আমি বরঞ্চ পাশের ঘরে যাই, পীরসাহেব বারবার ডাকছেন।

[দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে যায়। খোদেজা কয়েক মুহূর্ত নত মুখে বসে থাকা তাহেরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার রান্নায় হাত দেন।]

বহিপীর - এমন জোয়ান-মর্দ ছেলে, মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকিবার অভ্যাস কেন?

হাশেম - রান্নাবান্না হচ্ছে, একটু সাহায্য করছিলাম। কেন ডাকছিলেন?

বহিপীর - বিশেষ কিছু না। ভাবিতেছিলাম, আপনার হইল কী। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন না তো?

হাশেম - কী করে নিরুদ্দেশ হই? পানিতে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লে ওই কামরা থেকে তো আর পালানো যায় না।

বহিপীর - উত্তম কথা, উত্তম কথা!

হাশেম - উত্তম কথা, কেন বলছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - না না উহা একটি কথার কথা, কিন্তু যে জন্য ডাকিয়াছিলাম। আরে, তাই তো কী জন্য ডাকিলাম তাহা আর মনে পড়িতেছে না। বোধ হয়, একাকী বসিয়া বসিয়া ভালো লাগিতেছিল না। সর্বদা ওয়াজ-নছিহত করিবার অভ্যাস, কাহারও সঙ্গে কথা না কহিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না। তা ছাড়া একাকী চুপচাপ বসিয়া থাকিলে মনে অশান্তি হয়। সে কথা যাক। আপনার আব্বা ফিরিতে এত দেরি করিতেছেন কেন?

হাশেম - (পাড়ের দিকে তাকিয়ে) এই যে তিনি ফিরেছেন।

[হাতেম আলি অতি ধীর পায়ে প্রবেশ করেন, তাঁর মুখ চিন্তাভাবাচ্ছন্ন। তাঁকে আরও দুর্বল দেখায়, লাঠি হাতেই তিনি তফাতে বেঞ্চির ওপর বসে নীরব হয়ে থাকেন।]

হাশেম - আব্বা! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

বহিপীর - (হাতেম আলি কোনো উত্তর না দেয়ায়) খোদা না করুন, কোনো দুঃসংবাদ নাইতো জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - (মুখ তুলে চেয়ে) দুঃসংবাদ? না, দুঃসংবাদ আর কী? তবে অসুস্থ শরীরে চলাফেরা করায়ও একটু হয়রান বোধ করছি। হাশেম, আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও।

[হাশেম ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে নিজেই কলসি থেকে পানি ঢালে।]

খোদেজা - পানি কার জন্য, হাশেম?

হাশেম - আব্বার জন্য, তাকে অত্যন্ত হয়রান দেখাচ্ছে।

খোদেজা - কেন হয়রান দেখাচ্ছে? কী হয়েছে তাঁর? ডাক্তার কী বলল হাশেম?

হাশেম - (দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যেতে যেতে) এখনো জানি না।

হাতেম আলি - (পানি পান করে) হাশেম, আমি পীরসাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, তুমি পাশের ঘরে যাও।

হাশেম - (অধীর হয়ে) কী এমন কথা আপনি পীরসাহেবকে বলবেন আমি শুনতে পারি না?

হাতেম আলি - হাশেম।

বহিপীর - যাও বাবা, বাপের মুখের ওপর কথা কহিও না।

[হাশেম গ্লাস তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়, গিয়ে সটান বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। খোদেজা উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করে কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হাতেম আলি - (মেঝের দিকে চেয়ে) পীরসাহেব, আমার মাথার ওপর হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে; চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। আমার পায়ের তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।

বহিপীর - কী ব্যাপার, খুলিয়া বলেন। আমাকে বলিতে দ্বিধা করিবেন না।

হাতেম আলি - আপনার বহুত মেহেরবানি পীরসাহেব, যে আপনি দুঃখের কথা শুনতে চাবেন, তাতে একটু ভরসা পাচ্ছি। আপনাকে বলে মনের চিন্তা হয়তো লাঘব হবে, হয়তো আপনি আমাকে একটু পথও বাতলে দিতে পারবেন। সত্যি আমি কোনো পথ দেখছি না। এখন কী করে যে নিজের পরিবারের কাছে আর দেশের দশজনের কাছে মুখ দেখাব, জানি না।

বহিপীর - খোদা যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন, আজই তাহার আরেকটি প্রমাণ হাতেনাতে পাইয়াছি। আপনি দিল খুলিয়া সমস্ত কথা আমাকে বলেন।

হাতেম আলি - প্রথমে একটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে মাফ চাই। আমি আপনার কাছে একটা ঝুট কথা বলেছি। বলেছি, আমার শরীর অসুস্থ, দাওয়াই করার জন্য শহরে এসেছি। সে কথা সত্যি নয়, তবে চিন্তায় কদিনে এত কাহিল হয়ে পড়েছি যে রোগশয্যায় আছি বলেই মনে হয়। শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই যেন। কিন্তু পীরসাহেব, অসুখের ভান না করে আমার উপায় ছিল না। ব্যাপারটা গোপন রাখব ভেবেই অসুখের ভান করেছিলাম। মুখে দুশ্চিন্তার যে ছায়া পড়েছিল সে দুশ্চিন্তার যুক্তিসঙ্গত কোনো উত্তর ছিল না। ওরা যখন সঙ্গে আসতে চাইল অসুখের কথা শুনে, তখন জোর করে না-ও করতে পারলাম না। একবার ঝুট কথা বললে উপায় নেই, তখন একটার পর একটা বলতে হয়; একবার শুরু হলে তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সবকিছু শেষ হয়েছে, আসল কথাটা আর মিথ্যা কথা দিয়ে ঠ্যাকা দেওয়া যায় না।

বহিপীর - খোদা ইচ্ছা করিলে পড়ন্ত ঘরও ঠ্যাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়। ভালোমন্দ খোদারই হাতে। বলেন জমিদার সাহেব, বলেন কী ব্যাপার।

হাতেম আলি - আপনাকে বলেছি রেশমপুরে আমার কিঞ্চিৎ জমিদারি আছে। একসময়ে এই জমিদারের নাম ডাক ছিল, তার আয়ও ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই সুদিন আমার জমানার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার হাতে যে জমিদারিটা এলো তা কেবল ঢাকের ঢোল বাজালে আওয়াজ হয়, কিন্তু ভেতরে অন্তঃসারশূন্য, দেখতে বড় কিন্তু ভেতরে ফাঁকা। তবু তা থেকে যৎসামান্য যা আয় হয়ে উঠত তাই দিয়ে কোনো প্রকারে মানমর্যাদা রেখে ভরণপোষণ চলত। কিন্তু সে জমিদারিও সান্ধ্য আইনে পড়ে নিলামে উঠতে বসেছে। কালই নিলামে উঠবে।

বহিপীর - সবই খোদার ইচ্ছা, খোদাই দুনিয়ার মালিক।

হাতেম আলি - আমার আশা ছিল, আমি কোনো প্রকারে যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারব, শেষ পর্যন্ত জমিদারি নিলামে চড়াটা বন্ধ করতে পারব। সে আশা নিয়েই আমি শহরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিন আমাকে সাহায্য করবেন, সেখানে আমাকে নিরাশ হতে হল। আনোয়ারউদ্দিন বলে দিলে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন না। পীরসাহেব, জমিদারি আর বাঁচানো যাবে না, এবার সে জমিদারি যাবেই! আমি দেউলে হব, আমার পরিবার দেউলে হবে; আমার সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে। (থেমে) আর কথাটা লুকিয়ে রাখি কী করে? এবার আমি কীই বা করি! (থেমে) আমার ছেলেটি কত আশা করেছিল যে তাকে ছাপাখানা কেনার টাকা দেব, এবার তার সাধের স্বপ্নও ভাঙবে।

বহিপীর - আহা জমিদার সাহেব, এত বেচইন হইয়া পড়িবেন না, খোদার উপর তোয়াক্কল রাখুন। দুনিয়াটা মস্ত এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। খোদা কাকে কীভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হাতেম আলি - (হঠাৎ রেগে) পরীক্ষা? কিসের পরীক্ষা। আমি কী অন্যায় করেছি, আমার বিবি সাহেব ও আমার ছেলেই বা কি অন্যায় করেছে?

বহিপীর - জমিদার সাহেব। দুঃখে সংবিৎ হারাইবেন না।

হাতেম আলি - (নাক ঝেড়ে ক্রন্দন সম্বরণ করে) না না মানসম্মান সম্পত্তি সবই যখন গেল তখন কী আর মাথা হারালে চলে? ভাববার বুঝবার শক্তিও যদি যায়, তবে থাকবে কী, কিন্তু আমার মনে শক্তি কোথায়? পীরসাহেব, এবার আমি কী করব?

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন জমিদার সাহেব। এই মুহূর্তে ইহা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কিন্ত আপনাকেও আমার একটি জরুরি কথা বলার আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার এই নিদারুণ বিপদের সময়ই আমাকে এই কথা বলিতে হইতেছে। যদি পারেন, একটু মনোযোগ দিয়া আমার কথা শ্রবণ করুন।

হাতেম আলি - (নিস্তেজ গলায়) বলুন!

বহিপীর - শীঘ্রই শেষ করিব, দেরি হইবে না বলিতে। গোড়া হইতে বলি। আপনি যেমন আমার নিকট হইতে একটি কথা লুকাইয়াছেন, তেমনি আমি একটি কথা আপনার নিকট হইতে লুকাইয়াছি। আমার এই যাত্রার আসল উদ্দেশ্য আপনাকে বলি নাই, আমার উদ্দেশ্য এখন হাসিল হইয়াছে, তাই বলিতে তো বাধা নাই। উপরন্তু আপনি ব্যাপারটার সহিত জড়িত আছেন বলিয়া আমাকে বলিতেই হইবে। না হইলে আপনার এই দুঃখের সময় কথাটা পাড়িতাম না।

হাতেম আলি - আমি জড়িত? কীভাবে পীরসাহেব?

বহিপীর - অতি আশ্চর্য; কিন্তু উহা সত্য ব্যাপারটা হইতেছে এই; গত জুম্মা রাতে তাহেরা বিবি নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার শাদি মোবারক সম্পন্ন হয়। তিনি আমার এক পেয়ারা মুরিদের কন্যা। অত্যন্ত হাউস করিয়া তিনি আমার সহিত তাঁহার কন্যার শাদি দিয়াছিলেন। তিনিই কথা পাড়িয়াছিলেন। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, নেক পরহেজগার মানুষ: বিষয়-আশয় তেমন না থাকিলেও বংশ খান্দানি। আমারও বয়স হইয়াছে, দেখভাল করিবার জন্য আর খেদমতের জন্য একটি আপন লোকের প্রয়োজন আছে। আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। আমি পুনর্বার শাদি না করিয়া খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমতই করিয়াছি। আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এক হকিকুল্লাহ্ আছে। কিন্তু সে আর কত

করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিবাহের রাতেই এ অত্যাশ্চর্য ইসানে গায়ের-মামুলি কাণ্ড ঘটিল। আমার বিবি যাঁহাকে তখনো আমি দেখি নাই-একটি নাবালেগ চাচাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। বাড়িতে হুলস্থুল পড়িল। আমার মুরিদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম যে তাঁহার ইহাতে কোনো কসুর নাই, তাঁহার কন্যার ব্যবহারের জন্য তাহাকে দোষারোপ করা যায় না, অবশ্য তাহার যে দোষ নাই সে কথা বলাও সঠিক হইবে না। পুত্র-কন্যার শিক্ষাদীক্ষার ভার পিতা-মাতার উপরেই। সে শিক্ষাদীক্ষার গাফিলতি হইলে দোষটা পিতামাতার ঘাড়েই পড়ে। সে কথা যাক। আমার মুরিদ অধীর হইয়া পুলিশে পর্যন্ত খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মত দিলাম না। পুলিশ নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা; উহা কে-ই বা চায়। আমি বলিলাম, আমিই খুঁজিতে বাহির হইব। সেই রাতেই হকিকুল্লাহ্‌কে সঙ্গে করিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক পথই ধরিয়াছিলাম এবং এতক্ষণ তাঁহাকে ধরিতেও পারিতাম যদি কদমতলা না গিয়া ডেমরা যাইতাম, কিন্তু কী বলিব, ভুলটা খোদাই শোধরাইয়া দিলেন আপনার বজরার সঙ্গে আমার নৌকার সংঘর্ষ ঘটাইয়া। কারণ, ডেমরার ঘাট হইতে আপনি আমার বিবিকে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন তিনি পাশের কামরাতেই অবস্থান করিতেছেন।

হাতেম আলি - পাশের ঘরে? আহ্! আমার মাথাটার কী হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়ে তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কাল ডেমরার ঘাটে আমার বিবি একটি মেয়েকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আপনার বিবি?

বহিপীর - সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি জানেন তিনি কে, কোথায় বাড়ি কী তাঁর নাম?

হাতেম আলি - জি না। মনের চিন্তায় ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হয়নি।

বহিপীর - হুঁ। না, আমার মনে কোনোই সন্দেহ নাই যে যাঁহাকে আপনারা কাল ডেমরার ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়াছেন তিনিই আমার পলাতকা বিবি। কিন্তু তবু সাবধানের মার নাই। কথাটা একটু গওর করিয়া দেখুন। শুনিতেছেন তো জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (একটু ঘুরে বসে বহিপীরের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে) মনে শান্তি নাই পীরসাহেব, কিন্তু শুনছি আপনার কথা।

বহিপীর - যাহা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কখনো দেখি নাই। আপনারাও তাঁহাকে চেনেন না। তিনি ঘর ছাড়িয়া আমার ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছেন। কাজেই আমি বলা মাত্র তিনি যে সুড়সুড় করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবেন, সে কথা ভাবা অনুচিত হইবে। সুযোগ পাইলে তিনি আমাকে ফাঁকি দিবার ফন্দি-ফিকির নিশ্চয়ই বাহির করিবেন। অতএব, তিনি যদি আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন তাহা হইলে প্রমাণাদি ব্যতীত তাহাকে আমার বিবি বলিয়া দাবি করা মুশকিল হইতে পারে। আপনার এখানে তিনি একাই আছেন, তাহার চাচাতো ভাইটি নাই। সে থাকিলে কোনো চিন্তা ছিল না। সেই নিশানাটি হারাইয়াই তো মুশকিল হইয়াছে। তবে একটা ভরসা। বলিলে নিজেরই ক্ষতি হইবে জানিয়াও স্ত্রীলোক কখনো পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষ করিয়া আপনাদের সঙ্গে আমার যখন কোনোই যোগাযোগ ছিল না, তখন হয়তো বা তিনি আপনার স্ত্রীর নিকট নিজের আত্মপরিচয় ঢাকিয়া রাখেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সন্দেহ না জানাইয়া সে কথাটা প্রথমে যাচাই করিয়া লইতে চাই। আপনার ছেলে সে ঘরেই বড় বেশি ঘুরঘুর করিতেছে। সেও জানিয়া থাকিতে পারে। প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? জমিদার সাহেব! অত বেহুঁশ হইয়া পড়িলে কি হইবে?

হাতেম আলি - (জেগে উঠে) না না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছি কোথায়। বলুন পীরসাহেব।

বহিপীর - (সুর বদলে) ধৈর্যহারা হইবেন না জমিদার সাহেব। দুনিয়াটা সত্যি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। কিন্তু দেখিতেছেন না এই বজরাতে ভাগ্যের কেমন অত্যাশ্চর্য লীলাখেলা চলিতেছে? ইহা সবই খোদার ইঙ্গিতে হইতেছে। আপনি বুকে সাহস ধরুন; আপনার সমস্যারও সমাধান হইবে! জমিদার সাহেব, আপনার ছেলেকে একটু ডাকিবেন?

হাতেম আলি - জি। হাশেম! (পাশের কামরা থেকে উঠে ক্ষিপ্রগতিতে হাশেম এ কামরায় এসে হাজির হয়) হাশেম। পীরসাহেব তোমাকে ডেকেছেন।

বহিপীর - বাবা হাশেম, তোমাকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। কাল ডেমরার ঘাটে একটি বিবাহিতা তরুণীকে বিপন্না অবস্থায় দেখিয়া তোমাদের বজরায় ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছ। তাঁহার পরিচয় কি তিনি তোমাদের বলিয়াছেন।

হাশেম - (ইতস্তত করে) বোধ হয় বলেছেন। আমি ঠিক জানি না।

বহিপীর - তাঁহার পরিচয় জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি ভিতরে যান, আর কথায় কথায় তাঁহার পরিচয় জানিয়া লউন। আমি যে জানিতে চাই তাহা অবশ্য বলিবেন না।

হাশেম - জি আচ্ছা। (হাশেম ভেতরে যায়, গিয়ে দরজা ধরে চুপচাপ ভাবিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে।)

খোদেজা - হাশেম, কী হয়েছে তোর আব্বার?

হাশেম - কিছু বুঝতে পারছি না। আব্বা পীরসাহেবের সঙ্গে কী আলাপ করলেন তাও জানি না। কিন্তু এখন তিনি ওঁর (ইঙ্গিতে তাহেরাকে দেখিয়ে) পরিচয় জানতে চান। তার অর্থ হল এই যে, তাঁর কথা তিনি সঠিকভাবে পুরোপুরি জানেন না। (ভেবে) ব্যাপারটা বুঝেছি। (হঠাৎ মাথার কাছে উবু হয়ে বসে) আম্মা! পীরসাহেব তাঁকে কখনো দেখেননি। তিনিই যে তাঁর বিবি সে কথাও ঠিক জানেন না। একটি মেয়েকে ডেমরার ঘাট হতে তুলে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে কথাই শুধু জানতে পেরেছেন। যদি আমরা তাঁকে তাঁর সঠিক পরিচয় না বলি, তবে তিনি জানতেই পারবেন না যে তিনিই তাঁর বিবি। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে পীরসাহেবকে তাঁর পরিচয় বলি না।

খোদেজা - হাশেম। এ কী করে সম্ভব! তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি? এই মেয়েটা তোর মাথা খেলো নাকি?

হাশেম - (উঠে দাঁড়িয়ে) মাথা খাবে কেন? কিন্তু আমরা কি তাঁকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি না? আপনি এই কথা বুঝতে পারছেন না যে আমরা যদি তাঁকে সাহায্য না করি তবে তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আম্মা, আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি যে তিনি আমাদের তাঁর আত্মপরিচয় দেননি। আমরা জানি না কোথায় তাঁর বাড়ি, কী তাঁর নাম।

খোদেজা - হাশেম। তোর হয়েছে কী? কী চাস তুই?

হাশেম - (দ্রুত মাথা নেড়ে) না, আমি কিছুই চাই না। শুধু তাঁকে বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।

খোদেজা - যার সঙ্গে পীরসাহেবের ন্যায্যমতো বিয়ে হয়েছে তাকে তুই বাঁচাবার কে?

হাশেম - আম্মা! আমি তাঁকে বাঁচাবই। তাঁকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাব। আম্মা শুনছেন।

খোদেজা - তুই কি সত্যিই এই চাস যে পীরসাহেবের বদ্‌দোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দিই? পীরের দোয়ার জন্য মানুষ কি-না করে আর তুই একটি অচেনা-অজানা মেয়ের জন্য সজ্ঞানে মাথায় বদ্‌দোয়া ডেকে নিবি? না, আমিই বলব। তুই যদি না বলিস তবে আমিই নিজেই বলব। (ক্ষিপ্রভঙ্গিতে উঠে পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) পীরসাহেব, আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।

হাশেম - আম্মা।

বহিপীর - শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ!

[তাহেরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। হাশেম বিস্ময়াভিভূত। শুধু জমিদার সাহেব নিস্তেজভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।]

[পর্দা নামবে]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অন্তঃসারশূন্য– সারবস্তু নেই এমন। **জমিদার–** ভূস্বামী; জমির মালিক। **তোয়াক্কা–** পরোয়া; প্রত্যাশা। **নিরুদ্দেশ–** উদ্দেশ্যহীন; অজ্ঞাত। **বিপন্ন–** বিপদগ্রস্ত; বিপর্যয়। **বিস্ময়াভিভূত–** বিস্ময়ে বিহ্বল। **সম্বরণ–** নিবারণ; দমন। **সমীচীন–** সঙ্গত; উচিত; যথার্থ। **ক্ষিপ্রগতি–** দ্রুতগামী; বেগবান।

সারসংক্ষেপ :

জমিদার হাতেম আলি নিজের চিকিৎসার জন্য আসেননি, তিনি মূলত তার জমিদারির নিলাম ঠেকাতে শহরে এসেছেন। কিন্তু তিনি তা এতদিন গোপন রেখেছিলেন। শহরে এসে কোনোভাবে টাকা জোগাড় করতে না পারায় সান্ধ্য আইনে জমিদারির নিলাম নিশ্চিত হয়ে যায়। এমতবস্থায় হাতেম আলি জমিদারি হারানোর আশঙ্কায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। হাতেম আলি পুরো বিষয়টি পীরসাহেবকে জানান। একইভাবে পীরসাহেবও তাঁর আগমনের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে পীরসাহেব তাহেরার সঙ্গে তার বিয়ের ঘটনা ও পালানোর বিষয়টি জমিদারকে জানান। পীর সাহেব অনুমান করছেন পাশের ঘরে অবস্থান করা তাহেরাই তাঁর স্ত্রী এবং এ-বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাশেমকে ডেকে তাহেরার পরিচয় জানানোর জন্য বলেন। হাশেম তার মা খোদেজাকে তাহেরার প্রকৃত পরিচয় পীরসাহেবকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করে এবং প্রয়োজনে বিয়ে করে হলেও তাহেরাকে বাঁচানোর কথা বলে। কিন্তু খোদেজা একথা শুনে দরজার কাছে গিয়ে পীরসাহেবকে বলেন– "আপনার বিবি আমার সঙ্গেই আছেন।" পীরসাহেব তা শুনে বলেন– "শোকর আল্‌হামদোলিল্লাহ।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. পড়াশোনা শেষ করে হাশেম আলি কী করতে চায়?

ক. স্কুল করতে চায় খ. এনজিও প্রতিষ্ঠা করতে চায়

গ. ছাপাখানা দিতে চায় ঘ. তাহেরাকে বিয়ে করতে চায়

১০. হাতেম আলির আশা ছিল বাল্যবন্ধু আনোয়ার তাকে–

i. জমিদারী কিনে দেবে ii. সাহায্য করবে iii. বজরাটি কিনে নিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ষাট বছরের কেরামত মওলা রূপালিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেন। বিয়ের রাতেই রূপালি তার পছন্দের ছেলে সনেটকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রূপালির বাবা থানা-পুলিশ করতে চাইলে কেরামত মওলা নিষেধ করেন।

১১. উদ্দীপকের কেরামত মওলা 'বহিপীর ' নাটকে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে খ. বিধবা বিবাহে

গ. কিশোরী বিবাহে ঘ. সম্মতির বিবাহে

১২. উদ্দীপকে কেরামত মওলা ও বহিপীর চরিত্রে যে বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে–

i. মানবিকতায় ii. বাস্তবজ্ঞানে iii. বিচক্ষণতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাতেম আলির মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণ লিখতে পারবেন;
- তাহেরার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- তাহেরার প্রতিবাদী চরিত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

দ্বিতীয় অঙ্ক

[স্টেজ পূর্ববৎ, কিন্তু বজরাটা ছাড়া সবকিছু রাতের অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে ছিটেফোঁটা তারা।]

দুই কামরাতেই লণ্ঠন জ্বালানো আছে। বাইরের ঘরে মোড়ার ওপর স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে হাতেম আলি। চোখের পাতা পড়ে না; দৃষ্টি ভাবনায় নিমজ্জিত। বেঞ্চিতে চাদর গায়ে বসে বহিপীর তসবি টেপেন আর ঘন ঘন ভেতরে দরজার দিকে তাকান। তাঁর পরনে রঙিন আলখাল্লা আর পায়জামা।

পাশের কামরায় হাশেম অস্থিরভাবে পায়চারি করে। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোনাজাত করে নামাজ শেষ করে খোদেজা পান বানাতে বসেন। ওধারে বেঞ্চিতে পিঠ খাড়া করে বসে তাহেরা; তার নড়ন-চড়ন নেই আর দৃষ্টি মেঝের ওপর নিবদ্ধ।

বাইরে আবছায়ার মধ্যে বসে হকিকুল্লাহ হুঁকা খায়। একটু দূরে চাকরটি আর মাঝি দুজন আধ-শোয়া অবস্থায় গাল-গল্প করে।]

হাতেম আলি - সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটল আশায় আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। ভেবেছিলাম, সাহায্য করতে পারবে না বলে থাকলেও চিরদিনের বন্ধুত্বের খাতিরে শেষে কোনো প্রকারে টাকা জোগাড় করে বাল্যবন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আসবে। কিন্তু সে এলো না। (থেমে) আর একটা রাত। এত দিনের পুরনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষ রাত। তাদের এখনো বলতে পারিনি! এখনো কি মনে আশা আছে? আর কিসের আশা?

বহিপীর - (কিছুটা বিরক্তভাবে) খোদার কথা খেয়াল করুন জমিদার সাহেব। বিলাপ করিয়া কী হইবে?

হাতেম আলি - তাই। বিলাপ করে কী আর হবে। তাতে রাতের গায়ে তো আর আঁচড় পড়বে না, অন্যান্য রাতের মতো এই রাতও একসময়ে শেষ হয়ে যাবে। যাক যাক, শেষ হয়ে যাক।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) হাশেম বাবা ফিরে না কেন?

হাতেম আলি - (হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সামান্য রুক্ষতার সঙ্গে) পীরসাহেব, আপনি আছেন আপনার খেয়ালে। এক বিবি গেলে আপনি আরেক বিবি আনতে পারেন। কিন্তু আমার জমিদারি একবার গেলে আর ফিরে আসবে না? একবার সর্বস্বান্ত হলে আমি আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। এখন আমি সর্বস্বান্ত হতে বসেছি। বুকে আর এতটুকু সাহস নাই। বিবি আর ছেলেকে যে কথাটা খুলে বলব, সে সাহস পর্যন্ত পাচ্ছি না।

বহিপীর - দেখুন, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। যার তকদিরে যত রিজিক ধার্য করা আছে, সে তাহার বেশি ভোগ করিতে পারে না। সে রিজিক ধীরে ধীরে ভোগ করিলে ভোগের সময় দীর্ঘ হইবে; দ্রুত খাইয়া ফেলিলে শীঘ্র তাহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তবু খোদা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করেন। যাহাকে একেবারে নিঃস্ব মনে হয় তাহারও কিছু না কিছু থাকে। আর কিছু না থাকিলেও রূহানিয়াৎ তো থাকিতে পারে। না, কেউ কখনো একেবারে নিঃস্ব হয় না।

হাতেম আলি - (যেন বোঝে) ঠিক কথা বলেছেন পীরসাহেব, কেউ একেবারে নিঃস্ব হয় না। কেবল সব সময়ে বুঝে ওঠে না। বুঝি, তবু যেন বুঝি না।

বহিপীর - সে কথা না বুঝিলেও আমার সমস্যা সম্বন্ধে খোঁটা দিয়া একটি কথা বলিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু আমার কথাটাও একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনার মনে হইতে পারে যে, যে বিবিকে আমি চোখে পর্যন্ত দেখি নাই বা যাঁহার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য মিলিত হই নাই, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা। মানুষ সময়ের দীর্ঘতা দিয়াই সব বিচার করে, কিন্তু তাহা ভুল। একবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই সে দায়িত্ব পালন করা একান্ত ফরজ হইয়া পড়ে। সময়ের স্বল্পতার কথা বলিয়া সে দায়িত্বের ভার হইতে নিজেকে মুক্ত করা যায় না। এক মুহূর্তের স্ত্রীর প্রতি যেমন দায়িত্ব, দশ বছরের স্ত্রীর প্রতিও সেই সমান দায়িত্ব। কাজেই, আমার বিবির সহিত চোখাচোখি পর্যন্ত না ঘটিয়া থাকিলেও শাদি মোবারক যখন একবার সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। দশ বছরের বিবিও হঠাৎ ভুলবশত কোনো তরিকাবিহীন কাজ করিয়া বসিলে আমার যেমন কর্তব্য হইত তাঁহাকে বিপথ হইতে সপথে আনা, এই বিবির প্রতিও আমার সেই সমান কর্তব্য। (থেমে গলা নিচু করে) জমিদার সাহেব আবার বেঁহুশ হইয়া পড়িয়াছেন : তাঁহার কর্ণকুহরে কিছু প্রবেশ করিতেছে না। বৃথা বকা। কিন্তু হাশেম বাবা ফিরে না কেন। ঐ কামরায় একবার ঢুকিলে সে যেন জোঁকের মতো লাগিয়া থাকে, অত আকর্ষণ কিসের? (গলা উঁচিয়ে) হাশেম মিঞা।

হাশেম - পীরসাহেব আবার ডাকছেন। সারা দুপুর আর সারা বিকাল ধরে এ-কামরা সে-কামরা করছি, আর ভালো লাগে না। কত মতলবই না তিনি ঠাওরালেন, কত কথাই না বললেন। আর আমি যেন বার্তাবাহক। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে শর্ত-পাল্টা শর্তের কথা নিয়ে দুই জোরদার শত্রু-শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করছি। কিন্তু বার্তাবাহককে যে দলহীন হতে হয়। কোনো দলের প্রতি একটু টান থাকলে আর ঘটনাপ্রবাহ তার অনুকূল না হলে তার পক্ষে নির্বিকার থাকা মুশকিল। আমার সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

তাহেরা - (সামান্য অভিমানের সুরে) আপনার এ গোলমাল ভালো না লাগলে আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমিই পীরসাহেবকে বলব।

হাশেম - না না; আমি কি আর সে ধরনের ভালো না লাগার কথা বলেছি। তবে মনে হয়, পীরসাহেবের মতো অত ধৈর্য আমার নাই। যখন আম্মা দরজা খুলে আপনার কথাটা পীরসাহেবকে বলে দিলেন, তখন ভাবলাম, এখুনি কিছু একটা ঘটে যাবে। কিন্তু পীরসাহেব সাবধানী লোক। সজোরে শোকর আদায় জানিয়ে সংযত হয়েই থাকলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন, তারপর একটু বিশ্রামও করলেন। এমন একটা ভাব যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবই ঠিকঠাক আছে, তিনি কেবল সস্ত্রীক কুটুম্ব বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। আসলে বেড়ালের ভাব, ইঁদুরকে থাবার নিচে পেয়ে বিড়ালের যে ভাব হয়, সেই ভাব।

খোদেজা - হাশেম।

হাশেম - (কান না দিয়ে) তারপর ধীরেসুস্থে প্রস্তাবনা শুরু হল এ-কথা সে-কথা, পীরসাহেব তাঁকে ঝেড়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। তাঁর বিবির কাঁধে যে শয়তান চড়েছে সে শয়তানকে ঝেড়ে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু সব কথাতেই তাঁর বিবি কেবল না করেন। পীরসাহেব সব শোনেন আর মাথা নাড়েন। কিন্তু দেখে মনে হয় তাঁর চোখটা যেন হিংস্র জন্তুর মতো দপ করে জ্বলে ওঠে।

খোদেজা - (রেগে) হাশেম এখানে বসে এত বেতমিজি কথা শুনতে পারি না। পীরসাহেবকে নিয়ে এসব কী কথা বলিস। দিলে কী একটু ভয়-ডর নাই?

হাশেম - আছে আম্মা, ভয়-ডর আছে! না হলে কি একটি মেয়ে এমন করে পালায়? আর আমিই কি কেবল বার্তাবাহকের মতো এ-কামরা সে-কামরার মধ্যে ঘুরঘুর করি?

খোদেজা - তোর এত ঘুরঘুর করার কোনোই প্রয়োজন দেখি না। তাহেরা যা বলছে তাই পীরসাহেবকে গিয়ে বল। শুনে তাঁর যা খুশি তা-ই তিনি করবেন।

হাশেম - (বিরক্ত হয়ে) বলব আম্মা, বলব। তবে সুখবর যখন নয়, অত লাফিয়ে গিয়ে বলবারই কী প্রয়োজন? তাছাড়া ব্যাপারটা কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠছে দেখতে পারছেন না? প্রথমে আদর-আবদার, মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় এখন উঠেছে পুলিশের কথা। তিনি সঙ্গে না গেলে পীরসাহেব পুলিশে খবর দেবেন, তাঁর বাপজানকে খবর দেবেন। কিন্তু তাতেও তাঁর বিবি ভয় পাচ্ছেন না। বলছেন, জুলুম করে কোনো ফল হবে না। জুলুম করলে তিনি সত্যি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবেন।

খোদেজা - (রেগে আপন মনে) ঐ এক কথা, আত্মহত্যা করব। মেয়েটার ঘাড়েই শুধু শয়তান বসে নাই, তার ভিতরেও শয়তান। আর সে শয়তান তোর ঘাড়েও যেন চেপেছে।

হাশেম - কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে। এই বুড়ো বয়সে একজন মেয়ের পেছনে ছোটার নেশা কি এমনিতেই হয়?

খোদেজা - আম্মা, একটা কথা বুঝে দেখবেন। পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে, সে বিয়ে কেবল নামেই বিয়ে। তিনি হ্যাঁ বলেন নাই। কোনোভাবে মতও দেন নাই।

খোদেজা - তোর বাপের সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমিই কি আর হ্যাঁ বলেছিলাম? বিয়ের ব্যাপার কি আইন-মকদ্দমা নাকি?

হাশেম - আইন-মকদ্দমা নয় বলেই তো এত কথা উঠেছে। আপনি হ্যাঁ বলেননি লজ্জায়, আর উনি হ্যাঁ বলেননি মত ছিল না বলে। মত না থাকলে কোনো বিয়ে জায়েজ হতে পারে না, এ বিয়েও জায়েজ হয়নি। যদি জায়েজ হতো, যদি তিনি পীরসাহেবের ঘর-সংসার করে পালিয়ে যেতেন তাহলে পীরসাহেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলাটা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হতো। সে কথা যাক, কিন্তু তাঁর প্রতি একটু দয়া-মায়াও কি হয় না আপনার। কাল যাঁকে আদর করে ডেকে নিয়ে আশ্রয় দিলেন, যে আজ সারা দিন আপনার সাথে থেকে রান্নাবান্নার কাজ করলো, যাঁর চুলও বেঁধে দিলেন মগরেবের আগে, তাঁর ওপর একটু মমতাও হয়না?

খোদেজা - (হঠাৎ ভিন্ন গলায়) মমতা হলেই বা কী করব? মমতা তো হয়ই। আমার মেয়ে নেই। ও যে সারা দিন আমার পাশে বসে টুকটাক কাজ করল তা বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, আমরা কী করতে পারি? পীরসাহেব যদি না আসতেন, তবে অন্য কথা ছিল। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে, তাঁর বিবি এখানে আছে। তার ওপর তিনি এও চাইছেন যে তাঁর বিবি তাঁর সঙ্গে যেন ফিরে যায়। তোকে বারবার বলেছি, পীর সাহেবেকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর বদ্‌দোয়া মাথায় নিতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া আমাদের করারও আর কিছুই নাই। ও যা বলেছে পীরসাহেবকে গিয়ে বল। তিনি পুলিশ ডাকুন বা তার বাপকে খবর দিন তা তাঁর মর্জি।

বহিপীর - হাশেম মিঞা। কোথায় গেলেন হাশেম মিঞা (হাশেম আর দ্বিরুক্তি না করে পাশের ঘরে চলে যায়।)

হাশেম - পীরসাহেব, তিনি ঐ একই কথা বলছেন। বলছেন যে পুলিশ ডাকলে বা তাঁর বাপকে খবর দিলে তিনি পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না।

বহিপীর - হু! (ভাবিত হন। তারপর) দেখুন। মধ্যের দরজাটা একটু খুলিয়া দিন আমিই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। আপনি সে ঘরে গিয়া কী করেন বুঝি না। (হাশেম দরজাটা সামান্য খুলে দেয়। পীরসাহেব একটা মোড়া টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসেন।)

বিবি সাহেব-

তাহেরা - (বাধা দিয়ে উচ্চ স্বরে) আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

বহিপীর - (একটু রেগে) আপনি মত না দিলেও আপনার বাপজান দিয়াছেন। তাহা ছাড়া সাক্ষী-সাবুদ সমেত কাবিননামাও হইয়া গিয়াছে। এখন সে কথা বলিলে চলিবে কেন। (সুর বদলিয়ে) দেখুন, মন দিয়া আমার কথা শুনুন।

তাহেরা - (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরি। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।

খোদেজা - খোদা খোদা, কোথায় যাব আমি। পীরসাহেবের মুখের ওপর এসব কী কথা বলে মেয়েটা! শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বহিপীর - আমার কথা শোনেন।

তাহেরা - না না, আপনার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না।

বহিপীর - (হঠাৎ রাগে আত্মহারা হয়ে) হকিকুল্লাহ্! হকিকুল্লাহ্! (হকিকুল্লাহ্ দ্রুতপায়ে ভেতরে আসে।) যাও, পুলিশ ডাকিয়া লইয়া আসো। বহুত আদর-আবদার হইয়াছে, আর নয়। আমার মান-সম্মান যাক, তবু পুলিশ ডাকিয়া আনো। ঘাটে পুলিশ আছে, যাও হকিকুল্লাহ্ তাদের ডাকিয়া নিয়া আসো।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর, এই ডেকে আনি।

(পরমুহূর্তেই বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চিৎকার শুনে চাকরটা আর দু-জনে উঠে বসে।)

হাশেম - পীরসাহেব। পুলিশ ডাকতে পাঠিয়ে ভুল করলেন, পীরসাহেব।

[পাশের ঘরে তাহেরা হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে উঠে পড়ে ঘরে গিয়ে বেঞ্চিতে হাঁটু গেড়ে বসে জানলা দিয়ে গলা বের করে দিতেই খোদেজা লাফিয়ে উঠে দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেন।]

খোদেজা - হাশেম। এ যে গেল, গেল মেয়েটা, আমি আর তাকে ধরে রাখতে পারছি না।

[হাশেম ধা করে পীরসাহেবকে ডিঙিয়ে পাশের ঘরে যায়, গিয়ে তাহেরার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে। পীরসাহেব ত্বরিত গতিতে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ান, চোখ তাঁর বিস্ফারিত। চিৎকার শুনে হকিকুল্লাহ্ও দ্রুতপায়ে পীরসাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ায়।]

বহিপীর - হাশেম বাবা, আপনি তাঁর হাত ছাড়িয়া দিন। আমার বিবির গায়ে হাত দিবেন না।

হাশেম - (রুক্ষ স্বরে) হাত না দিলে তাঁকে বাঁচাত কে? (হাত ছেড়ে দেয়।)

খোদেজা - খোদা খোদা, আমার মাথা ঘুরছে। (হকিকুল্লাহ্র দিকে চোখ পড়ায়) ও কে আবার উঁকি মারছে। কী হচ্ছে এই বজরায়? উনি কোথায় গেলেন?

হকিকুল্লাহ্ - (কেশে) আমি হকিকুল্লাহ্, হুজুরের লোক।

বহিপীর - (ঘুরে দাঁড়িয়ে) হকিকুল্লাহ্। তুমি যাও নাই পুলিশ ডাকিতে? জিব্রাইলের মতো আমার কাঁধের উপর দাঁড়াইয়া এখানে কী করিতেছ? না না এ কী হইল; কেহ কোনো কথা শুনিতেছে না। (সরে গিয়ে হতাশভাবে পীরসাহেব বেঞ্চিতে বসেন।)

হকিকুল্লাহ্ - (সরে গিয়ে) ছোট মুখে বড় কথা, কিন্তু আমি একটু ভাবছিলাম হুজুর।

বহিপীর - (বিস্ময়ে) ভাবিতেছিলে? তুমি ভাবিতেছিলে?

হকিকুল্লাহ্ - জি। ভাবছিলাম, আপনি হয়তো রাগের মাথায় পুলিশ ডাকার কথা বলেছেন। ডেকে ফেললে পরে না আফসোস করেন।

বহিপীর - না না ব্যাপার কিছুই বুঝিতেছি না। হকিকুল্লাহ্ পর্যন্ত ভাবিতে শুরু করিয়াছে, যাক, ভালোই করিয়াছে, ইহা পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই বা করিতে পারে। হকিকুল্লাহ্, একটু হাওয়া করো মাথাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে।

(হকিকুল্লাহ্ পাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করে।)

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

কর্ণকুহর– কানের গর্ত বা ছিদ্র। **জায়েজ–** বৈধ; আইনসম্মত। **ত্বরিত–** বেগ বাড়ানো হয়েছে এমন। **নিবদ্ধ–** আলাপ-আলোচনা; বদ্ধ; বাঁধা হয়েছে এমন। **নিমজ্জিত–** ডুবে গেছে এমন। **পায়চারি–** নিরুদ্দিষ্ট পদচারণা। **বাল্যবন্ধু–** শৈশব থেকে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। **বিলাপ–** ক্রন্দন; শোক প্রকাশ। **মগরব–** সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে যে নামাজ পড়া হয়। **লণ্ঠন–** কাচের আবরণযুক্ত হাতে বহনযোগ্য প্রদীপবিশেষ। **সর্বস্বান্ত–** সর্বহারা। **সঙ্গীন–** শক্ত; ভয়ানক; ভারী।

সারসংক্ষেপ :

এই পাঠের প্রথমেই নাটকের দৃশ্যসজ্জার পরিচয় রয়েছে। বজরায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে আছেন জমিদার হাতেম আলি। তিনি অপেক্ষা করছেন, তার বাল্যবন্ধু আনোয়ার টাকা নিয়ে আসবে। কিন্তু আনোয়ার টাকা নিয়ে এলেন না। হাতেম আলি কথাটি পরিবারের অন্য সদস্যদের নিকট বলতেও পারছেন না। বহিপীর অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। অন্যদিকে বহিপীর তাহেরাকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন তার ঘরে ফিরে যাবার জন্য। এ সময়ে হাশেম নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে বার্তাবাহকের দায়িত্ব পালন করে। তাহেরাকে রাজি করাতে না পেরে বহিপীর পুলিশ ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবস্থা নিজের অনুকূলে নয় বিবেচনা করে তাহেরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নেয়। চকিতে খোদেজা তাকে ধরে ফেলে। পীরের সহায়তাকারী হকিকুল্লাহ পুলিশ ডাকতে গিয়েও ফিরে আসে। এভাবে 'বহিপীর' নাটকে নাট্যিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. তাহেরার বিয়েতে কে মত দিয়েছিল?
   ক. বাবা খ. মা
   গ. দাদা ঘ. মামা

১৪. হাশেম আলির চরিত্রে রয়েছে–
   ক. মানবিকতা খ. অস্থিরতা
   গ. উগ্রতা ঘ. নির্বুদ্ধিতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সুবল বাবার রাশভারি ব্যক্তিত্বের কারণে নিজের মতো করে গড়ে উঠতে পারেনি। সে বাবাকে ভয় পায়। ফলে বোন রুনির বিয়ের সময় সে কোনো মত প্রকাশ করেনি। বোনের বিয়ে হয় ষাটোর্ধ্ব বয়সের পুরোহিত ও ধনী অপূর্ব রায়ের সঙ্গে।

১৫. উদ্দীপকের রুনি 'বহিপীর' নাটকে কার প্রতিনিধি?
   ক. খোদেজা খ. নাসিমা
   গ. সনজিদা ঘ. তাহেরা

১৬. উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকে প্রকাশিত হয়েছে–
   i. সম্পদের লোভ ii. নারীকে পণ্য করা iii অন্ধ ধর্মবিশ্বাস
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- হাশেমের প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- তাহেরার সঙ্গে বহিপীরের কথোপকথনের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- জমিদারি নিলামে ওঠার কথা জানতে পেরে সকলের মধ্যে কীরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তা বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

হাতেম আলি - (হঠাৎ জেগে উঠে) চারপাশে কী হচ্ছে? কিসের এত চেঁচামেচি?

বহিপীর - (মুখ চিবিয়ে) কী আবার হইবে। একটু হাওয়া খাইতেছি।

তাহেরা - (বাহুতে হাত বোলাতে-বোলাতে) আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।

খোদেজা - ব্যথা দিয়েছে ভালো করেছে। ও না এসে তোমাকে ধরলে কে বাঁচাত তোমাকে? মেয়ে আবার পানিতে ঝাঁপ দিতে চায়। শাবাশ মেয়ে।

তাহেরা - আমাকে বাঁচার জন্য আপনাদের এত মাথাব্যথা কেন?

হাশেম - (রেগে) চোখের সামনে মরতে দেখব নাকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তাহেরা - বুঝেছি। আপনারা কোরবানির গোস্ত খেতে পারেন, কিন্তু গরু জবাই চেয়ে দেখতে পারেন না। আপনারা ভেবেছেন সত্যি সত্যি আমি পানিতে ঝাঁপ দিতাম? নিজের জান দেওয়া কি অতই সোজা? আপনাদের বুদ্ধি নাই।

খোদেজা - খোদা খোদা। এবার মেয়েটির মুখে অন্য কথা শুনি। বলে কিনা আমাদের বুদ্ধি নাই।

হাশেম - আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না আম্মা। তিনি এখন আমাদের রাগাতে চান।

তাহেরা - আপনাদের রাগিয়ে আমার লাভ কী, আপনারা ছেড়ে দিলে আমি যাব কোথায়? (সে বাহুতে হাত বোলাল আর একবার তির্যক দৃষ্টিতে হাশেমের দিকে তাকায়।)

খোদেজা - (দুজনের দিকে তাকিয়ে) এসব আবার কী হেঁয়ালি চলছে। হাশেম। তুই এখানে এত ঘুরঘুর করিস না তো। বাপের খোঁজখবর নেওয়া নাই, এ ঘরে জোঁকের মতো লেগে আছে। দ্যাখ তোর বাপের কী হয়েছে। বজরায় এত হুলস্থুল, তবু তার কোনো সাড়াশব্দ নাই।

হাশেম - আম্মা, আমি যাচ্ছি কিন্তু আগে আমার একটা কথা শোনেন। পীরসাহেব পাশের ঘরে চুপচাপ বসে। এখন এবাদত করতে বসেননি; তিনি নতুন ফন্দি-কৌশল ভাবতে বসেছেন। কীভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন, কী চাল চাললে তিনি আর ফসকে যাবেন না, সেসব চিন্তা করছেন।

খোদেজা - তোর মুখের কথাও যেন লাগামছাড়া হয়েছে। নিজের বিবিকে কীভাবে বশে আনবেন সে কথা নিয়ে চিন্তা করলে ফন্দি-কৌশল আঁটা হয় বুঝি।

হাশেম - সেটা অন্য কথা! আমি বলতে চাই যে, যতই ফন্দি-কৌশল আঁটেন না কেন, আমি দেখব যাতে তাঁর কোনো ফন্দি-কৌশল না খাটে, কারণ, ওঁর যদি মত থাকে, তবে আমি তাঁকে বিয়ে করব। কথাটা আপনার সামনেই বললাম।

খোদেজা - বিয়ে, বিয়ে করবি তাকে? এ কী কথা বললি? মেয়েটা তোর মাথা খেল নাকি। খোদা খোদা। আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি, হাশেম। তুই এখান থেকে এক্ষুনি বের হ? এ ঘরে আর আসতে পারবি না।

পীরসাহেবকে যা বলবার হয় আমিই বলব। এক পীরসাহেবের বিবি, তাকে নাকি আমার ছেলে বিয়ে করবে। তা ছাড়া কী মেয়ে! যে মেয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে পালাতে পারে সে কী করে ভালো মেয়ে? যা যা, এ কামরা থেকে যা হাশেম।

হাশেম - আপনি বলছেন তিনি পীরসাহেবের বউ কিন্তু দুজন সাক্ষীর সামনে একটা কাগজে কী লেখাপড়া হয়েছে তার কোনোই দাম নাই। সামনে থাকলে আমি এখনই সেটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতাম। আমি পীরসাহেবকে গিয়ে বলছি সে কথা। আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।

তাহেরা - আমার তাতে মত থাকবে সে কথা আপনাকে কে বললো?

হাশেম - (হঠাৎ দমে গিয়ে) তাই, তাই। তবে আপনার কাছে সেকথা আমি বলি নাই।

তাহেরা - না বললেও আপনি তাই ধরে নিয়েছেন।

খোদেজা - (বিস্ময়ে) আমার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি তাতে মত দেবে না।

তাহেরা - সে কথাও আমি বলি নাই। তবে একজন ঝোঁকের মাথায় কেবল বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই যদি কাউকে বিয়ে করতে চায়, তবে সে অত সহজেই মত দেবে কেন? ঝোঁক কেটে গেলে আপনার ছেলের মত হতে পারে, তিনি ভুল করছেন।

খোদেজা - (আগের মতো বিস্ময়ে) আমাদের মধ্যে আমার ছেলেটাই তোমার জন্য এত করছে। আর তার কথায় তুমি মত দেবে না?

তাহেরা - (একটু হেসে) হঠাৎ আপনি যেন চাইছেন আপনার ছেলের কথায় আমি মত দিই।

খোদেজা - না না, সে কথা নয়। তোমাদের বিয়ে তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি তোমার অকৃতজ্ঞতা দেখে। সে জন্যই কথাটা বলছি।

হাশেম - আম্মা, উনি কোনোই অকৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছেন না। আপনি ওঁর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমিও যা বলতে চাই তা তাঁকে বোঝানো আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সব কথা এক মুহূর্তে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। তিনি যদি মনে করেন আমি ঝোঁকের মাথায় তাঁকে বিয়ে করতে চাইছি সেকথা সত্যও হতে পারে। তা সত্য কি মিথ্যা সে কথা জানতে হলে সময় নেবে। (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি না?

তাহেরা - (নরম গলায়) আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আপনারা সকলেই আমাকে সাহায্য করেছেন বলেই তো মনে সাহস পাচ্ছি। আপনার আম্মা থেকে থেকে আমাকে কথা শোনাচ্ছেন বটে কিন্তু তিনিও আমাকে সাহায্য করছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কি আমাকে বের করে দিতে পারেন না?

খোদেজা - (হৃদয়ে টান পড়া গলায়) হয়েছে হয়েছে এত ঢঙের কথা শুনতে পারি না। (হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে বসে ডাকেন) হাশেম, ঐ যে তোর আব্বা তোকে ডাকছেন। তাঁর কথা আমরা সবাই যেন ভুলেই গেছি। (কঠিন হয়ে) যা হাশেম। আর তোকে বলে রাখছি, ওসব সাহায্যটাহায্যের কথা আমি বুঝি না, বিয়ের কথা তো দূরে থাক। আর এ ঘরেও তোর কোনোই প্রয়োজন নেই। পীরসাহেবকে যা বলার আমিই বলব।

হাশেম - আমার কথাটা খেলোভাবে নেবেন না আম্মা। আমি মন থেকেই কথাটা বলছি।

তাহেরা - (একটু হুকুমের সুরে) যান আপনি পাশের ঘরে। দেখে আসুন আপনার আব্বা কেন ডাকছেন।

খোদেজা - (তাহেরার দিকে চেয়ে) এখন তোমার হুকুমই সে বোধ হয় শুনবে।

হাশেম - (হঠাৎ যেতে যেতে বিরক্তভাবে) যাচ্ছি, যাচ্ছি, আপনার কথা শুনেই যাচ্ছি।

(পাশের ঘরে গিয়ে) আব্বা, আমাকে ডাকছিলেন?

হাতেম আলি - (চমকে উঠে) হ্যাঁ বাবা, তোমাকে ডেকেছিলাম। বসো। তোমাদের কথাটা বলার সময় এসেছে। শুধু একটা রাত; একটা রাত কথাটা ঢেকে রেখে লাভ কী?

হাশেম - (সভয়ে) আব্বা কী কথা বলবেন আপনি। কী কথা আর ঢেকে রেখে লাভ নাই?

হাতেম আলি - অস্থির হয়ো না; অস্থির হয়ে লাভ নাই বাবা। দেখো না আমার মধ্যে সমস্ত অস্থিরতার শেষ হয়েছে। আমার মনে আর কোনো ভয়-আশঙ্কা নাই, কোনো অস্থিরতা নাই। শুধু বড় ক্লান্তবোধ করছি। (থেমে) না, এখন আর বলতে কোনো বাধা নাই। বাবা, তোমাদের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমার কোনো অসুখ হয় নাই, দাওয়াই করার জন্যও আমি শহরে আসি নাই। এসেছিলাম জমিদারি রক্ষা করতে।

হাশেম - (বিস্ময়ে) জমিদারি রক্ষা করতে?

হাতেম আলি - হ্যাঁ। কিন্তু রক্ষা করতে পারলাম না। কাল জমিদারি নিলামে উঠবে।

হাশেম - কাল জমিদারি নিলামে উঠবে?

হাতেম আলি - শহরে টাকার জোগাড় করতে এসেছিলাম। জোগাড় হল না। জমিদারি বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই। মধ্যে কেবলমাত্র একটি রাত, তারপর বুদবুদের মতো জামিদারি শূন্যে মিলিয়ে যাবে, আর সজ্ঞানে সুস্থ দেহে আমাকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, করার কিছুই থাকবে না।

[স্তম্ভিতভাবে বাপের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে হাশেম ধীরপায়ে পাশের কামরায় যায়, গিয়ে বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে চেয়ে মূর্তিবৎ বসে থাকে। খোদেজা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহেরার চোখেও উৎকণ্ঠা আসে।]

খোদেজা - তোর আব্বা কী বললেন? হাশেম! কথা বলিস না কেন?

হাশেম - কাল আমাদের জমিদারি নিলামে উঠবে।

খোদেজা - নিলামে উঠবে। কেন কেন? (স্তম্ভিত হাশেম এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে।)

তাহেরা - (চমকে উঠে) আপনার ছেলে যে কাঁদছে!

হাশেম - (সংযত হয়ে নাক ঝেড়ে) আমি কি আর জমিদারি যাচ্ছে বলে কাঁদছি নাকি। কান্না এলো আব্বার কথা ভেবে। তাঁর চোখে পানি নাই বটে, কিন্তু দুঃখে বুক নিশ্চয় ফেটে যাচ্ছে।

হাতেম আলি - (উঠে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে) আমার ছেলেটাকে ছাপাখানা করার পয়সা কখনো দিতে পারব না।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আমি পয়সা চাই না। আমি পয়সাও চাই না, ছাপাখানাও চাই না। [হাতেম আলি আবার নিঃশব্দে ফিরে যান।]

(উঠে পায়চারি করতে করতে আপন মনে) আমার কী আসে যায়। জমিদারি থাক বা না থাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। পড়াশোনা করেছি, এটা না হয় সেটা হবে, কিছু একটা করে খেতে পারবই। একটা স্বপ্ন ভেঙে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব। কিন্তু আব্বার কী হবে? এই বয়সে কী স্বপ্নই বা তিনি গড়তে পারেন? আশ্চর্য, আমরা সত্যিই ভেবেছিলাম তাঁর অসুখ হয়েছে। কিন্তু কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাটি না তিনি ভোগ করেছেন যে কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে কথা বিশ্বাস করেছি। যে মানসিক যন্ত্রণা দুদিনে শরীরকে ভেঙে দেয় সে মানসিক যন্ত্রণা কঠিন অসুখের চেয়ে কষ্টকর (থেমে মায়ের দিকে তাকিয়ে) আম্মা, কী হবে আব্বার? কী নিয়ে শেষ জীবনটা কাটাবেন?

তাহেরা - কেন, আপনারা থাকবেন আপনি থাকবেন, আপনার আম্মা থাকবেন।

হাশেম - জমিদারি! জমিদারি কী? কত জমিদারি এসেছে-গিয়েছে। আজ মাটি খুঁড়লেও কত কত বিশাল জমিদারির কোনো নিশানা পাওয়া যাবে না। তার তুলনায় আমাদের আর কীই বা ছিল। তাও না হয় আজ যাবে, কী আসে-যায় তাতে। আব্বাকে তাঁর এই শেষ বয়সে সে কথা কে বোঝাবে?

[বহিপীর হঠাৎ উঠে আসেন, এসে খোলা দরজার সামনে দাঁড়ান]

বহিপীর - বিবি। বহুত হইয়াছে, আর ফ্যাঁকড়া তুলিবেন না। দেখুন, তাঁহাদের কাহার মনে শান্তি নাই। সকলেই কেমন বেচইন হইয়া পড়িয়াছেন। এই পারিবারিক দুশ্চিন্তার সময় তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আরও কষ্ট দেওয়া ঠিক হইবে না। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।

[তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]

(অপেক্ষা করে) হুঁ। [তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বেঞ্চির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।]

হকিকুল্লাহ্। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকিতেছে না।

হকিকুল্লাহ্ - জি।

বহিপীর - (রেগে) কী বুঝিলে যে জি বলিলে? যাও তুমি এখন যাও। আমি জমিদার সাহেবের সঙ্গে একটি কথা বলি। (হকিকুল্লাহ্‌র প্রস্থান। বাইরে গিয়ে আবার হুঁকা ধরাবে।) জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - আমাকে ডাকছেন পীরসাহেব?

বহিপীর - বলি, এতটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে কেন? খোদার উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - জি, পীরসাহেব আস্থা রাখছি বৈকি।

বহিপীর - তাঁহার ছেফাত যেমন অসাধারণ, তেমনি অসংখ্য। তাঁহার স্বরূপ আমাদের কল্পনাতীত কিন্তু তাঁহার ছেফাতের এক-আধটু পরিচয় আমরা সকলেই পাই। তাহার জন্য এবাদত করিতে হয় না। তাঁহার ছেফাতের উপর আস্থা রাখিবেন।

হাতেম আলি - সব আস্থা আছে পীরসাহেব, সব আস্থা আছে। কিন্তু এই যে রাতটি ক্রমে ক্রমে গভীরতর হচ্ছে আর তার মুহূর্তগুলি একটার পর একটা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে, এ রাতটিকে তো এড়াতে পারব না, এ রাতকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। পারবে কি পীরসাহেব?

বহিপীর - খোদা কী না পারে জমিদার সাহেব।

হাতেম আলি - (ব্যঙ্গ করে) জমিদার সাহেব। ডাকটা এখন কেমন ঠাট্টার মতো শোনায়। জমিদারি নাই, তবু জমিদার।

বহিপীর - আমি তা মনে করি না। জমিদার সাহেবকে জমিদার সাহেব ডাকিব নাতো কী ডাকিব?

হাতেম আলি - (একটু হেসে) সেটা আপনার মেহেরবানি পীরসাহেব।

বহিপীর - না, মেহেরবানি নয়, খাঁটি কথা। কারণ, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (চমকে উঠে বিস্ময়ে) আপনার কথা বুঝলাম না পীরসাহেব।

বহিপীর - বলিলাম। আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (বিস্ফারিত নেত্রে) পীরসাহেব, আমার মাথার অবস্থা এখন ঠিক নেই। আপনার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কী বলছেন যে আমার জমিদারি যাবে না?

বহিপীর - ঠিক, আপনার জমিদারি যাইবে না।

হাতেম আলি - (যেন অলৌকিক দৃশ্য দেখছেন) এ কী কথা বলছেন পীরসাহেব। সে কী করে সম্ভব?

বহিপীর - সম্ভব, সম্ভব। দেখুন আপনি শহরে আসিয়াছিলেন টাকা কর্জ করিতে, কিন্তু আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই, আপনার চেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু জমিদারিটা যাওয়া না-যাওয়া কেবল টাকার ওপরই নির্ভর করিতেছে। সে টাকা আমি আপনাকে কর্জ দিব।

হাতেম আলি - পীরসাহেব!

বহিপীর - (মাথা নেড়ে) অধীর হইবেন না। পহেলা আমার কথা শুনুন। হঠাৎ খেয়াল হইল আপনি যেমন আপনার দুঃখে মুষড়াইয়া পড়িয়া বাহ্যিক সব কিছুর প্রতি অন্ধ হইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তখন পাশে বসিয়া আমিও আমার সমস্যায় লিপ্ত। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম দুঃখের কারণ যদি এক না হয়, তবে গভীর দুঃখগ্রস্ত দুটি লোকের মতো অপরিচিত আর কেহ নাই। পাশাপাশি বসিয়াও দুইজনের মধ্যে যেন আসমান-জমিনের প্রভেদ। আমার পাশে বসিয়াই আপনি গভীর বেদনা ভোগ করিতেছেন; যেহেতু জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আপনি আপনার মান-সম্মান খোরাকির ব্যবস্থা সব হারাইতে বসিয়াছেন। জমিদারিই হইল আপনার মূল। মূল কাটিয়া ফেলিলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে পারে না; সব বুঝিয়া এবং আপনার পাশে বসিয়া থাকা সত্ত্বেও আপনার দুঃখ আমার মনে কোনো প্রকার দাগ কাটিতেছে না। উহার কারণ আমিও সমস্যাজর্জরিত। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর আর খোদার কী মর্জি, তাঁহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল; বলিতে লজ্জা নাই, তাঁহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল যে, তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাঁহাকে টলাইতে পারি না, তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। অবশ্য জোর-জুলুম করা যায়। জোর-জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। ভাবিলাম, অন্য কোনো পথ ধরিতে হইবে! আরও ভাবিলাম, আপনি ও আমি এক কামরায় বসিয়াও একাকী দুঃখ ভোগ করিতেছি, কেহ কাহার সাহায্য লাগিতেছি না। ভাবিলাম, আমাদের দুইজনের সমস্যাকে জড়িত করিলে দুইজনের সমস্যারও হয়তো সমাধান হইতে পারে, না হইলেও অন্তত পক্ষে দুঃখে মিলিত হইয়া আমরা পরস্পরের দিলে কিছুটা শক্তি আনিতে পারি। আপনি আমার কথা বুঝিতেছেন তো?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অকৃতজ্ঞ– উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এমন। **উৎকণ্ঠিত–** উদ্বিগ্ন; ব্যাকুল। **খোরাকি–** আহার্য বা ভরণপোষণের ব্যয়। **দাওয়াই–** ঔষধ; প্রতিকার। **নিলাম–** দেনার দায়ে প্রকাশ্যে বিক্রয়। **নিদারুন–** অতি ভীষণ; কঠোর; অসহ্য। **নিশানা–** চিহ্ন। **বাহ্যিক–** বাইরের; আপাত দৃশ্যমান। **মুষড়াইয়া–** হতাশ হয়ে পড়া। **স্তম্ভিতভাবে–** আশ্চার্যান্বিত-ভাবে। **হুলস্থুল–** গোলমাল; হৈচৈ কাণ্ড।

সারসংক্ষেপ :

তাহেরা আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হয়। আর হাশেম তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাহেরা চট করে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হয় না। তাই খোদেজা তাকে অকৃতজ্ঞ মনে করে। হাশেম তাহেরাকে বিয়ে করতে চাইলে খোদেজা হতাশা প্রকাশ করে। তাহেরার বিয়ে নিয়ে খোদেজা, হাশেম ও তাহেরার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। হাতেম আলি ছেলে হাশেমকে নিজের কাছে ডেকে নেন। তিনি ছেলেকে বজরায় করে শহরে আসার উদ্দেশ্যটা খোলাসা করে ব্যক্ত করেন। পিতার কথা শুনে হাশেম খানিকটা ভেঙে পড়ে। কেননা তার স্বপ্ন ছিল বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছাপাখানা করবে। অবশ্য হাশেম আলি নিজের স্বপ্ন ভাঙার চেয়ে পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি কাতরতা প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. বাইরে গিয়ে হুঁকা ধরায় কে?
ক. হাশেম আলি   খ. হকিকুল্লাহ
গ. হাতেম আলি   ঘ. কাশেম আলি

১৮. 'বহিপীর' তাহেরাকে থামালেন না কেন?
ক. ব্যর্থতায়   খ. অনুশোচনায়
গ. আশা ফুরানোয়   ঘ. ঘটনার যবনিকায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বামীর প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি রহিমার। কেননা তিনি আল্লাহওয়ালা লোক, মোদাচ্ছের পীরের খাস খাদেম। কিন্তু স্বামীকে দেখে মজা পায় জমিলা। বিয়ের একদিন পর সতিন রহিমাকে সে বলে, তয় দেইখা আমি কই, ধ্যাত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু, কারণ কী– আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।

১৯. উদ্দীপকের সঙ্গে মিল রয়েছে যে বাক্যের–

ক. পীর সাহেবের বদদোয়া নিয়ে সংসারে আগুন ধরিয়ে দেই। খ. বিয়ে হল তগদিরের কথা।

গ. খোদার ভেদ বুঝা সত্যই মুশকিল। ঘ. আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।

২০. উদ্দীপকের রহিমা এবং ‘বহিপীর’ নাটকে খোদেজার সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে–

i. অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে ii. সংস্কার পালনে iii. সামাজিক প্রথায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- জমিদারির নিলাম ঠেকাতে বহিপীরের টাকা কর্জ দেয়ার শর্তের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- তাহেরার বহিপীরের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বহিপীরের শর্ত অনুযায়ী তাহেরা রাজি হলেও হাতেম আলি তাতে রাজি না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- 'বহিপীর' নাটকের পরিসমাপ্তি লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

হাতেম আলি - এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু মন দিয়ে শুনছি পীরসাহেব।

বহিপীর - আরও বলি, শুনুন। লোকেরা বলে, খোদা আমার দেলে রুহানি শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আমি জানি না। আমি উদার লোক। বহুরূপীকে যেমন বহুরূপী হইবার জন্য সঙ সাজিতে হয়, তেমনি পীর হইতে হইলে তাহাকে পীরের সঙ ধরিতে হইবে– এ কথা আমি মানি না। কিন্তু রূহানি শক্তি থাকুক বা না থাকুক, আমি টক করিয়া মানুষের মনের কথা বুঝিতে পারি। শুধু একনজর দেখিলেও বিবিকে আমার চিনিতে দেরি হয় নাই। স্নেহবিবর্জিতভাবে সৎমায়ের ঘরে মানুষ-হওয়া আমার মাতৃহারা বিবিটি জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা পান নাই। দায়িত্বের খাতিরে তাঁহার বাপজান তাঁহার ভরণ-পোষণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্নেহ-মমতা দেন নাই। দায়িত্বের খাতিরে দায়িত্ব পালন করা আর স্নেহ-মমতার খাতিরে দায়িত্ব পালন করার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। কাজেই যেখানেই আমার বিবি একটু স্নেহ-মমতার আভাস পাইবেন, সেখানেই তাঁহার সমস্ত দিল হইতে কৃতজ্ঞতা উথলাইয়া উঠিবে। এ কৃতজ্ঞতার তেজ নেশার মতো। ইহার ঘোরে মানুষ অনেক কিছুই করিতে পারে। কাজেই আপনাদের নিকট তিনি যে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাস পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে যাহাই বলিবেন তিনি তাহাই করিবেন।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, মেহেরবানি করে আরও খুলে বলুন।

বহিপীর - আসল কথা বলিবার আগে আরেকটা কথা বলিয়া লই। আপনি ভাবিতে পারেন, আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন। তা ছাড়া খোদারই মর্জি, তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাহিব তাহাই তাঁহারা দিবেন। মাটিকে সোনা করিবার কেরামতি আমার জানা নাই, কিন্তু একবার মুখ খুলিয়া চাহিলেই আমার মুরিদগণ ভিটাবাড়ি বন্ধক দিয়া হইলেও আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু আমি কখনো কাহার কাছে এমন অনুরোধ জানাই নাই। আমার অর্থের কী প্রয়োজন। যাহা আমার আছে তাহাও আমি বিলাইয়া দিতে পারি। এক এক সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া ফেলিয়া সত্যিই চলিয়া যাই যেদিকে চোখ যায়, গুহা-গহ্বরে, অরণ্য-পর্বতে ও ইরান-তুরান-কাবলিস্থানে– যেখানেই নিরিবিলি একাকী খোদার এবাদত করা যায়। কিন্তু উহা স্বপ্ন, পীরের স্বপ্ন থাকে। আসলে আমি ইহাই ভাবি যে, সমস্ত ত্যাগ করিলে এবাদত হয় না, কারণ সমস্ত ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। শূন্যতার মধ্যে শূন্যতাই সম্ভব; যেখানে রূহ-এর মুক্তি মিলে না। তাহা হইলে খোদা কেবল আসমানই সৃষ্টি করিতেন, জমিন করিতেন না। অবশ্য অর্থ-যশ-মানের লোভ ত্যাগ করিতেই হয়, কিন্তু জীবনে সামান্য ঘনিষ্ঠ স্নেহ-মমতার সিঞ্চন না থাকিলে কোনো এবাদতই সম্ভব নয়। পানির অভাবে বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনি সামান্য স্নেহ না থাকিলে রূহও মরিয়া যায়। তখন এক ঢোক পানি না পাইলে ঐশী প্রেমের সাধনা করা যায় না। সেই কারণেই আমি আমার বিবিকে চাই। আপনি অবশ্য বলিতে পারেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই না কেন, যাইতাম, যদি না তাঁহার মধ্যে একটি অসাধারণ নারীর

পরিচয় পাইতাম। পালাইয়া যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, পালাইয়া যাওয়াটা অতি সহজও। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি পালাইয়া অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সহজ এই কাজটা কেহ কোনো দিন করিতে পারে না বলিয়াই তাহা করিয়া তিনি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাকে আমি কী করিয়া ফেলিয়া যাই? আমি এখনো জানি যে, জীবনে কখনো স্নেহ-মমতা না পাওয়ার জন্য তিনি এই কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চান না যে, তাহা সত্যই পাওয়া যায়। সেই জন্যই তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু একবার কোনো প্রকারে আমি যদি তাঁহাকে আমার স্নেহ-মমতার পরিচয় দিতে পারি, তিনি আমার নিকট হইতে আর পালাইতে চাহিবেন না। সেই পরিচয় দিবার একটা সুযোগই আমি চাই, এবং সেই কারণেই আপনার সমস্যা আর আমার সমস্যাকে মিলিত করিতে উদ্‌গ্রীব। এইবার আমার প্রস্তাবিত কথা আপনাকে বলি, শুনিতেছেন জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - জি পীরসাহেব, শুনছি, মন দিয়ে শুনছি।

বহিপীর - প্রশ্ন করি বলিয়া তাহা মনে করিবেন না। সারা জীবন বাঁধা-ধরা কথা বলিয়াছি, লোকেরা শুনিয়াছে কী শুনেন নাই, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অকস্মাৎ কখনো মৌলিক কথা বলিতে থাকিলে ভয় হয় উহা বুঝি কেহ শুনিল না। দুনিয়ায় হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ ফুলগাছ রোপণ করে, আপনি আপনার আঙিনার একটা গাঁদা ফুলের গাছ রোপণ করিলেও তাহা সকলকে ডাকিয়া দেখাইতে আপনার ইচ্ছা হয়। যা হোক আমি বলিয়াছি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব। এই শহরেই আমার জনা তিনেক ধনী মুরিদ আছেন। তাঁহাদের কাছে চাহিলেই পাইব। সে টাকা দিয়া আপনি আপনার জমিদারি বাঁচাইতে পারিবেন, উহা আর নিলামে উঠিবে না। তবে একটা শর্তে আপনাকে টাকা কর্জ দিব। তাহেরা বিবিকে আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

হাতেম আলি - (বিস্ময়ে) এই শর্তে যে আপনার বিবিকে আপনার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে?

বহিপীর - (জোর দিয়ে) জি, আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।

হাতেম আলি - (ইতস্তত করে) আমাকে মাফ করবেন পীরসাহেব, কিন্তু আমি যেন কিছুই আজ বুঝতে পারছি না। আমার জমিদারি থাকা না-থাকার সঙ্গে তাঁর যাওয়া না-যাওয়ার কী সম্পর্ক?

বহিপীর - বেয়াদবি মাফ করিবেন, কিন্তু বিপদে পড়িয়া মানসিক দুঃখকষ্টের ফলে আপনার মস্তক যেন ঘোলাটে হইয়া আছে। তাই আপনার বুঝিতে সময় নিতেছে। যান, সময় বেশি নাই। আপনি ভিতরে গিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া আমার বিবি সাহেবকে কথাটা বলুন। হকিকুল্লাহ্। (হকিকুল্লাহ্ এলে) পিঠটা একটু ভালো করিয়া টিপিয়া দাও। কেমন ব্যথা করিতেছে। (টিপতে শুরু করলে থেকে থেকে বহিপীর আনন্দধ্বনি করবেন) আর দেরি করিবেন না, জমিদার সাহেব, যান ভিতরে গিয়া বলুন। (হাতেম আলি আস্তে উঠে পাশের ঘরে যান। মুখ ভারাক্রান্ত, হাশেম উঠে বসে তাঁর দিকে তাকায়, খোদেজাও।)

হাতেম আলি - (বেঞ্চিতে বসে; তাহেরার দিকে তাকিয়ে) মনের চিন্তায় ছিলাম, ব্যক্তিগতভাবে আপনার খোঁজখবর নিতে পারি নাই। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমার চিন্তার কারণ। আমাদের এত পুরনো জমিদারি ওঠে ওঠে। আগামীকালই তার নিলাম ওঠার তারিখ।

তাহেরা - (আস্তে) জি, শুনেছি।

হাতেম আলি - শহরেও টাকার ব্যবস্থা হল না; যদিও অনেক আশা ছিল যে হবে। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিন সাহায্য করতে পারলেন না। আমি চোখে আঁধার দেখছিলাম। এমন সময় পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দিতে রাজি হলেন। আমি তাঁর কাছে টাকা চাই নাই, তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দিতে চেয়েছেন।

হাশেম - পীরসাহেব টাকা দিতে চেয়েছেন।

খোদেজা - খোদা, খোদা। সবই খোদার রহমত।

হাতেম আলি - কিন্তু একটা শর্ত আছে। পীরসাহেব আমাকে টাকা কর্জ দেবেন এই শর্তে যে আপনি তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই শর্তের আমি কোনোই অর্থ বুঝি না। আপনার সঙ্গে আমার জমিদারির কী সম্পর্ক? তা ছাড়া আপনি এখানে মেহেরবানি করে আশ্রয় নিয়েছেন বটে, কিন্তু আপনি কী করবেন কোথায় যাবেন তার সঙ্গে এ জমিদারির কী সম্বন্ধ? কাজেই এটি কেমনতর শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। পীরসাহেব না বলে অন্য কেউ এমন কথা বললে মনে করতাম ঠাট্টা করছেন।

[কয়েক মুহূর্তব্যাপী স্তব্ধতা]

তাহেরা - না, পীরসাহেব ঠাট্টা করছেন না। পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল চালছেন।

হাশেম - (ফেটে পড়ে) চাল, কী চাল?

তাহেরা - বুঝতে পারছেন না?

[আবার স্তব্ধতা]

হাশেম - আব্বা, বুঝেছি কিস্তিমাৎ করা চাল। যে কথা আপনিও বোঝেননি আমি বুঝিনি, সে কথা পীরসাহেব ঠিক অনুমান করেছেন। তিনি ঠিক বুঝেছেন যে তাঁর বিবি ঘর ছেড়ে পালাতে পারেন। যদিও জানেন না কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, এমনকি তিনি পানিতে পড়ে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত প্রস্তুত, কিন্তু একটি নির্দোষ পরিবারকে তিনি ধ্বংস হতে দিতে পারেন না, যদি সেই পরিবারকে রক্ষা করার একমাত্র চাবি তাঁরই হাতে তুলে দেওয়া যায়। কেবল তাঁরই জন্য একটি পরিবারকে তিনি উচ্ছন্নে যেতে দিতে পারেন না।

হাতেম আলি - এ কী আবার নতুন সমস্যা। নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য একটি লোক আরও কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

হাশেম - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে) আমাদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন আপনার। বড় কঠিন দায়িত্ব; এ দায়িত্ব রক্ষা করতে হলে যেখান থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়েছেন, সেখানে এবার আপনাকে ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - খোদা, খোদা। কী দায়িত্ব, কী শর্ত?

হাশেম - (অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে) আর বুঝে কী হবে আম্মা। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নাই। এবার তিনি ফিরে যাবেন পীরসাহেবের খেদমত করার জন্য, পানিতে আর ঝাঁপ দিতে চাইবেন না, আপনার একমাত্র ছেলেরও মাথা খারাপ করবেন না। আপনি যা চাইছিলেন এবার তাই হবে।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, অত অস্থির হস্‌ না, দ্যাখ আমার বুক ধড়ফড় করছে।

হাশেম - (মায়ের দিকে দাঁড়িয়ে) আপনি বুঝতে পারছেন না যে পীরসাহেব আমার মুখও বন্ধ করেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কারও সমর্থন নাই, তবু ভাবছিলাম কিছু একটা করবই। কিন্তু এবার আমার মুখ বন্ধ হল। আমিই একমাত্র তাঁর দলে ছিলাম, এবার তাঁর পক্ষ হয়ে আমার বলার কিছু থাকল না। আমি কী করে এবার বলি আপনি পালান, যাবেন না পীরসাহেবের সঙ্গে, মানবেন না তাঁর শর্ত, যাক আমার বাপের জমিদারি ধ্বংস হয়ে। আমার বাপের মনে যে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছে, এত গভীর নিরাশার মধ্যে সামান্য একটু যে- আলো দেখা দিয়েছে, সে আলোকে ধূলিসাৎ করে আপনি পীরসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিন। উনি নিশ্চয়ই তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে আর সে কথা বলতে পারি না।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম, তুই একটু চুপ করে বস, হাশেম!

হাশেম - (তাহেরার সামনে দাঁড়িয়ে) কী করতে চান আপনি? শুনলেন তো শর্ত, জানেন তো কীভাবে বাঁচবে আমাদের জমিদারি।

তাহেরা - কী আর করব (একটু হেসে) যে লোক বৃদ্ধ হয়েও এত বুদ্ধিমান তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

খোদেজা - এই যে মেয়েটি হাসছে। তার মনে চিন্তা নাই, আর আমার ছেলেটি পাগলের মতো লাফালাফি চেঁচামেচি করছে।

হাশেম - (সে কথায় কান না দিয়ে তাহেরার দিকে চেয়ে) রহস্য করবেন না, পরিষ্কার করে বলুন, কী করতে চান?

তাহেরা - (গম্ভীর হয়ে) বলছি, বলছি। (যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করে। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতা।)

হাশেম - আব্বা! দেখুন উনি কাঁদছেন।

তাহেরা - (সংযত হয়ে) না না এমনি কান্না এলো। আমি বলছি, এত চেঁচামেচি করলে কী করে বলি।

খোদেজা - হাশেম তুই চুপ করে থাক। এখানে তোর আব্বা আছেন, তিনি সব বোঝেন। কিছু বলতে হলে তিনিই বলবেন। (হঠাৎ বেঞ্চিতে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

তাহেরা - পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে, তারপর আমি যাব।

হাতেম আলি - হাশেম কী করব? (হাশেম নীরব থাকে)

খোদেজা - হাশেমকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? ও বলার কে?

হাতেম আলি - একজন চেঁচামেচি করে আর একজন কাঁদে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজেকে যে কসাইর মতো মনে হচ্ছে। (হঠাৎ আত্মসংবরণ হারিয়ে) আমি আর কত পারি, বাবা। তোমরা যদি বুঝতে এত দিন কী দোজখ গেছে আমার ওপর দিয়ে, কী যাতনায় ভুগেছি একা একা, জমিদারি হারানো কী সহজ কথা।

তাহেরা - আপনি অমন করবেন না। পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি। আর ভাববেন না এ বিষয়ে।

হাশেম - (আপনা মনে) আশ্চর্য, শুধু কতগুলো টাকার ওপর এতগুলো জীবন নির্ভর করছে। হয় এটি ধ্বংস হবে, না হয় ওটি ধ্বংস হবে। আর, আর আমার কিছু বলার নেই। কিছুক্ষণ আগেও ছিল, এখন আর নাই।

খোদেজা - আমিই বলি। আমি অত প্যাঁচের ধার ধারি না। পীরসাহেব নেক মানুষ, তিনি ভালোই করতে চান। আমাদেরও, তাঁর বিবিরও। জমিদারি গেলে আমাদের সব যাবে, কিন্তু সে ফিরে গেলে তার কিছু ক্ষতি হবে না। বরঞ্চ সে মান, যশ, সুখ, সম্পত্তি সব পাবে। তিনি যদি না বাঁচান তবে কে তাঁকে বাঁচাবে? তিনি তাঁর জন্য যা করেছেন, তা কেউ কারও জন্য করেন না। মেয়েটা বোকা, তাই বোঝে না। দুঃখ হল এই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন বুদ্ধি হারিয়েছি। এতে এত ভাববার কী আছে?

হাশেম - (ব্যঙ্গের সুরে) না না, ভাববার কী আছে, আমাদের ভাববার কিছুই নাই।

[এ কামরায় এরপর সবাই ভাবে]

বহিপীর - ঐ ঘরে একবার যে যায় সে আর সহজে ফিরতে চায় না। কী হইল জমিদার সাহেবের? (থেমে) হকিকুল্লাহ্, হয়তো তোমাকে একটু বাহির হইতে হইবে। রাতেই তাহাদের বলিয়া রাখা সমীচীন হইবে, সময় তো বেশি নাই।

হকিকুল্লাহ্ - জি হুজুর!

বহিপীর - পাশের ঘরে কোনো আওয়াজ নাই। সকলে মিলিয়া কী করিতেছে? গোপনে-গোপনে শলাপরামর্শ আঁটিতেছে না তো? কী মতলব তাহাদের?

হকিকুল্লাহ - হুজুর, কী করে বলব কার মনে কী?

বহিপীর - (রেগে) তুমি তো কখনোই বলিতে পারো না। অপরের মাথায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া প্রবেশ না করিলে যেন মনের কথা জানা যায় না। তওবা, তওবা টিপ জোরে টিপ।

তাহেরা - (জেগে উঠে) সত্যিই আর ভাববার কিছু নাই। যান, পীরসাহেবকে গিয়ে বলুন, আমি রাজি আছি।

হাতেম আলি - (খোদেজার দিকে তাকিয়ে) আপনি কী বলেন?

খোদেজা - আমি তো বলেছি। মেয়েটি বুঝতে পারছে না যে পীরসাহেব তার ভালোর জন্যই এত সব করছেন। যে রাস্তার মেয়েলোকের মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার ভালোর জন্যই তিনি যে এতটা করেছেন, তা বড় জোর-কপালের কথা। অন্য কেউ হলে এমন মেয়ের জন্য এক পাও নড়ত না। তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে ভালোভাবে খেয়ে-পরে সে সুখে-শান্তিতেই থাকবে। তা ছাড়া, পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? পীরসাহেব একটা চাল যদি চেলেই থাকেন তবে সেটা সকলের ভালোর জন্যই চেলেছেন। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই তো বুঝি।

তাহেরা - জমিদার সাহেব, তিনি ঠিকই বলছেন। যান, ভাববেন না।

হাশেম - (চিৎকার করে) আব্বা!

হাতেম আলি - (চমকে) কী বাবা?

হাশেম - (সুর বদলে) না, কিছু না। তিনি যা বলছেন তাই করুন।

বহিপীর - (দরজার দিকে তাকিয়ে) কী হইল তাঁহার? জমিদার সাহেব কিছু আসিয়া বলিবেন তো! (খাট্টা মেজাজে) বহুৎ হইয়াছে, হকিকুল্লাহ, আর নয়। বলিলাম টিপিতে, তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে। ময়দা নাকি আমার শরীরটা?

হাতেম আলি - (তাহেরার দিকে তাকিয়ে লজ্জিতভাবে) আর কিছু বলবেন না?

তাহেরা - (মাথা নাড়ে)

খোদেজা - তার কথা সে বলেছে। আপনি যান, গিয়ে বলুন যে রাজি আছে।

হাতেম আলি - (হাশেমের দিকে তাকিয়ে) কী বাবা, উঠতে পারছি না কেন? চক্ষুলজ্জা নাকি?

হাশেম - লজ্জা করে কী হবে, আব্বা? তা ছাড়া করার যখন আর কিছুই নাই তখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন। আমরা যদি দোষী হয়েই থাকি, তবে সে দোষ চক্ষুলজ্জায় ঢাকবে না, বরঞ্চ তাতে দোষটা খুঁচিয়ে বের করে দেখানো হবে।

হাতেম আলি - (দৃঢ়চিত্তে উঠে পড়ে) আচ্ছা যাই। কিন্তু বলুন, আপনি অসুখী হবেন না তো?

তাহেরা - না, অসুখী কেন হব?

হাশেম - (রেগে অসংযত হয়ে) আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছেন। সেটা হজম করেছি আবার মিথ্যা কথা বলে সে চুনকালি রগড়াচ্ছেন কেন?

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - চেঁচান, চেঁচান। এবার জমিদারি তো ফিরে পেয়েছি, আসুন সবাই চেঁচাই। [হাতেম আলি উঠে পাশের ঘরে যান। দরজা আধা-খুলে হাশেম দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - কী খবর জমিদার সাহেব?

হাতেম আলি - তিনি যাবেন।

বহিপীর - শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। হকিকুল্লাহ্, হকিকুল্লাহ্!

হাতেম আলি - (বাধা দিয়ে) কিন্তু একটা কথা আছে। তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারব না। যায় যাক জমিদারি।

বহিপীর - ভাবিয়া কথা বলিতেছেন কি?

হাতেম আলি - অনেক তো ভেবেছি এ কদিন ভাবতে ভাবতে শরীরে আর কিছু নাই। কিন্তু হঠাৎ সব ভয় ভাবনা কেটে গেছে, আরও মনে হচ্ছে, নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) আব্বা! (এগিয়ে আসে)

বহিপীর - ভালো ভালো। যেমন বোঝেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

খোদেজা - (লাফিয়ে দরজার কাছে এসে) কী বললেন পীরসাহেবকে?

হাতেম আলি - (হেসে) বললাম, তিনি রাজি আছেন কিন্তু এভাবে আমি টাকা চাই না, যাক জমিদারি।

[খোদেজা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বহিপীর - (ঘন ঘন মাথা নেড়ে) হুঁ, বেশ বলিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন। হুঁ। উত্তম কথা, অতি উত্তম কথা।

খোদেজা - (চেঁচিয়ে) পীরসাহেব, আমাদের ওপর রাগ করবেন না; আমাদের বদ্‌দোয়া দেবেন না।

বহিপীর - (হঠাৎ রেগে উঠে) আমাকে আপনারা কী ভাবিয়াছেন, আমি পীর হইয়াছি বলিয়া কি মনুষ্য নই? ভাবিতেছেন, আপনারাই সব একেক জন দয়ার সাগর আর আমি একটি হৃদয়হীন পশু, বেদরদ বেশরম জল্লাদ? জমিদার সাহেব বিনা শর্তে আপনি টাকা পাইবেন। ইহা দান নয়, ইহা পীরি বদন্যতাও নয়। আপনাকে ইহা লইতেই হইবে। আমার বিশেষ অনুরোধ।

হাতেম আলি - পীরসাহেব? কী বলছেন আপনি?

খোদেজা - খোদা, খোদা!

বহিপীর - অবাক হইবেন না। অবাক হইবার কিছু নাই। তবে একটা কথা। আমার বিবি সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। সে বিষয়ে আমার কোনো ভুল হয় নাই। কিন্তু জমিদার সাহেবের ব্যাপারে আমি নেহাতই ভুল করিয়াছি। অতি আশ্চর্য, সে বিষয়ে সত্যিই নিঃসন্দেহ ছিলাম। এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তাহা এক মুহূর্তের জন্য খেয়াল হয় নাই। আমাকে ভুল মানিতেই হইবে। আর এ কথাও মানিতে হইবে যে, কোনো মানুষ হঠাৎ আশাতীত কাজ করিয়া বসিতে পারে।

হাতেম আলি - পীরসাহেব, এমন কথা বলবেন না।

বহিপীর - না বলিয়া উপায় কী, কিন্তু ইহা প্রলাপ বকার মতো। চিন্তা করিবেন না, টাকা আপনি পাইবেনই।

হাশেম - (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে) না, পীরসাহেব, টাকা আমাদের চাই না।

খোদেজা - হাশেম!

হাশেম - (হাতেম আলির দিকে চেয়ে) আব্বা বলে দিন পীরসাহেবকে, বলে দিন যে সত্যই আমরা টাকা চাই না।

খোদেজা - হাশেম, হাশেম।

বহিপীর - (অবাক হয়ে) এখন বাবা কী? আমার আর কোনো শর্ত নাই। সকলে মিলিয়া আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন। আর কিছু না থাকিলেও আমার জোব্বার সম্মান তো দিবেন? না, ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবি। এ দাবি কবুল করিতেই হয়।

তাহেরা - (উচ্চ ধীর কণ্ঠে) দেখুন, আমি একবার যে কথা বলেছি সে কথার ব্যতিক্রম হবে না। আমি যাব।

হাশেম - (চেঁচিয়ে) কী বলছেন আপনি?

খোদেজা - হাশেম!

তাহেরা - (দৃঢ় কণ্ঠে) আমি যাবই!

হাশেম - (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদন্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়। বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্য পণ এটা নয়। না, আপনাকে নেশায় ধরেছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুঁটি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ বদান্যতা হঠাৎ

আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।

তাহেরা - (বিস্ময়ে) একি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

হাশেম - কথা বলবেন না। (বেরিয়ে যায়)

খোদেজা - (হাতেম আলিকে) কী করছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। থামান তাদের? থামান আমার ছেলেকে?

হাতেম আলি - হাশেম! (দ্রুতগতিতে উঠে দরজার দিকে রওনা হতেই বহিপীর তার হাত ধরে ফেলেন, আর ইশারায় খোদেজাকে ধৈর্য ধরতে বলেন।)

খোদেজা - পীরসাহেব।

বহিপীর - ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন।

[ততক্ষণে হাশেম তাহেরাকে হাত ধরে তীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাহেরার চলাটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সে বিশেষ বাধা দেয় না। কেবল বলতে থাকে, কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? এ ঘরে বহিপীর ব্যতীত আর সবাই বিমূঢ় হয়ে থাকে।]

বহিপীর - (দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে) এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তা ছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল, যাইবেই।

খোদেজা - (অধীর কণ্ঠে) পীরসাহেব! কী হবে আমাদের?

বহিপীর - (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জামিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?

খোদেজা - (হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) পীরসাহেব!

বহিপীর - (দেদার হেসে) আপনি এইবার আমাকে বদ্‌দোয়া দিতেছেন। কিন্তু পীরের ঐ এক সুবিধা। কোনো বদ্‌দোয়া পীরের গায়ে লাগে না। আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি। হকিকুল্লাহ্!

[যবনিকা]

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

উদগ্রীব– অত্যন্ত আগ্রহান্বিত; ব্যগ্র। **ফারাক–** পার্থক্য; প্রভেদ। **বদান্যতা–** দানশীলতা; উদারতা। **রুহানি শক্তি–** আধ্যাত্মিক শক্তি। **সিঞ্চন–** সেচন; জলসেচ। **স্বতঃপ্রবৃত্ত–** স্বেচ্ছাচালিত।

সারসংক্ষেপ :

নাটকের যবনিকাপাত ঘটে এই পাঠে। বহিপীর হাতেম আলিকে জমিদারি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দেয়ার প্রস্তাব দেন। অবশ্য এর সঙ্গে একটি শর্তও জুড়ে দেন। শর্তটি হচ্ছে তাহেরাকে বহিপীরের সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। জমিদার সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেন। জমিদারের স্ত্রী খোদেজা পীর সাহেবের প্রস্তাবে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন। হাশেম আলি মনে করে, এটা বহিপীরের কিস্তিমাত করা নতুন চাল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহেরাও সম্মত হয় পীরের সঙ্গে ফিরে যেতে। বহিপীর নতুন প্রস্তাবের ফল জানতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। উৎকণ্ঠা কাটিয়ে জমিদার হাতেম আলি ঘোষণা করেন যে, তাহেরার ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি পীরের নিকট

থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করবেন না– প্রয়োজনে তার জমিদারি চলে যেতে পারে। এক পর্যায়ে বহিপীর সময়ের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে হাতেম আলিকে বিনা শর্তে টাকাটা ধার হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ঘটনা ক্রমশ জটিল হয়। তাহেরা বহিপীরের নিকট ফিরে যেতে চাইলে হাশেম তাকে নিয়ে নদীতীরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। খোদেজা ছেলের জন্য আঁতকে ওঠে; কিন্তু পীর সাহেব হাশেম ও তাহেরার নতুন জীবনের পথে যাত্রাকে স্বাগত জানায়। রক্ষা পায় হাতেম আলির জমিদারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. 'পীরের ছায়ায় বাস করার সৌভাগ্য কজনের হয়?' –কথাটি কে বলেছে?

ক. খোদেজা খ. তাহেরা গ. হাশেম আলি ঘ. হাতেম আলি

২২. 'তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে।' –উক্তিটিতে বহিপীরের যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে–

ক. ব্যর্থতা খ. কূটকৌশল গ. মানবিকতা ঘ. অসহায়তা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়াল রুবি। আর অতি চাপা কিন্তু ক্ষুব্ধ স্বরে ফিসফিস করে বলল,"আমি কি বকরি-ঈদের গরু-ছাগল নাকি।" আর কোনো কথা নেই। তারপর নদীর স্রোতে তাদের নৌকা বয়ে চলল।

২৩. উদ্দীপকের রুবির সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. খোদেজা খ. তাহেরা গ. ফিরোজা ঘ. ফরিদা

২৪. এই সাদৃশ্য যে বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. অভিমানে খ. ঘৃণায় গ. প্রতিবাদে ঘ. হতাশায়

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অডিও/ভিডিও প্রোগ্রামগুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

অডিও/ভিডিও

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. ইংরেজি ‘Drama’ গ্রিক কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক. Dramia. খ. Democrate. গ. Dracin ঘ. Drone.

২৬. নাটকে সাধারণত কয়টি উপাদান থাকে?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় কাজ করতেন?

ক. ঢাকা খ. কলকাতা গ. প্যারিস ঘ. লন্ডন

২৮. ‘বহিপীর’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কী?

ক. হাশেম আলি খ. হাতেম আলি গ. তাহেরা ঘ. বহিপীর

২৯. ‘কাল্পনিক সংবদল’ মঞ্চস্থ হয় কত সালে?

ক. ১৭৯৫ খ. ১৭৭৬ গ. ১৭৭৪ ঘ. ১৭৭২

৩০. পীরসাহেবের নাম ‘বহিপীর’ হয়েছে কেন?

ক. পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে খ. বইয়ের ভাষায় কথা বলেন তাই

গ. সফরে থাকেন বলে ঘ. বই পড়ায় আগ্রহের কারণে

৩১. ‘খোদার ভেদ বোঝা সত্যিই মুশকিল।’ –উক্তিটি কোন অর্থ প্রকাশ করে?

ক. মতভেদ খ. কৌশল গ. সংঘর্ষ ঘ. গূঢ় রহস্য

৩২. ক্লাইমেক্স (Climax) বলতে কী বোঝায়?

ক. কাহিনির উৎকর্ষ খ. কাহিনির যবনিকা গ. কাহিনির গর্ভ ঘ. কাহিনির চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব

৩৩. তাহেরার মতে পীরসাহেব–

i. বুদ্ধিমান লোক ii. বৃদ্ধ লোক iii. ধুরন্ধর লোক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

৩৪.‘বহিপীর’ কথ্যভাষাকে তুলনা করেছেন কীসের সঙ্গে?

i. আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে ii . মাঠের ভাষার সঙ্গে iii. ঘাটের ভাষার সঙ্গে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘হাজার বছর ধরে’ উপন্যাসে বুড়ো মকবুলের তিনটি বউ থাকা সত্ত্বেও সে আম্বিয়া নামে অসহায় একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আম্বিয়া ভালবাসে মকবুলের চাচাতো ভাই মন্তুকে। অন্য বউদের আপত্তির কারণে শেষ পর্যন্ত মকবুল আম্বিয়াকে বিয়ে করতে পারেনি।

৩৫.উদ্দীপকের মকবুলের সঙ্গে ‘বহিপীর’ নাটকে কার মিল রয়েছে?

i. হাতেম আলির ii. হাশেম আলির iii. বহিপীরের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i,ii ও iii

৩৬.‘বহিপীর’ নাটকের যে বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে–

i. ধর্মীয় বিধানের সুযোগ গ্রহণ করা ii.মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়া iii.অন্যের মতামতকে উপেক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় রণবীর আজ সর্বস্বান্ত। একসময় তিনি শহরে বাল্যবন্ধুর নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য গমন করেন। কিন্তু বিফল হয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন।

৩৭. নিচের কোন চরিত্রটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. বহিপীর খ. তাহেরা গ. হাতেম আলি ঘ. হকিকুল্লাহ

৩৮.'বহিপীর' নাটক ও উদ্দীপকে যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে–

i. কূটকৌশল ii. স্বপ্নভঙ্গ iii. অস্তিত্বের সঙ্কট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii.

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটোল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াইশো টাকার গহনা আর পটোল বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকি ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হল না। সেই হল শুরু আর তারপর এল এই বন্যে ...বাবা বললেন, বল কী? অতগুলা টাকা গহনা হারালো! অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে–

ক. 'বহিপীর' নাটকটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ. 'বইয়ের ভাষার মতো আর ভাষা নেই।' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে জমিদার হাতেম আলীর কোনো সাযুজ্য রয়েছে কী? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও হাতেম আলির জীবনে ভাগ্য বিড়ম্বনার চিত্রই যেন ফুটে উঠেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

আবহমান বাংলায় পীরগণ ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরে জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। সুবর্ণার বাবা এমনই এক বৃদ্ধ পীরের মুরিদ। পীরের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় এবং ইহকালীন ও পরকালীন সমৃদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় নিজের মেয়েকে তিনি পীরের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। সঙ্গতকারণে বাবার মতকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সুবর্ণা, তাই বিয়েতে সে সম্মতি জানায়। অন্যদিকে তারই খেলার সাথী ও চাচাতো বোন উর্মিলা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, "তুই কি পাগল হলি সুবা? ওই বুড়োটাকে বিয়ে করবি তুই? চালচুলো আছে ওর? আর আমি হলফ করে বলছি, ও ব্যাটার নিশ্চয় বউ রয়েছে কয়েক গণ্ডা। শেষে কি সতীনের ঘানি টানবি?

ক. বজরায় কয়টি কামরা রয়েছে?

খ. 'কথ্যভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।' –কেন?

খ. উদ্দীপকের সুবর্ণা 'বহিপীর' নাটকে তাহেরা থেকে কীভাবে বিপরীতধর্মী? –ব্যাখ্যা করুন। ।

ঘ. "উদ্দীপকে পীর চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকে পীরের যথার্থ প্রতিচ্ছবি।" –মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাল্যকালে বাবা-মাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে মানুষ কাঁকন। টাকার লোভে তার মামা বাদল কাঁকনকে সতীনের ঘরে বিত্তবান ফারুকের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেন। এর প্রতিবাদ করে তার স্ত্রী মোহনা বলেন, "কাঁকনকে আমাদের ছেলে উৎপলের বউ করে নেব। তবু ওখানে মেয়ে বিয়ে দেব না।" কিন্তু বাদল বলেন, "উৎপলের অন্য জায়গায় বিয়া দিলে কত্তগুলান টাকা পাওয়া যাইতো, সে বুদ্ধিটুকুনও নাই তোমার।" মোহনা প্রতিবাদ করে বলেন, "অইছে, অইছে, আমার অত বুদ্ধির দরকার নাই, টাকারও দরকার নাই, কয়দিনের জীবন মানুষের।"

ক. হাতেম আলির জমিদারি কোনখানে?

খ. খোদেজার পরিচয় দিন।

গ. উদ্দীপকের বাদল এবং 'বহিপীর' নাটকে হাতেম আলির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে কী? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মানবিকতা ও বাস্তবজ্ঞানে মোহনা চরিত্রটি খোদেজার চেয়ে অগ্রসর।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মন্তব্য করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪
মুরিদের বাড়িতে সফরে এসেছেন পীর সাহেব। হঠাৎ করে মুরিদের ছোট ছেলে রজবের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী করিমন তার চোখে পড়ে যায়। পীরের মনে সাধ জাগে যেভাবেই হোক করিমনকে তার পেতে হবে। মিথ্যাচার করে তিনি ধর্মের আশ্রয় নিলেন। রাতে বিশেষ ইবাদত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি জানালেন মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রীকে নিজের চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ এসেছে। স্বপ্নের নির্দেশ অমান্য করলে মুরিদ এবং তার ছেলে রজবের ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অগত্যা চাপে পড়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয় রজব। শোক আর কান্নায় পীরের ঘর করতে চলে যায় করিমন।

ক. তাহেরা নিজেকে কার সঙ্গে তুলনা করেছে?
খ. 'কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে।' –কে, কাকে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?
গ. উদ্দীপকের পীর 'বহিপীর' নাটকে কার প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের পীর নিষ্ঠুর কিন্তু 'বহিপীর' নাটকের পীর জটিল।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫
কৃষ্ণমনি, কৃষক আবু মোল্লার বউ নুরন্নাহারকে বলে, "মেয়ে মানুষের অদৃষ্ট বইন। আমি তুই হলাম খুঁটিতে বাঁধা। চক্কুর খেয়ে মলেম, কিন্তু শখ আহলাদ কারে কয়, দেখতে পেলেম না। তোর এই রূপের ডালি সে কি চাষার ঘরের জিনিস? রাজা জমিদার যদি একবার এই রূপ নয়ন মেলে দেখত।" জবাবে নুরন্নাহার তাকে বলে, "রাজা জমিদার কোনোদিন চোখেও দিখিনি, দেখতেও পাবনা। আমার যে আছে সেই অনেক।"

ক. পীরের গায়ে কী লাগে না?
খ. তাহেরা কেন 'বহিপীর'কে স্বামী হিসাবে মেনে নিতে চায়নি?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের অমিলটি তুলে ধরুন।
ঘ. "নুরন্নাহার ও তাহেরা স্বভাবে বিপরীতধর্মী হলেও উভয়েই অসহায়তার শিকার।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬
কোনো কোনো ব্যাংক যেন সাক্ষাৎ কাবুলিওয়ালা। এমনি এক ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বিপদে পড়েছেন উৎপল বিশ্বাস। সুদে-আসলে ঋণ ফেরত দিতে গিয়ে আজ তার ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলার অবস্থা। তার বন্ধু বনমালি রায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। তবে উৎপল বাবুকে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। বনমালি রায়ের ছেলের সাথে উৎপল বাবুর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জানা গেল বনমালি রায়ের ছেলেটি মাদকাসক্ত। উৎপল বাবুর মেয়ে উর্মিলা তাই সঙ্গতকারণেই বিয়েতে রাজি হয়নি। অতঃপর বনমালি রায় বিয়ের শর্তে নয়, বন্ধুত্বের খাতিরেই টাকাটা ধার দিতে চাইলেন।

ক. কখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন?
খ. 'ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবী।' –কে, কেন একথা বলেছেন?
গ. উদ্দীপকের উৎপল বিশ্বাসের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কোন চরিত্রের সাযুজ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উর্মিলা ও তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা যেন একসূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭
কাহিনির পরিবৃত্তে অন্যান্য সব উপাদান সমন্বিত হয়েই নাটকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে। কাহিনির গঠনগত যাবতীয় উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান নাট্যকারের কাহিনি পরিকল্পনার বড় সাফল্য। কাহিনির সুষ্ঠু বিকাশের উপরই নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। এ কারণেই বোধ হয় অ্যারিস্টটল কাহিনিকে নাটকের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। অ্যারিস্টটলের এ ধারণার আলোকেই পরবর্তীকালে নাট্যকাহিনি নির্মাণের গতিধারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছে।

ক. সংস্কৃতে নাটককে কী বলা হয়?
খ. 'এটি একটি মিশ্র শিল্প মাধ্যম।' –বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের কোন বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকটিতে নাটকের সব বিষয় নয় একটিমাত্র উপাদানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।" –আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

একদিন মহব্বতনগর গ্রামে গ্রামবাসীদের চলমান জীবনধারায় নতুন তরঙ্গ খেলা করে। সেখানে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মজিদ নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। সে বলে এই গ্রামের ঘন ঝোঁপে আকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত পুকুরের পাড়ে শ্যাওলাধরা যে প্রাচীন কবরটি রয়েছে তা একজন মোদাচ্ছের পীরের। এরপর সেই কবরের সংস্কার হয়। কবরের ওপর লালসালু কাপড় বিছিয়ে শুরু হয় মজিদের কবর ব্যবসায়। সে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের খাদেমের দায়িত্ব নেয়। এভাবে গ্রামটির সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে নানা সংস্কারের কথা বলে, ভয় দেখিয়ে মজিদ নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেয়।

ক. হকিকুল্লাহ কে?
খ. 'আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।' –খোদেজা বেগম একথা বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের কোনো মিল রয়েছে কি? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মজিদ ও বহিপীরের উদ্দেশ্য সমধর্মী।" –আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

অবশেষে স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে পিসির ঘরে আশ্রয় নেয় অপরাজিতা। পিসি তাকে বোঝায় স্বামী বুড়ো হলেও যেহেতু সম্পদের অভাব নেই তাই তার কাছে ফিরে গেলে সে সুখেই থাকবে। কিন্তু অপরাজিতা অনড়। সে কৌশলের আশ্রয় নেয়। পিসির ছেলে অনন্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। সে তার মায়ের ধ্যান-ধারণার সাথে একমত পোষণ না করে অপরাজিতার পক্ষ অবলম্বন করে।

ক. হাতেম আলি টাকা জোগাড় করতে কোথায় এসেছিলেন?
খ. 'একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারবো' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের অপরাজিতা 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. 'পিসি এবং খোদেজা একই ভাবধারায় পুষ্ট দুটি নারী চরিত্র।' –উদ্দীপক এবং 'বহিপীর' নাটকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

রমা গ্রাম্য পরিবেশে হাসি আনন্দে বেড়ে ওঠা এক উচ্ছল কিশোরী। মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াত সে। মুক্ত পায়ে বিয়ের বেড়ি পরিয়ে দিল তার বাবা। তাও আবার বার্ধক্যে জর্জরিত এক বুড়োর সঙ্গে। রাজি হয় না কিশোরী রমা। বাড়ি থেকে সে পালিয়ে যায়। বাবা-মা তাকে খুঁজে পেলেও সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় অমন বুড়োর সংসারে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। জয় হয় তার স্বাধীনচেতা মনোভাবের।

ক. বার্তাবাহককে কী হতে হয়?
খ. 'আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?
গ. উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের খণ্ডাংশ মাত্র।' –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭ এর নমুনা উত্তর:

ক. সংস্কৃতে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়েছে।

খ. একাধিক মাধ্যমকে ধারণ করে বলে নাটককে মিশ্র শিল্পমাধ্যম বলা হয়।
শিল্প ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নাটক। নাট্যাভিনয় মঞ্চে দেখানো এবং সংলাপ শোনানোর মাধ্যমে তা দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ নাটক হচ্ছে একইসঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য। এ দুইয়ের সমন্বয়ের কারণে নাটককে মিশ্র শিল্পমাধ্যম বলা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি'র পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

মানব জীবনের সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না,আনন্দ- বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নাটক। নাটকে মানুষের জীবন মূল বিষয় হলেও সম্পূর্ণ জীবন এখানে রূপায়িত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনাকে আশ্রয় করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। তাই প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকতে হয়।

উদ্দীপকটিতে নাটকের কাহিনির কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে নাটক হচ্ছে কাহিনির সঙ্গে অনেকগুলো উপাদানের সমন্বিত রূপ। নাটকের যাবতীয় উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারাটাই হচ্ছে নাট্যকারের বড় সাফল্য। মহান দার্শনিক অ্যারিস্টটলও কাহিনিকে নাটকের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে 'বহিপীর' রচনাটিতেও নাটকের গঠনকৌশল বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কাহিনি' নামক উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। 'বহিপীর' নাটকেও জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে কাহিনি রচিত হয়েছে। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় এটি একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে অভিনেতা বা অভিনেত্রী দ্বারা মঞ্চস্থ হবে। ফলে বহিপীরের নাট্যকারকে কাহিনি রচনায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বহিপীর' নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি'র বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনাটিতে নাটকের একটি উপাদানের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে।

কাহিনি একটি নাটকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন নাট্যকারকে প্রথমেই তাঁর নাটকের জন্য কাহিনি নির্বাচন করতে হয়। নাটকের কাহিনিটি সামাজিক হতে পারে, ঐতিহাসিক হতে পারে, দেবতা নির্ভর কিংবা কোনো রাজ-রাজড়ার কাহিনিও হতে পারে। বস্তুত কাহিনিটি যেমনই হোক বা এতে যার কথাই বলা হোক, মানুষের জীবন প্রবাহ থেকে নির্দিষ্ট ঘটনা নির্বাচন করে নাটকে তা তুলে ধরতে হয়।

উদ্দীপকে নাটকের একটি উপাদান 'কাহিনি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে নাটকে 'কাহিনি'র গঠনগত সামঞ্জস্য নাট্যকারের বড় সাফল্য। অ্যারিস্টটল নাটকের কাহিনিকে তার আত্মা বলেছেন। অ্যারিস্টটলের মতটি পরবর্তীকালে নাট্যকারদের বেশ প্রভাবিত করেছে। আলোচ্য রচনাটিতেও নাটকের কাহিনির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে বহিপীর রচনায় কাহিনি ছাড়াও নাটকের অন্যান্য উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে– ১. কাহিনি বা বিষয় ২. চরিত্র ৩. সংলাপ ৪. পরিবেশ। একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হয়।

উদ্দীপকে শুধু নাটকের উপাদানের একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে নাটকের অন্যান্য উপাদান, রস, পর্ববিন্যাস, মঞ্চব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়নি। কিন্তু 'বহিপীর' রচনাটি নাটকের সবগুলো উপাদান নিয়ে একটি সুসংহত নাটক। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'বহিপীর' নাটকের সব বিষয় নয়, একটি মাত্র উপাদানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮ এর নমুনা উত্তরঃ

ক. হকিকুল্লাহ পীর সাহেবের ব্যক্তিগত সহকারী।

খ. 'আমি খাল কেটে ঘরে যেন কুমির এনেছি।' –উক্তিটি খোদেজার।

তাহেরাকে বজরায় তুলে সহযোগিতা করার জন্য খোদেজা ও তার পরিবার পীরের বিরাগভাজন হয়েছেন, তাই খোদেজা ক্ষোভে এই উক্তিটি করেছে। তাহেরা একজন পীরের স্ত্রী। কাকতালীয়ভাবে পীরসাহেবও ঐ বজরায় আশ্রয় নেন। পীর তার স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাহেরা পীরের সঙ্গে যেতে রাজি নয়। অন্যদিকে জমিদারপুত্র হাশেম আলি তাহেরাকে সমর্থন করে। এমনকি তাহেরাকে রক্ষা করার জন্য সে বিয়েও করতে চায়। কিন্তু পীরের স্ত্রীকে বিয়ে করলে তার অভিশাপ পড়বে পুরো পরিবারের উপর। আর এই অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে খোদেজার সংসার। মূলত এই ভয় থেকেই খোদেজা আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকের অমিল লক্ষ করা যায়।

আবহমান বাংলায় মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কিছু কুসংস্কারও প্রবেশ করেছে। পীরে ভক্তি, পীরে মুক্তি– এ ধরনের মতও কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। ধর্ম বহির্ভূত অসংযত আবেগ দ্বারা যখন মানুষ পরিচালিত হয় তখন সে যুক্তিরহিত হয়ে পড়ে। সে নিজের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে না। পীরের অলৌকিক প্রভাব তার চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্দীপকে মজিদ একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসেছে। সে মহব্বতনগর গ্রামে এসে একজন মোদাচ্ছের পীরের মাজার খুঁজে পায়। অতঃপর নিজে উক্ত মাজারের খাদেম নিযুক্ত হয়। পরে গ্রামবাসীকে মাজারের ভক্ত বা মুরিদ করে তোলে। লালসালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিই হচ্ছে মজিদের ধর্মব্যবসায়ের উপকরণ। একসময় মাজারটিই হয়ে উঠে তার ভাগ্যের নিয়ন্তা। অনুরূপভাবে 'বহিপীর' নাটকে দেখা যায় পীর সাহেব সারাদেশে সফর করে বেড়ান। দুই বৎসর এক বৎসর অন্তর অন্তর তিনি বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে তশরিফ আনেন। ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। যেটি মজিদের রয়েছে। এই দুজনের কাজের ধরণও আবার ভিন্ন রকমের। মজিদ ও বহিপীরের অর্থ উপার্জনের কৌশলও আলাদা। বহিপীরকে সারাদেশ থেকে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। মজিদকে সারাদেশে যেতে হয় না। মোদাচ্ছের পীরের মাজারে এসেই লোকজন টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। অতএব বলা যায়, মজিদ ও বহিপীর চরিত্রের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে মজিদ ও নাটকে বহিপীরের কর্মকৌশল কার্যক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য একই –ধর্মব্যবসায় ও অর্থ উপার্জন।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাতে হয়। ফলে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতার। এক্ষেত্রে কেউ টিকে থাকে, কেউবা হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য। তবু মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোনো কমতি করে না। অর্থ-সম্পদ উপার্জনের জন্য সে বিভিন্ন উপায়ের সঙ্গে কখনো কখনো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগায়। উদ্দীপকের মজিদ এবং 'বহিপীর' নাটকের বহিপীর এই শ্রেণির মানুষ যারা পবিত্র ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেছে।

উদ্দীপকে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের আগমন ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। গ্রামে সে একজন মোদাচ্ছের পীরের মাজার আবিষ্কার করে। মাজারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তার ধর্মব্যবসায়। গ্রামের সকল মানুষকে সে মাজারের ভক্ত বা মুরিদ বানিয়ে ফেলে। গ্রামের মানুষকে সে ধর্মের ভয় দেখায়। এভাবে মজিদ একসময় মহব্বতনগর গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠে। তার বৈষয়িক উন্নতিও ঘটে। অন্যদিকে 'বহিপীর' নাটকে পীরসাহেব সারাদেশব্যাপী ভ্রমণ করেন। বৎসর অন্তর তার মুরিদদের সঙ্গে দুএকবার সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া তিনি নিজেই একজন পীর, মজিদের মতো কোনো পীরের খাদেম নন। সকল অঞ্চলের মুরিদদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি বইয়ের ভাষা ব্যবহার করেন।

উদ্দীপকের মজিদ ও নাটকের বহিপীরের কাজের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। একজনের উপার্জনের উপায় মাজার ব্যবসায়। অন্যজন সারা দেশে ঘুরে বেড়ান। মজিদকে লোকজন অর্থ-সম্পদ মাজারে এসে দিয়ে যায়। আর বহিপীরকে সারাদেশ ঘুরে ঘুরে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। অতএব, পর্যালোচনা শেষে বলা যায় উদ্দীপক ও বহিপীর নাটকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কিন্তু ধর্মব্যবসায় ও অর্থ উপার্জনে মজিদ ও বহিপীর প্রায় সমধর্মী।

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-৯ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. হাতেম আলি টাকা জোগাড় করতে শহরে এসেছিলেন।

খ. 'একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে আরেকটা স্বপ্ন গড়তে পারব।' –উক্তিটি হাশেমের। এর মধ্য দিয়ে হাশেম নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পড়াশোনা শেষ করে হাশেমের ইচ্ছা ছিল সে ছাপাখানা করবে। এ জন্য সে বাবার কাছে টাকাও চেয়েছিল। কিন্তু বাবা জমিদার হাতেম আলি ঋণের দায়ে জমিদারি হারাতে বসেছেন। তাই তিনি টাকা দিতে পারেননি। অবশ্য হাশেম বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। সে মনে করেছে তার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল না হলে ভবিষ্যতে আরেকটি স্বপ্ন সৃষ্টি করবে এবং সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাবে। মূলত এ উক্তিটির মধ্য দিয়ে হাশেম আলি নিজের কষ্টকে লাঘব করতে চেয়েছে। আর পিতার কষ্টকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছে।

গ. উদ্দীপকের অপরাজিতা চরিত্রটি 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় মেয়েদের মতামতের চেয়ে অভিভাবকের ইচ্ছাটাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। অভিভাবকরা নিজের মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়। ফলে তাদের স্বার্থবুদ্ধির জন্য নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই নিজেকে বাঁচাতে নারী প্রতিবাদ জানায়।

উদ্দীপকে অপরাজিতা স্বামীর নিকট থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। উদ্দীপকের অপরাজিতার মতো 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার মা-বাবাও যখন তাকে বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দেয় তখন সে পলায়ন করে। পালিয়ে এসে সে আশ্রয় নেয়

জমিদার হাতেম আলি ও তার স্ত্রী খোদেজা বেগমের নিকট। কিন্তু জমিদার ও তার স্ত্রী তাহেরাকে বৃদ্ধ পীরের নিকট তুলে দিয়ে নিজেদের জমিদারি রক্ষা করার চেষ্টা করেন। জমিদার পুত্র হাশেম তাহেরাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। উদ্দীপকে অপরাজিতা যেমন বাবা বা পিসি কারোর নিকট হতে রক্ষা পায়নি, তেমনি তাহেরাও মা-বাবা কিংবা জমিদার দম্পতি কারোর নিকট প্রশ্রয় পায়নি। অবশ্য উদ্দীপকে অনন্ত ও 'বহিপীর' নাটকে জমিদার পুত্র হাশেমের মতো আধুনিকমনস্ক ছেলেরা বঞ্চিত নারীদেরকে রক্ষা করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অপরাজিতা চরিত্রের সঙ্গে নাটকের তাহেরা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে পিসি এবং 'বহিপীর' নাটকে জমিদারপত্নী খোদেজা গা বাঁচানো অধিকার বিমুখ একজোড়া নারী চরিত্র।

আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সবসময় স্বাধীনচেতা। সে নিজের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যায়ের মুখোমুখি হলে প্রতিবাদ করে। ব্যর্থ হলে ভিন্নভাবে চিন্তা করে। উদ্দীপকে অপরাজিতা স্বামীর বাড়ি হতে পালিয়ে পিসির আশ্রয়ে এসেছিল। সে বৃদ্ধ পাত্রের সংসার হতে বাঁচতে চেয়েছিল যেমন নাটকে তাহেরা বাবা-মার দেয়া বিয়েকে প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে গিয়েছিল।

উদ্দীপকে পিসির মতে অপরাজিতার স্বামীর সঙ্গে সংসার করা দরকার। এখানে স্বামীর বয়স কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। স্বামী যেহেতু সম্পদশালী তাই অপরাজিতা সেখানে সুখেই থাকবে। 'বহিপীর' নাটকে তেমনি খোদেজাও ধর্মীয় সংস্কারে বিশ্বাসী। খোদেজা মনে করে বিয়ে আল্লাহর হুকুম। পীরদের সাথে বিয়ে হওয়াটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। তাছাড়া বিবাহিত মেয়ের সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়া ভীষণ অন্যায়। নিজের ছেলে হাশেম তাহেরার দায়িত্ব নিতে চাইলেও সে কোনোভাবেই রাজি হয়নি।

উদ্দীপকের পিসি এবং নাটকের খোদেজা দুটি চরিত্রই সুশিক্ষিত ও অধিকার সচেতন নয়। নারীর অধিকারের বিষয়টি তাদের চিন্তার বাইরে। তারা দুজনেই সমাজের পুরাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা সেকালের ধ্যান-ধারণা চর্চা করে। তাই তাদের কাছ থেকে অপরাজিতা ও তাহেরা কোনো উপকার পায়নি। উদ্দীপকের পিসি ও নাটকের খোদেজা অধিকার সচেতন হলে অপরাজিতা ও তাহেরার জীবন অন্যরকম হতে পারত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পিসি এবং 'বহিপীর' নাটকে খোদেজা একই ভাবধারায় পুষ্ট দুটি নারী চরিত্র।

<u>সৃজনশীল প্রশ্ন-১০ এর নমুনা উত্তর:</u>

ক. বার্তাবাহককে দলহীন হতে হয়।

খ. শাস্ত্রসম্মতভাবে তাহেরা ও পীর সাহেবের বিয়ে হলেও তাহেরা মনে করে এ বিয়েতে ফাঁক রয়ে গেছে।

পীর সাহেবের সঙ্গে তাহেরার বিয়ে দিতে বাবা-মা উদগ্রীব ছিলেন। বিশেষত পীরের নেক নজর পাওয়ার আশায় তারা অল্পবয়সী মেয়েকে পীরের নিকট বিয়ে দিতে রাজি হন। ফলে শাস্ত্রীয় বিধিমোতাবেক পীরসাহেব ও তাহেরার বিয়ে হয়। তবে বিয়ের আগে তাহেরার মত নেয়া হয়নি। তাছাড়া তাহেরা বিয়ের আগে বা পরে পীরসাহেবকে দেখেনি। যেহেতু পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি এবং তাহেরার মত নিয়ে বিয়ে হয়নি, তাই তাহেরা এ বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

গ. আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা। বিয়ে দুটি নর-নারীকে একসূত্রে গ্রন্থিত করে। তাই এক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীদের সকল দিক থেকেই একটি বোঝাপড়া থাকা উচিত। আমাদের সমাজে প্রায়ই এ বোঝাপড়াটি মানা হয় না। এমনকি কখনো কখনো মেয়ের মতামতকেও উপেক্ষা করা হয়। ফলে সৃষ্টি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার। অনেক সময় বিয়ের পাত্র-পাত্রীদের পলায়নের মতো ঘটনাও ঘটে।

উদ্দীপকে রমা উচ্ছল প্রকৃতির অল্পবয়স্ক বালিকা কিন্তু তার বাবা তাকে বুড়ো বয়সী লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাইলে সে পালিয়ে যায়। তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেও সে বিয়ে করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। তদ্রূপ 'বহিপীর' নাটকে তাহেরার বাবা অনেকটা সৎ মায়ের হাত হতে বাঁচানোর জন্য এবং পূণ্য সঞ্চয়ের আশায় এক বৃদ্ধ পীরের সাথে বিয়ে দিলে তাহেরাও পালিয়ে যায়। বৃদ্ধ পীর তাহেরাকে খুঁজে পেলেও শেষ পর্যন্ত ঘরে তুলতে পারেন না। তাহেরা তার উপযুক্ত পাত্র হাশেম আলির সাথে চলে যায়। এভাবে দেখা যায় উদ্দীপকে রমা এবং নাটকে তাহেরা সংগ্রাম করে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। বলা চলে, উদ্দীপকের রমা চরিত্রে 'বহিপীর' নাটকের তাহেরা চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে নাটকের তাহেরা চরিত্রের চিত্রই শুধু অঙ্কিত হয়েছে যা মূল নাটকের একটি অংশ মাত্র।

পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের দেশে একটি সামাজিক রেওয়াজ। অনেক সময়ই এর ব্যতিক্রম ঘটে। কখনো কখনো আবেগের বশে বা অন্য কোনো কারণে অনেক অভিভাবক নিজেদের অজান্তে সন্তানের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ফলে আত্মপ্রত্যয়ী সন্তান তাদের ব্যক্তিসত্তাকে সমুন্নত রাখার জন্য সমাজ বিরুদ্ধ কাজ করে। নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অনেকে এটা করে থাকে। কেউ কেউ আবার অন্যের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে না পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় কিশোরী রমাকে বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দেয়ায় সে বাড়ি হতে পলায়ন করে। তার পরিবার তাকে খুঁজে পেলেও সে বুড়োর সাথে সংসার করতে ইচ্ছুক নয়। অন্যদিকে 'বহিপীর' নাটকে বহিপীরের ভণ্ডামি, সং সেজে কিশোরী মেয়ে বিবাহ, জমিদার হাতেম আলির পতন, জমিদার পুত্র হাশেমের সচেতনতা এবং সার্বিকভাবে নারীর সচেতনতা ইত্যাদি অনেক বিষয় উঠে এসেছে। উদ্দীপকে নাটকের কেবল একটি বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে তাহেরার পলায়নের ঘটনাটি। নাটকের প্লট অনুযায়ী অন্যান্য সমস্যা ও এর সমাধান উদ্দীপকটিতে নেই।

উদ্দীপকের রমা ও তাহেরার মধ্যে যে বিষয়ে মিল রয়েছে সেটি হল তারা দুজনই নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেয়নি। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। এই লড়াইয়ে তারা জয়ীও হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকটিতে নাটকের অন্যান্য বিষয়গুলো ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বহিপীর' নাটকের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না, এটি সমগ্র নাটকের একটি খণ্ডাংশ মাত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন

সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়ার হাজী। তাঁকেই আনবে বলে ঠিক করল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষি আর ক্ষেত মজুররা। বললে, চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা? মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির ব্যাপারী। তওবা, তওবা, কহেন কী মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীর, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তার নামে এত বড় কুৎসা। ভালা কাজ করলা না মাস্টার, ভালা কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়লেন জমির ব্যাপারী। পীরের বদদোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা। কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার।

ক. নাটকের প্রাণ কোনটি?

খ. 'নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছি?' –উক্তিটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের জমির ব্যাপারী 'বহিপীর' নাটকের কোন চরিত্রকে তুলে ধরে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "মতি মাস্টার এবং হাশেম আলি দুজনেই নবজাগরণের স্বাপ্নিক পুরুষ।" –উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ঘ	৭. ক	৮. খ	৯. গ	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. ঘ
২১. ক	২২ ঘ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. ঘ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. ঘ		

নমুনা প্রশ্ন

এসএসসি পরীক্ষা

বাংলা প্রথম পত্র;

কোর্স কোড : SSC-1651

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট, পূর্ণমান: ৬০

[দ্রষ্টব্য : প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে একটি করে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলতি ভাষারীতির মিশ্রণ দুষণীয়।]

ক বিভাগ-গদ্য

১. রাজধানী শহর ঢাকা ছাড়িয়ে শতাধিক কিলোমিটার উত্তরে পুরনো শহর ময়মনসিংহ। এ জেলার গারো পাহাড়ে বাস করে গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা। গারোরা মঙ্গোলিয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এরা মাতৃতান্ত্রিক। নারীরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। গারো পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। এরা নারী-পুরুষ একসাথে মাঠে কাজ করে।

ক. পেনাল কোড কী?

খ. 'যে বিপদ না বুঝে সেই সাহসী।' –কেন?

গ. উদ্দীপক ও'পালামৌ' রচনার নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. "গারো সম্প্রদায়ের নারীদের চেয়ে কোল নারীরা অধিকতর জীবন সংগ্রামী।" –উদ্দীপক ও 'পালামৌ' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

২. শ্বশুর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন না হইয়া থাকিতেন তাহা হইলে এ বাড়িতে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন, এখানে তাহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাহার আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবাতো ভাল করিয়া কথাই কহিলেন না। আমার শ্বশুরের মনে ছিল তাহার বেহাই একদা তাহাকে বার বার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যখন তাহার খুশি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন। এ সত্যের অন্যথা হইতে পারে সে কথা তিনি মনেও আনিতে পারেন নাই।

ক. 'রায় বাহাদুর' কাদের বলা হত?

খ. 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' –কেন এবং কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শ্বশুর 'দেনাপাওনা' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "দেনাপাওনা' গল্পের রামসুন্দর মিত্র যেন উদ্দীপকের বাবা চরিত্রটিকেই তুলে ধরেছে।" –আলোচনা করুন।

৩. নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে বিকালে হাজির হলুম ঐশীবুর বাড়িতে। বুবু আমাকে দুটো পেয়ারা খেতে দিলেন। আমি একটা খেলাম। বুবু আমার খাওয়া দেখে বললেন, ঘরে মুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি বললাম, তাহলে আর একটা পেয়ারা খাই। বুবু হাসলেন। এ হাসি যেন কতকালের জমানো কষ্টের। বললেন, খুশি হয়েছি। সবাই যদি তোর মতো ভালবাসত।

ক. কত বৎসর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দিবারাত্রির কাব্য' রচনা করেন ?

খ. 'বেশি আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।' –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকটি 'মমতাদি' গল্পের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. 'উদ্দীপকের বুবু ও মমতাদির অপত্য স্নেহ যেন একইসূত্রে গাঁথা।' –মন্তব্যটি বিচার করুন।

খ বিভাগ-কবিতা

৪.

দু'পাশে ধানের ক্ষেত
সরু পথ
সামনে ধুধু নদীর কিনার
আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি উধাও নদীর
মুগ্ধ এক অবোধ বালক।

ক. বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কে?

খ. 'ভ্রান্তির ছলনে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার যে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবটিই যেন কপোতাক্ষ নদ কবিতার মূল সুর।" –আলোচনা করুন।

৫.

হে কবি নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়,
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি–

"দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?"

ক. যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
খ. 'অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব' –কথাটি বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকটি 'অন্ধবধূ' কবিতার কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. "'অন্ধবধূ' কবিতাটির সামগ্রিক অংশ নয়, একটি বিশেষ দিক উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।" –আলোচনা করুন।

৬. অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালোপাড়ার এক বুড়া মালো তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে। অনেক দিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি– মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ক. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নাম কী?
খ. 'খুনসুটি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার কোন বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "বিচ্ছিন্নতা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্কই মৌলিক।" –উদ্দীপক ও 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

গ বিভাগ-সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক)

৭. তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙল,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।

ক. 'নিমক হারাম' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'কথাটা চাপা থাকল না।' –কোন কথাটি? বুঝিয়ে বলুন।
গ. উদ্দীপকের সাকিনা বিবি 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে?
ঘ. "উদ্দীপকের হরিদাসী ও 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের টুনির জীবনে বিপর্যয় নেমে এলেও উভয়ের পটভূমি ভিন্ন।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

৮. পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়। একসময় সকলে মরে যায় কিন্তু রেখে যায় তার উত্তরাধিকার। মানুষের গড়া অনেক সভ্যতা চিরকালের তরে বিলীন হয়ে গেছে। এককালের পৃথিবীখ্যাত এশিরিয় ও ব্যাবিলনিয় সভ্যতা আজ আর ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছুই নয়। কেবল প্রকৃতি তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে চিরকাল প্রাণময় হয়ে পৃথিবীতে প্রবহমান রয়েছে। এভাবে পৃথিবী চলছে হাজার বছর ধরে। হয়তো বা চলতে থাকবে আরও হাজার বছর।

ক. হীরন আজকাল কোথায় থাকে?
খ. সুরত আলীর ছেলেটা কীভাবে পিতার পুঁথিপাঠের গুণটি রপ্ত করেছে?
গ. উদ্দীপকের ভাবনা 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাবই অনুরণিত হয়েছে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে।" –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

৯. কোনো কোনো ব্যাংক যেন সাক্ষাৎ কাবুলিওয়ালা। এমনি এক ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে বিপদে পড়েছেন উৎপল বিশ্বাস। সুদে-আসলে ঋণ ফেরত দিতে গিয়ে আজ তার ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলার অবস্থা। তার বন্ধু বনমালি রায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন। তবে উৎপল বাবুকে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। বনমালি রায়ের ছেলের সাথে উৎপল বাবুর মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জানা গেল বনমালি রায়ের ছেলেটি মাদকাসক্ত। উৎপল বাবুর মেয়ে উর্মিলা তাই বিয়েতে রাজি হয়নি। অতঃপর বনমালি রায় বিয়ের শর্তে নয়, বন্ধুত্বের খাতিরেই টাকাটা ধার দিতে চাইলেন।

ক. কখন চক্ষুলজ্জা অর্থহীন?
খ. 'ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবী।' –কেন একথা বলেছেন?
গ. উদ্দীপকের উৎপল বিশ্বাসের সঙ্গে 'বহিপীর' নাটকে কোন চরিত্রের সাযুজ্য রয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উর্মিলা ও তাহেরার প্রতিবাদী চেতনা যেন একসূত্রে গাঁথা।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা
সময়: ৪০ মিনিট, পূর্ণমান ৪০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার প্রতিটি ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটি খাতায় লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কর্মজীবনে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
ক. ডেপুটি জেল সুপার খ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
গ. ডেপুটি জজ ঘ. ডেপুটি পুলিশ সুপার

২. 'ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।' এখানে ইতিহাস হল–
ক. ক্ষতি স্বীকার করা খ. তিন হাজার টাকা সংগ্রহ
গ. দায়মুক্তির জন্য চেষ্টা ঘ. ঋণ করে খাওয়ানো

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ডা. রুহুল আমিন দোকানে গিয়েছিলেন চিকিৎসাসংক্রান্ত কয়েকটি বই কিনতে। কেনাকাটা শেষ হলে কর্মচারি তাকে বললেন,"ইলিয়াড-এর একটি নতুন সংস্করণ এসেছে, নেবেন স্যার?"। ডা. আমিন মুখ বাঁকা করে বললেন,"ওসব কাব্য-টাব্য পড়ে কী লাভ? সময়ের অপচয়মাত্র।"

৩. উদ্দীপকের ডা. আমিন 'বই পড়া' প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে তুলে ধরে?
ক. আইনজীবী খ. শিক্ষক
গ. খেলোয়াড় ঘ. ব্যবসায়ী

৪. উদ্দীপকের চরিত্র ও 'বই পড়া' প্রবন্ধের সাদৃশ্য যে বিষয়ে–
i. সাহিত্যের নগদ বাজার দর নেই ii. সাহিত্যচর্চা ব্যয়বহুল iii. সাহিত্য পাঠে পূণ্য হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii

৫. কাঙালীকে আর কত বৎসর অভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে?
ক. এক বৎসর খ. দুই বৎসর
গ. তিন বৎসর ঘ. চার বৎসর

৬. রূপকথা শোনার সময় কাঙালী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে যে কারণে–
i. ভয় ii. বিস্ময় iii. আনন্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i, ii ঘ. ii ও iii

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না।

৭. উদ্দীপকের বাপ 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?
ক. অভাগী খ. রামসুন্দর
গ. ঈশ্বর নাপিত ঘ. রসিক দুলে

৮. উদ্দীপক ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–
ক. বাৎসল্য প্রীতি খ. মর্ত্য প্রীতি
গ. ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ঘ. খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা

৯. 'পাস বিক্রয়' ব্যবসায়ের বিক্রেতা কে?
ক. বর খ. বরের পিতা
গ. কনে ঘ. কনের পিতা

১০. 'কুন্তলীনের সঙ্গে 'কেশলীন' বিক্রয় হয়।' উক্তিটির মানে হচ্ছে–
ক. মান নিয়ন্ত্রণের অভাব খ. তুচ্ছ জিনিসের ছড়াছড়ি
গ. উৎপাদনের আধিক্য ঘ. অবাধ নকল প্রবণতা

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

ঘৃতকুমারির নরম অংশ দিয়ে শরবত তৈরি করা হয়। এর শরবত যেমন উপকারি, তেমনি স্বাদও।

১১. উদ্দীপকে বর্ণিত গাছের সঙ্গে আপনার পাঠ্য গল্পের কোন গাছের মিল রয়েছে?

ক. কলাগাছ　　খ. নিমগাছ

গ. কাঁঠাল গাছ　　ঘ. লিচু গাছ

১২. উদ্দীপকের ঘৃতকুমারী ও গল্পের গাছের যে রূপটি প্রকাশিত হয়েছে–

i. ধ্বংসাত্মক রূপ　　ii. কল্যাণময় রূপ　　iii. সর্বগ্রাসী রূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম ছেলেবেলায় কীসে যোগ দিয়েছিলেন?

ক. লেটো গানের দলে　　খ.কবি গানের দলে

গ. পুঁথি গানের দলে　　ঘ.কীর্তন গানের দলে

১৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে সেখানে মুক্তি নেই যেখানে–

i. চিন্তার স্বাধীনতা নেই　　ii. বুদ্ধির স্বাধীনতা নেই　　iii. আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

১৫. 'বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই' গ্রন্থটির লেখক কে?

ক. হায়াৎ মামুদ　　খ. কবির মামুদ

গ. কবীর চৌধুরী　　ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১৬. 'ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী' এখানে 'ঈশ্বরী' বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে–

ক. ঈশ্বরী দেবী　　খ. ঈশ্বরী রায়

গ. ঈশ্বরী পাটুনী　　ঘ. ঈশ্বরী সাহা

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

'কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী বিকেলগুলো সেই–
আজ আর নেই।'

১৭ উদ্দীপকে প্রকাশিত অনুভূতি নিচের কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?

ক. আমার সন্তান　　খ. পল্লিজননী

গ. কপোতাক্ষ নদ　　ঘ. মানুষ

১৮. 'কপোতাক্ষ নদ' ও উদ্দীপকের অনুভূতির যে বিষয়ে মিল রয়েছে–

i. স্নেহকাতরতা　　ii. স্মৃতিকাতরতা　　iii. মানবপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii.　　গ. iii　　ঘ. i ও ii

১৯. 'জীবন সঙ্গীত' একটি–

i. অনুবাদমূলক কবিতা　　ii. নীতিশিক্ষামূলক কবিতা　　iii. ভাবানুবাদমূলক কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

সংসারে বিদায় দিতে,আঁখি ছলছলি
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি
দুই ভুজে ॥

২০. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. প্রাণ　　খ. জীবন সঙ্গীত

গ. পল্লিজননী　　ঘ. বৃষ্টি

২১. উদ্দীপক ও আপনার পঠিত কবিতায় মিল রয়েছে যে বিষয়ে–

i. ভাবে　　ii. আঙ্গিকে　　iii. বিষয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i, ii　　ঘ. i, ii ও iii

২২. 'অন্ধবধূর শোকের বোঝা' যেভাবে হালকা হয়েছে–
ক. কাঁদতে পেরে খ. বাপের বাড়ি যেতে পেরে
গ. স্বামীকে কাছে পেয়ে ঘ. গান শুনতে পেয়ে

২৩. ঝরনা কীসের গান করে?
ক. বুলবুলির খ. ঝিঁঝিঁর
গ. শালিকের ঘ. পরির

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

'তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।'

২৪. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা হল–
ক. প্রাণ খ. অন্ধবধূ
গ. সেইদিন এই মাঠ ঘ. মানুষ

২৫. এরূপ সাদৃশ্য প্রকাশিত হয়েছে–
i. মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ii. পুরোহিতের ঈশ্বর ভক্তি iii. পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

২৬. লক্ষ্মীপেঁচা কার জন্য গান গাইবে?
ক. ডাহুক খ. মাছরাঙা
গ. শ্যামপেঁচা ঘ. লক্ষ্মী

২৭. 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতায় কবির বন্ধু কীসের রাজা?
ক. স্বর্গের রাজা খ. মর্ত্যের রাজা
গ. দুনিয়াদারীর রাজা ঘ. পাতালের রাজা

২৮. যে আন্দোলনের সাফল্যের পথ ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে–
ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন খ. ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান
গ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ঘ. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

২৯. উদ্দীপকে 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' –কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
i. স্বাধিকারের কথা ii. মুক্তিযুদ্ধের কথা iii. স্বাধীনতার কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৩০. উদ্দীপকে প্রতিফলিত চেতনা 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
i. এই ধুধু মাঠের সবুজে ii. এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না iii. সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i ও ii

৩১. বুড়ো কাশেম শিকদার কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন?
ক. কুশিয়ারা চর খ. কুলাউড়া
গ. কসবা ঘ. কাঠিগ্রাম

৩২. 'ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি' পাঠ করে কে?
ক. গাজী কালু খ. সুরত আলী
গ. নন্তু শেখ ঘ. করিম শেখ

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৩ ও ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

  ফ্রাইডেতে ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফিরতে হবে। হোটেল থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে। কাউন্টারে যেতেই হোটেল বয় ধরিয়ে দিল একটি ফুলের তোড়া। জানতে পারলাম না কে এসেছিল? তোড়ার নিচের দিকে দেখা গেল বড় যত্ন করে লেখা একটি নাম– নাছরিন।

৩৩. উদ্দীপকটির সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আম্বিয়া　　খ. টুনি
গ. সালেহা　　ঘ. আমেনা

৩৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. ভালবাসা প্রকাশে　　ii. ঘৃণা প্রকাশে　　iii. হতাশা প্রকাশে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩৫. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে যে চরিত্রটি প্রতিবাদী–

ক. আম্বিয়া　　খ. সখিনা
গ. টুনি　　ঘ. সালেহা

৩৬.'আমি কি বকরী-ঈদের গরু-ছাগল না কি?' বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. আনন্দ　　খ. ঘৃণা
গ. অভিমান　　ঘ. প্রতিবাদ

৩৭. হাতেম আলির আশা ছিল বাল্যবন্ধু আনোয়ার তাকে –

i. বিপদ থেকে উদ্ধার করবে　　ii. টাকা যোগাড় করবে　　iii. বজরাটি কিনে নিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

- **নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :**

  সুবল বাবার রাশভারি ব্যক্তিত্বের কারণে নিজের মতো করে গড়ে উঠতে পারেনি। সে বাবাকে ভয় পায়। ফলে বোন রুনির বিয়ের সময় সে কোনো মতো প্রকাশ করেনি। বোনের বিয়ে হয় ষাটোর্ধ্ব বয়সের পুরোহিত ও ধনী অপূর্ব রায়ের সঙ্গে।

৩৮.উদ্দীপকের রুনি 'বহিপীর' নাটকে কার প্রতিনিধি?

ক. খোদেজা　　খ. নাসিমা
গ. সানজিদা　　ঘ. তাহেরা

৩৯.উদ্দীপক ও 'বহিপীর' নাটকে প্রকাশিত হয়েছে–

i. সম্পদের লোভ　　ii. নারীকে পণ্য করা　　iii অন্ধ ধর্মবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii　　গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪০. 'বহিপীর' তাহেরাকে থামালেন না কেন?

ক. ব্যর্থতায়　　খ. অনুশোচনায়
গ. আশা ফুরানোয়　　ঘ. ঘটনার যবনিকায়

?	**সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–** আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	**ড. মো. চেঙ্গীশ খান** অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: chenggish@bou.ac.bd এবং **মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫। ইমেইল: meherin2010@bou.ac.bd